শ্রীমান দীপক গুপ্ত
কল্যাণীয়েষু

॥ দুটি কথা ॥

"কোমল গান্ধার" উপন্যাসটির প্রথমাংশ বা প্রথম পর্বের রচনাকাল ১৯৫৫-৫৬। ১৯৫৫র প্রথম দিকে কোন একটি মাসিকে "কোমল গান্ধার" লিখতে শুরু করি, কিন্তু কাগজটির অকাল-মৃত্যু ঘটায় কয়েক মাস পরে লেখাও আমার বন্ধ হয়ে যায়। এবং তার পরই "কোমল গান্ধার"এর প্রথম পর্ব অসমাপ্ত অবস্থাতেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং কয়েক মাসের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। ইচ্ছা ছিল তখন শীঘ্রই "কোমল গান্ধার"এর দ্বিতীয় পর্ব পুস্তকাকারে প্রকাশিত করবো, কিন্তু নানা কারণে সেটা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি যেমন তেমনি "কোমল গান্ধার"এর প্রথম পর্বও পুনর্মুদ্রিত হয়নি আমার ইচ্ছাতেই। দীর্ঘকাল পরে "কোমল গান্ধার" প্রথম পর্ব মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত হলো এবং শীঘ্রই দ্বিতীয় পর্ব বা "কোমল গান্ধার"এর শেষাংশ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে। যাঁরা ইতিপূর্বে প্রথম পর্ব পড়েছেন বা সংগ্রহ করেছেন তাঁদের ঐ সংবাদটি দেবার জন্যই এই ছোট ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন হলো।

লেখক

আষাঢ় ১৩৮০/১৯৭৩ জুলাই

উল্কা

২৬-এ গড়িয়াহাট রোড

কলকাতা-৭০০০১৯

কোমল গান্ধার

সুচরিতাসু,

তোমার সমস্ত চিঠিটা জুড়ে যে অভিযোগ ফুটে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে, সেটা হচ্ছে কেন আমার নায়িকারা সবাই বড় ঘরের মেয়ে হয়, কেন তাদের জীবনের চারিদিকে বিলাস আর ঐশ্বর্য্য ছড়ানো, কেন তারা কেউ তোমার মত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হয় না।

জবাব আমি দিতে পারতাম তোমার ঐ প্রশ্নের।

বলতে পারতাম, আমার 'রমা' আমার 'মিতালী' এরা কি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে না —যে ঘরে, যে সংসারে ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন বাঁচবার জন্য নিষ্ঠুর সংগ্রাম, না পাওয়ার বেদনা—না পাওয়ার লজ্জা আর গ্লানি বহন করে যেতে হয়েছে। কিন্তু বললাম না কারণ এটা তো স্পষ্টই বুঝেছি তোমার চিঠি পড়ে, তুমি সত্যিই আমার একজন অনুরাগিনী পাঠিকা।

জীবনে সেটাও তো কম দুর্লভ বস্তু নয়।

লিখতে গিয়ে কলম ধরে অবধি গালমন্দ তো কম খেলাম না। সে গালমন্দর নিষ্ঠুর কদর্যতা মধ্যে মধ্যে ব্যক্তি বিশেষে আমাকে নিয়ে পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে; যেখানে তারা আমার লেখাকে বাদ দিয়ে 'আমি' মানুষটকে আক্রমণ করেছে। এবং যে জন্য কত সময় ভেবেছি এর কি প্রয়োজন।

কারণ একজন লেখকের লেখা তো সকলকেই আনন্দ দিতে পারে না, আর তা সম্ভবও নয়। কিন্তু মানুষ আমি সেই আনন্দটুকু দিতে সক্ষম হলাম না বলেই কি অপরাধী! আবার এও ভেবেছি, না, সম্পূর্ণ অন্য কারণেই ঐ নিষ্ঠুর কদর্য আক্রমণ আমার প্রতি।

আমি অতিমানুষ নই—অতি সাধারণ একজন মানুষ, তাই বেদনা আর দুঃখকে সম্পূর্ণ জয় করতে পারি নি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ আনন্দেও আমার বুক ভরে গিয়েছে যে যা বলে বলুক—তোমরা তো আমার আছো!

আর সেই তোমাদের মধ্যেই তুমি একজন।

তাই তোমার কথাটাই ভাবতে গিয়ে আজকে যেন হঠাৎই মনের সবটা জুড়ে ভেসে উঠলো আমার সেই মেয়েটির মুখখানা। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সেই মেয়েটির মুখখানা। যে মুখখানার দিকে চেয়ে কতবার মনে হয়েছে—থাক, নাই বা বললাম কি মনে হয়েছে। তার চাইতে বরং শুরু করি।

॥ ১ ॥

আজকের দিন হলে সম্ভব ছিল না।

কিন্তু তা তো নয়—প্রায় পঁচিশ বছর আগে ঐ বাড়িটা মাত্র পঞ্চাশ টাকায় ভাড়া নিয়েছিলেন কৃষ্ণার বাবা জীবানন্দবাবু।

কৃষ্ণা তখন জন্মায়ই নি।

জন্মানো কেন, কৃষ্ণার জন্মাবার সম্ভাবনাই কি তখন ছিল খুব বেশি? বরং বলা চলে, সম্ভাবনা একপ্রকার ছিলই না—।

তার কারণ আনন্দময়ী, কৃষ্ণার মা ছিলেন তখন দীর্ঘদিন ধরে রুগ্না এবং শয্যাশায়ী।

কলকাতার মেডিকেল কলেজের বড় সাহেব ডাক্তার আনন্দময়ীকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন, a case of intestinal T. B.

পরবর্তীকালের মত তখনও সে যুগে টি. বি. রোগের কোন মোক্ষম ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নি—শুধু বিশ্রাম—ক্যালসিয়াম ও পুষ্টিকর খাদ্য—কিন্তু তাতেই বা কয়জনাকে বাঁচানো যেত—তার উপরে আবার ফুসফুসের নয়—অন্ত্রের ক্ষয়রোগ।

সাহেব ডাক্তার তখনকার দিনের চিকিৎসানুযায়ী নির্দেশ দিয়েছিলেন, সম্পূর্ণ বিশ্রাম মানসিক ও দৈহিক দিক থেকে, খোলা হাওয়া ও পুষ্টিকর খাদ্য।

তা ছাড়া তখনকার দিনে আর করবারও তো কিছু ছিল না।

আজকের দিনের ক্ষয়রোগের অব্যর্থ ও মোক্ষম ঔষধগুলো তখন তো কল্পনারও বাইরে এবং আধুনিক শল্য চিকিৎসার ব্যাপারটারও তখন এতটা অগ্রগতি হয় নি।

সামর্থ্যের বাইরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেও তাকে দীর্ঘদিন টেনে নেবার মত অর্থসাফল্য জীবানন্দবাবুর ছিল না।

সরকারের আবগারী বিভাগে সামান্য দারোগাগিরি, কত টাকাই বা মাইনা।

তাই কিছুদিন এদিক ওদিক ঘুরে সাধ্যের অতিরিক্ত অর্থব্যয় করে অবশেষে শ্যামবাজার অঞ্চলে ঐ বাড়িটি পঞ্চাশ টাকায় ভাড়া নিয়েছেন জীবানন্দবাবু।

তখনকার দিনে মাসে পঞ্চাশ টাকার ভাড়া বাড়ি, বেশ বড় বাড়িটা।

দোতলা বাড়ি।

উপরে নীচে বেশ বড় সাইজেরই সাতখানা ঘর।

দক্ষিণটা একেবারে খোলা ছিল কারণ ঐ দিকটায় ছিল একটা বস্তি।

সেই বস্তি পার হয়ে একসার বাড়ি, তার ওদিকে ট্রাম লাইনটা।

পূর্বটাও মোটামুটি খোলাই ছিল।

উত্তর ও পশ্চিম দিকটায় বাড়ির পর বাড়ি। মধ্যে মধ্যে আঁকাবাঁকা সরু গলিপথ।

আজকের দিনের অতখানি চওড়া মেটাল বাঁধানো নয়া সড়ক—চিত্তরঞ্জন য়্যাভিনু তখনও দেখা দেয় নি। সারকুলার রোডে ট্রাম লাইন পড়ে নি।

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের ভাঙাচোরাও নয়।

রাস্তার পত্তন তো শুরু হয়েছে কৃষ্ণা যেবারে জন্মালো। ওর ছোড়দার মুখেই শোনা—ছোড়দা তখন স্কুলের ছাত্র—

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের দৌলতে শ্যামবাজারের ঐ অঞ্চলটায় অনেক ভাঙাচোরা হয়েছে, অনেক অদবদল হয়েছে, নতুন নতুন অনেক বাড়ি উঠেছে।

কৃষ্ণাদের ভাড়াটে বাড়িটা অনেক পিছনের দিকে এবং নতুন নতুন অনেক বড় বড় বাড়ির আড়ালে পড়ে গেলেও, বাড়িটা অক্ষতই থেকে গিয়েছিল আশ্চর্য রকম ভাবেই।

আর সেই সঙ্গে থেকে গিয়েছিল ঐ বাড়ির ভাড়াটে জীবানন্দবাবু।

ভাড়াটা বাড়াবার অনেক চেণ্টা করেছিলেন বাড়িওয়ালা হৃদয়রাম কুণ্ডু মহাশয় এবং তাতে সফল না হয়ে জীবানন্দবাবুকে তুলে দেবারও অনেক চেণ্টা করেছিলেন কিন্তু কোনটাতেই কুণ্ডু মশাই সক্ষম হন নি।

তাদের একেবারেই যে কিছুটা লাভ হয় নি তাও নয়।

মাঝামাঝি একটা রফা জীবানন্দবাবুকে করতে হয়েছিল।

নীচের তলার চারখানি ঘরের তিনখানি ঘর ও বাড়ির সামনে যে খোলা কাঠা দুই জায়গা ছিল তার ভোগদখল স্বত্বটা ত্যাগ করতে হয়েছিল জীবানন্দবাবুকে।

সেই কাঠা দুই জায়গার মধ্যেই কুণ্ডু মশাই নয়া ব্যবস্থা করেছিলেন, নীচের তলার তিনখানা ঘর সেই সঙ্গে যোগ করে নিয়ে।

সামনের গলিপথটা চওড়া হয়ে গিয়েছিল ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের দৌলতে।

গোটা-দুই দোকানঘর ও খানহয়েক ঘর নিয়ে দু'ঘর ভাড়াটে বসিয়েছিলেন সেই অংশে কুণ্ডু মশাই।

সর্বসমেত তিন ঘর ভাড়াটেদের, জীবানন্দবাবুকে নিয়ে, যাতায়াতের রাস্তাটা কিন্তু একই ছিল।

একটি প্রায় অন্ধকার সরু প্যাসেজ।

আলোর ব্যবস্থা অবিশ্যি ঐ সরু প্যাসেজের মধ্যে একটা ছিল, স্বল্পশক্তির বাল্ব। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই সেটা ফিউজ হয়ে যাওয়ার জন্য এবং তিন ঘর ভাড়াটেদের মধ্যে কারো সেই আলোর ব্যাপারে মাথাব্যথা না থাকার দরুণ বারোয়ারী আলোটা প্যাসেজের ফিউজ হয়েই থাকত এবং ফলে যা হবার তাই—সকলের গৃহে প্রবেশ ও নির্গমনের সরু প্যাসেজটা বছরের বেশীর ভাগ সময় আলোর একটা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অন্ধকারই থাকত।

জীবানন্দবাবুর সংসারটা খুব একটা বেশী বড় ছিল না।

স্বামী, স্ত্রী—দুই ছেলে তপন আর তাপস এবং শেষ বয়সের মেয়ে কৃষ্ণা ছাড়া বিধবা বোন রাধা ও তার অল্প বয়সের একটি বিধবা মেয়ে লাবণ্য।

সংসারে অন্যান্য দশজন বাপের মত সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসাবে তপন ও তাপস ছেলে দুটিকে জীবানন্দবাবুও লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার চেণ্টা

করেছিলেন, কিন্তু সফল হন নি।

তপন তবুও আই. এস-সি. টা পাস করে কোনমতে তৃতীয় বিভাগে—শর্টহ্যান্ড টাইপরাইটিং শিখে একটা বিলাতী সওদাগরী অফিসে টাইপিস্টের একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু তাপস ম্যাট্রিকের গন্ডীটাও পার হতে পারে নি।

বার তিনেক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে মোটর-ড্রাইভিংটা শিখে নিয়ে ড্রাইভারী করত অর্থাৎ কখনও ভাড়াটে লরি-বাস বা ট্যাক্সি চালাত।

তপনের চাইতে উপায় তার কম ছিল না, কিন্তু হলে হবে কি, দু'হাতে যা উপার্জন করত সব নেশা-ভাং করে উড়িয়ে দেবার জন্য সংসারে কিছুই বড় একটা সাহায্য করতে পারত না। বরং জীবানন্দবাবুর ঘাড়ে বসে বসেই খেত।

জীবানন্দবাবু মুখে কিছু বলতেন না বটে, কিন্তু তপন মধ্যে মধ্যে মার সামনে গিয়ে চেঁচামেচি শুরু করত।

কেন, রোজগার করে যখন সংসারে একটা পয়সাও দেবে না কেন? বলে দিও মা তোমার ছোটবাবুকে—টাকা না দিলে সামনের মাস থেকে এখানে থাকা চলবে না।

আনন্দময়ী চুপ করে শুনে যেতেন। সাড়াশব্দ করতেন না।

কারণ তিনি জানতেন বড় ছেলে তপনের যত হম্বিতম্বি তাঁর কাছেই।

তাপসের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলবার সাহস তার কোন দিনই হবে না।

একসময় নিয়মিত ব্যায়াম করায় রীতিমত ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারা। আর রাগও তেমনি প্রচণ্ড তাপসের।

দপ্ করে রেগে উঠলে দু-চারটে ঘা বসিয়ে দিতে তাপসের দ্বিতীয় জুড়ি আর নেই।

তাছাড়া একটা ব্যাপার কয়েক বছর আগে যা বলতে গেলে তপনের চোখের ওপরেই ঘটেছিল এবং যে ব্যাপারটা তপন কোন দিনও ভুলতে পারে নি।

ছোটবেলায় জীবানন্দবাবু তাপসকে অনেক মারধোর করেছেন। কিন্তু তাপসের যখন বছর পনের-ষোল বয়স সেই সময় একদিন জীবানন্দবাবু কি একটা কারণে একটা লাঠি দিয়ে যেমন তাকে দু'ঘা বসিয়েছেন, সহসা তাপস বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবানন্দবাবুর ডান হাতের কব্জিতে এমন একটা কামড় বসিয়েছিল যে, যার ফলে হাতে সেফটিক হয়ে দীর্ঘ দু'মাস তাকে ভুগতে হয়েছিল।

ঐ ঘটনার পর আর কখনও কোন দিন কোন কারণেই তাপসের গায়ে জীবানন্দবাবু হাত তোলবার চেষ্টা করেন নি!

মা আনন্দময়ীর অবিশ্যি বরাবরই ঐ ডাকাত গুন্ডা প্রকৃতির ছেলেটার ওপরে কেমন একটু বেশী স্নেহ ও প্রশ্রয় ছিল।

সেই কারণেই হোক বা কিছু দুনিয়ায় কাউকে যদি একটু-আধটু কখনও ভয় বা সমীহ করেছে তাপস, তা ঐ মাকেই।

এবং সংসারে কোন অর্থসাহায্য না করলেও, তাপস প্রতি মাসে কিছু টাকা অন্তত

মার হাতে তুলে দিতই।

দিয়ে বলত, খবরদার—এর একটা পয়সাও কিন্তু সংসারে দিতে পারবে না মা। এ তোমার—!

প্রথম প্রথম আনন্দময়ী মৃদু হেসে বলেছেন, তবে এ টাকা দিয়ে কি করব ?

কি করবে মানে ? তুমি হাত খরচ করবে।

প্রথম দিকে অবিশ্যি কোন দিনই কিছু বলেন নি আনন্দময়ী—তবে পরের দিকে জীবানন্দবাবু পেনসন্ নেওয়ার পর বলেছেন, তা সংসারে দু-চারটে টাকা দিতে তোর আপত্তিই বা কি রে ?

আপত্তি আবার কি ? তুমি মনে কর মা এই সংসারে আমি বিশ-ত্রিশটা করে মাসে মাসে টাকা দিলেই তোমার এই হতদরিদ্র সংসারের অভাব ঘুচে যাবে ? না—কিছু যাবে না—ফুটো কলসীতে যতই জল ঢাল না কেন, ও জল দেখতে পাবে না তুমি, সব কোন্ ফাঁকে কলসী থেকে বের হয়ে যাবে।

আনন্দময়ী প্রত্যুত্তরে মৃদু মৃদু হেসেছেন।

হাসছ কি ? তুমি মনে করো না মা, বড়বাবুর কথাগুলো আমার কানে আসে না ! আসে—বুঝলে, আসে। হুঁ—কবে চলে যেতাম মেসে—যাই না কেবল তুমি আছ বলে। তুমি চোখটি বোজ, আমিও হাওয়া। এ আবার একটা বাড়ি—কেবল দু'হাত বাড়িয়ে দাও—দাও, নেই—নেই—।

তা বড়বাবুকে না দিস নাই দিবি। তোঁর বাপ—আমি—তোর বোনটা—পিসি —এরা তো আছে।

না, না—কারো সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই—কথাটা বলতে বলতে খাকী সার্টটা আলনা থেকে টেনে স্যাণ্ডেলটা পায়ে ঢুকিয়ে ফট্‌ফট্ আওয়াজ তুলে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

তাপস অবিশ্যি টাকাটা মার হাতখরচার জন্য দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকত।

মা সে টাকা দিয়ে কি করছেন না করছেন সে নিয়ে কখনও মাথা ঘামাত না।

অবিশ্যি তাপস বেশীর ভাগ দিনই একবেলার বেশী দু'বেলা বাড়িতে খেত না! এবং তাও দিনের বেলা।

রাত্রে সে অনেক রাত করে ছাড়া বড় একটা বাড়িতে ফিরতই না। এবং বেশীর ভাগ রাত্রে—চৌরাস্তার মোড়ে শিখের দোকান থেকে রুটি মাংস খেয়ে ফিরত।

তবে বাড়িতে যতক্ষণ থাকত, তিন-চার কাপ চায়ের তার প্রয়োজন হত।

আসলে বাড়ির সঙ্গে তার বড় একটা বেশী সম্পর্কই ছিল না।

দোতলায় তিনখানা বড় ঘর ছাড়াও—ছোটো ছোট দুটো ঘর ছিল বারান্দার শেষ প্রান্তে ছাদের সঙ্গে একেবারে লাগোয়া।

তার একটায় থাকত কৃষ্ণা, অন্যটায় থাকত তাপস।

ঘর তাকে ঠিক বলা চলে না। ভাল করে নড়াচড়া করবারও জায়গা নেই। একটিমাত্র ছোট জানলা, তাও পশ্চিমমুখী।

সকালে তো রোদ ঢুকতই না—শেষ বেলায় যা সামান্য একটু ঢুকত।

বাকি তিনখানা বড় ঘরের মধ্যে একটিতে থাকতেন জীবানন্দবাবু ও আনন্দময়ী—একটাতে বিধবা পিসি রাধা আর তাঁর মেয়ে লাবণ্য ও অন্যটায় থাকত তপন সমস্ত ঘরটা নিয়ে।

তপন চিরদিনই একটু ছিমছাম বাবু গোছের।

পোশাক-আশাকের বাহার তার বরাবরই।

ঘরটি সে নিজের মনের মত করে গুছিয়ে ও সাজিয়ে নিয়েছিল।

একটি খাট, একটি আলমারি, একটি আলনা, একটি লেখবার টেবিল ও বসবার চেয়ার।

তা ছাড়াও ছিল একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড রেডিও সেট।

তপন মাইনে পেত একশ ত্রিশ টাকা এবং তার মধ্যে সংসার খরচের জন্য প্রতি মাসে মার হাতে সত্তরটি টাকা তুলে দিত, বাদবাকি টাকাটা তার নিজের খরচ।

জীবানন্দবাবু পেনসন্ পেতেন ষাটটি টাকা।

আনন্দময়ীকে হাতখরচা হিসাবে তাপস যে বিশ-ত্রিশটা টাকা দিত—ঐ সব নিয়েই কোনমতে আনন্দময়ীকে সংসার চালাতে হত।

কিন্তু সাতটি প্রাণীর কলকাতার মত শহরে তাতে কুলোবে কেন?

কাজেই অভাব—নাই-নাই সংসারে সর্বক্ষণ।

জীবানন্দবাবুর সঞ্চিত অর্থ বড় একটা ছিল না—সামান্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কয়েক হাজার টাকা।

তাও খরচ করতে করতে প্রয়োজনে আপদে-বিপদে কত দিন আর থাকে!

সংসারে যাবতীয় কাজ রাধা আর আনন্দময়ী করতেন চার হাতে।

ডাক্তার যাই বলুক, রুগ্ন কৃশ শরীর নিয়ে আনন্দময়ী কোনমতে আজও হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন এবং বেঁচেও আছেন।

এবং সন্তান হবার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না; তবু প্রৌঢ় বয়সে বলতে গেলে, জীবানন্দবাবুর পেনসন্ নেওয়ার আগের বছর, তাপসের যখন চৌদ্দ বছর বয়স, ঐ মেয়ে কৃষ্ণা হল। আনন্দময়ী চিরদিন রুগ্না থাকায় মেয়ের দেখাশোনার ভারটা যখন কোনমতে টানছিলেন, এমন সময় তিন বছরের মেয়ে লাবণ্যকে নিয়ে বিধবা হয়ে রাধা এসে ভাইয়ের আশ্রয়ে উঠল। এবং সেই থেকে রাধার কোলেপিঠেই মানুষ কৃষ্ণা।

জীবানন্দবাবু ছেলেদের পড়াবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও মানুষ করতে না পারলেও কিন্তু কৃষ্ণার জন্য তাঁকে কোন চেষ্টাই করতে হয় নি।

এক একটি ছেলে মেয়ে আছে যারা শত রকমের অসুবিধা এবং বাবা-মার দিক থেকে অবহেলা সত্ত্বেও আপনা থেকেই পড়ুয়া হয়ে ওঠে—পড়াশুনায় মনোযোগী হয় এবং তরতর্ করে পরীক্ষাসমুদ্র পার হয়ে যায়।

কৃষ্ণা ছিল সেই দলের।

কেউ তাকে কখনও পড়ার কথা বলে নি—তাগিদ দেয় নি—সে নিজের চেষ্টাতেই লেখাপড়া করে হঠাৎ একদিন দেখা গেল প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করে গিয়েছে।

পাস করবার পর আনন্দময়ী স্বামীকে বললেন, এবারে মেয়েটার যা হোক একটা বিয়ের চেষ্টা দেখ—

জীবানন্দবাবু পাত্রের সন্ধানও করতে শুরু করলেন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন মেয়ে এসে আনন্দময়ীর সামনে দাঁড়াল, মা—

আনন্দময়ী ছেঁড়া মশারিটা ছুঁচ-সুতো দিয়ে সেলাই করছিলেন ঘরে বসে।

মেয়ের মুখের দিকে না তাকিয়েই সাড়া দিলেন, কি ?

আমি কিন্তু বিয়ে করব না।

এবারে কিন্তু আনন্দময়ী মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন, সে আবার কি কথা ?

আমি পড়ব—আরও পড়ব—

বয়েস কৃষ্ণার তখন কিছুই নয় বলতে গেলে।

সবে চৌদ্দ পার হতে চলেছে। বরাবরই রোগাটে গড়ন।

গায়ের রঙও কালো।

কিন্তু সে কালোর উপরেও ছিল সমস্ত দেহ ছড়িয়ে কৃষ্ণার একটি আলগা শ্রী। আর মুখখানি কালোর উপরেও যেন নিখুঁত, ভাসা ভাসা দুটি বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দৃষ্টি।

বাঁশীর মত না হলেও বেশ টিকলো নাকটি।

পাতলা দুটি ঠোঁট—ধারালো চিবুক।

চিবুকের ডান দিকে একটি কালো তিল আর ডান চোখের ঠিক নীচে বড় একটি কালো তিল।

চিরদিন মিতবাক, শান্ত প্রকৃতির মেয়েটি। কিন্তু শান্ত স্বভাবটির মধ্যে ছিল কৃষ্ণার একটা সুদৃঢ় কাঠিন্য, যদিও সেটা সাধারণত প্রকাশ পেত না বড় একটা।

কিন্তু সেটা যখন প্রকাশ পেত যেন মনে হত ধারালো একখানি তলোয়ার।

আশ্চর্য !

আনন্দময়ীর তাপসের উপর যেমন বরাবর একটা অতিরিক্ত স্নেহ ও প্রশ্রয় ছিল, তেমনি ঐ অবাঞ্ছিত প্রৌঢ় বয়সের সন্তান কৃষ্ণার উপর ছিল একটা বিরাগ বা বিতৃষ্ণা বরাবর যেন, কেন তা কে বলবে।

আনন্দময়ী হঠাৎ এবারে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন, বিয়ে করবেন না পড়াশুনা করবেন, কি আমার নবাবনন্দিনী—বলি পড়বার টাকাটা আসবে কোথা থেকে শুনি ? বলে দুবেলা খাওয়া জোটে না—উনি কলেজে পড়বেন। যা—যা—আমার সমুখ থেকে যা—।

কৃষ্ণা কিন্তু তবু নড়ে না, যেমন ছিল তেমনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মুখখানা তার কেবল কঠিন হয়ে ওঠে।

ঘরের এক কোণে মলিন শয্যাটার ওপর বসে জীবানন্দবাবু ঐদিনকার ইংরাজী

সংবাদপত্রটা পড়ছিলেন।

মেয়েটা লেখাপড়ায় ভাল, উৎসাহ আছে পড়াশুনায়, জীবানন্দবাবু তাই কৃষ্ণাকে একটু স্নেহের চক্ষেই দেখতেন বরাবর।

মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে তাই তাঁর দুঃখই হয়। কিন্তু দুঃখ হলেই বা কি —সত্যিই তো কলেজে পড়ানোর খরচ তিনি যোগাবেন কোথা থেকে ?

নিরুপায়। ভদ্রলোক তাই চুপ করেই থাকেন।

আর সত্যি কথা বলতে কি, কেমন যেন একটু লজ্জাও বোধ করেন নিজের সন্তানের কাছে নিজের অসামর্থের জন্য—নিজের দৈন্যের জন্য।

আনন্দময়ী আবার ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন—যা—ছাদে বয়ামে আচারগুলো রোদে দিয়ে এসেছি, তুলে রাখ গে—।

কৃষ্ণা ঘর থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে গেল।

ঘরের বাইরে বারান্দায় পা দিতেই চোখাচোখি হয়ে গেল কৃষ্ণার ছোড়দা তাপসের সঙ্গে।

তাপস দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে ছিল। কথাগুলো তার কানে গিয়েছিল।

চোখাচোখি হতেই তাপস বললে, কি হল রে পেত্নী ?

তাপস কৃষ্ণাকে বরাবর 'পেত্নী' বলেই ডাকে।

আনন্দময়ীর দুই ছেলে তপন ও তাপসের গায়ের বর্ণটা ছিল টক্‌টকে গৌর, আনন্দময়ীর গায়ের রঙের মত।

জীবানন্দবাবুর গায়ের রঙও কালো নয়।

কিন্তু কৃষ্ণার গায়ের রঙ যে অমন কালো হল কোথা থেকে কে জানে!

কৃষ্ণা কোন জবাব দেয় না তাপসের কথায়। নিঃশব্দে পা বাড়ায় যাবার জন্য।

এই পেত্নী, শোন—

কৃষ্ণা এবারে দাঁড়ায়।

বাবার কাছে পড়ার কথা বলতে গিয়েছিলি কেন ? কোথা থেকে পড়াবে ? কিছু আছে নাকি, সব পেটায় নমঃ করে বসে আছে—একটা ভাল কাজ তো এদের পয়সায় হয় না—কেবল রাক্ষসের মত গিলতে পয়সা হয়। যাক্ গে শোন্—কোন্ কলেজে পড়বি ঠিক করেছিস কিছু ?

না—

তা স্কটিশ-চার্চ কলেজে পড় না—আমার এক বন্ধুর বোনও ওখানে পড়ে—পড়বি ?

টাকা কোথায় যে পড়ব ?

টাকা আমি দেবো—কাল খোঁজখবর নিয়ে আয় কত লাগবে ভর্তি হতে—মাসে মাসে মাইনে কত—।

আনন্দে চোখের তারা দুটো সহসা কৃষ্ণার চক্‌চক্ করে ওঠে।

বলে, সত্যি—সত্যি তুমি টাকা দেবে ছোড়দা আমার কলেজে পড়ার ?

দেবো—

সত্যি ?

হ্যাঁ রে হ্যাঁ। কিন্তু পাসটাস করে ছোড়দাকে আবার মুখ্যু বলবি না তো ?

কৃষ্ণা হেসে ফেলে।

হাসছিস কেন ?

কৃষ্ণা তবু হাসতে থাকে। তারপর হঠাৎ এগিয়ে এসে তাপসের পায়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে।

আরে, আরে—ও কি—

ছোড়দা, সত্যি তুমি খুব ভাল।

তাই নাকি ?

হুঁ। ভাল—খুব ভাল।

হয়েছে হয়েছে—এক কাপ চা করে আন্ দেখি—বলতে বলতে তাপস তার ঘরের দিকে স্যান্ডেলের ফট্‌ফট্ শব্দ তুলে এগিয়ে যায়।

॥ ২ ॥

সত্যি তাপস সেদিন ঘটনাচক্রে ঐ সময় এসে না পড়লে এবং মা-বাবার কথাগুলো তার কানে না গেলে কোনদিনই হয়ত কৃষ্ণাকে পড়াবার কথা তার মনে হত না—কৃষ্ণাও যেচে বলত না এবং ফলে কৃষ্ণার আর পড়াশোনাই হয়ত হত না।

সঞ্চিতার ঠিক ঐ কারণেই আর পড়াশুনা হয় নি।

কৃষ্ণার বান্ধবী সঞ্চিতা।

সেও কৃষ্ণার মতই প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেছিল কিন্তু তার আর পড়াশুনাও হল না—বিয়েও হল না—

সেখানেও ঐ এক ব্যাপার—দারিদ্র্য।

জীবানন্দবাবুর মত সঞ্চিতার বাবারও পয়সার অভাব।

কেরানীর সংসার, আট-দশটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সামান্য আয় সঞ্চিতার বাবা দেবব্রতবাবুর।

অন্যান্য আরও দশজন বাপের মত এ সংসারে নিজের সন্তানদের লেখাপড়া শেখাবার ইচ্ছা থাকলেও অর্থের অভাবেই সে বাসনাটুকু তাঁর পূরণ করতে পারেন নি।

তারপর দেবব্রতবাবু ভেবেছিলেন, যেমন করে হোক একটি পাত্র দেখেশুনে সঞ্চিতার আরও দুটি বোনের যেমন বিয়ে দিয়েছিলেন, এই মেয়েটিরও তেমনি একটা বিয়ে-থা দিয়ে দেবেন।

কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর চেষ্টার পরও পেরে ওঠেন নি।

ফলে পড়াশুনা তো সঞ্চিতার আর হলই না, বয়সটাও যেন দিনকে দিন এগিয়ে

যেতে লাগল।

মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণা ওর বান্ধবী সঞ্চিতাদের বাড়িতে যেত এবং দেখত, তার বান্ধবী স্কুল-জীবনের তার সহপাঠিনী কেমন যেন একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে।

এককালে যে স্কুলের বইয়ের ছিল পোকা, সে হয় এখন যত রাজ্যের নোংরা সিনেমা মাসিক ও সাপ্তাহিক নিয়ে সংসারের কাজকর্ম করে যে সময়টা সে হাতে পায়, সেই সময়টা সে মেতে থাকে, না হয় সামনের বাড়ির একটি কলেজের ছাত্রের সঙ্গে গোপনে প্রেমপত্র লেখালেখি করে।

এবং তার সঙ্গে আজকাল গল্প করতে বসলে হয় সে সিনেমার তারকা ও তারকাদের গল্প, না হয় ঐ কলেজের ছাত্রটিরই গল্প শুরু করে দেয়।

কৃষ্ণার কেমন যেন বিরক্ত বোধ হয়—একসময় একটা ছুতো করে উঠে পড়ে।

অবিশ্যি কৃষ্ণার পড়বার খরচ তাপস দিলেও তা নিয়ে অনেক বাঁকা বাঁকা কথা তাকে প্রথম প্রথম শুনতে হয়েছে, কিন্তু কারো কোন কথাতেই কৃষ্ণা কান দেয় নি।

সে তার নিজের কাজ করে গিয়েছে।

বেশী বাঁকা বাঁকা কথা বলেছে বড় ভাই তপনই—

বলেছে, মায়ের মেয়েটি ন্যাকা-পড়া করে জজ-মেজিস্টের হবেন—আর মার ভাবনা কি—

আনন্দময়ী প্রথমটা খেঁকিয়ে উঠলেও শেষটায় কিছু আর বলেন নি—মনে মনে ভেবেছেন—পড়ুক—কালো মেয়ে—টাকাও নেই—বিয়ে তো আর হবে না—

আর জীবানন্দবাবু খুশীই হয়েছিলেন।

আগে আগে কৃষ্ণা তার মা বাবার সঙ্গে এক ঘরেই থাকত কিন্তু কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠবার পর তাপসের ঘরের পাশের ছোট ঘরটা সে এসে অধিকার করেছিল।

পরামর্শটা তাকে দিয়েছিল তাপসই।

সন্ধ্যার পর পড়ার সময়টাতেই আনন্দময়ী এসে ঘরে জীবানন্দবাবুর পাশটিতে বসতেন এবং যত রাজ্যের গল্প শুরু হত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।

দুটো লোক যদি ঠিক পাশেই বসে ঘরের মধ্যে বকর বকর করে যায়, পড়ায় কি কখনও মন বসে?

কৃষ্ণার মনও তাই কেবলই বিক্ষিপ্ত হত।

অথচ কোন প্রতিবাদ জানালেই হয়ত আনন্দময়ী মেয়েকে খিঁচিয়ে উঠবেন তাই শেষ পর্যন্ত বিরক্ত চিত্তেই সে এক-একসময় উঠে পড়ত।

সোজা গিয়ে খোলা ছাতে আলোটা জেলে বসে বসে পড়ত।

সেদিনও এক শীতের রাত্রে গায়ে ছেঁড়া আলোয়ানটা জড়িয়ে ছাতের টিমটিমে আলোয় গভীর একাগ্র চিত্তে পড়ে চলেছে কৃষ্ণা।

রাতও বেশ হয়েছে, বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

কেবল মধ্যে মধ্যে জীবানন্দবাবুর ঘর থেকে তাঁর কাশীর শব্দ কানে আসে।

হঠাৎ তাপসের কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে কৃষ্ণা।

এই যে বিদুষী খনা-লীলাবতী দি গ্রেট—এই ঠাণ্ডার মধ্যে ছাতে একা একা এত রাত্রে বসে কি হচ্ছে ?

পেত্নী—আবার কখনও কখনও ঐ রকম বিদুষী খনা-লীলাবতী বলেও ইদানীং তাপস বোন কৃষ্ণাকে সম্বোধন করত।

কৃষ্ণা কিন্তু কোনদিন রাগত না। ছোড়দার ঐ ধরনের কথায় বরং হাসত।

আজও ছোড়দার ঐ সম্বোধনে মুখ তুলে ছোড়দার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল কৃষ্ণা।

তাপস আবার জিজ্ঞাসা করে, কি হচ্ছে এখানে বসে পেত্নীর ?

পড়ছিলাম ছোড়দা—

মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় কৃষ্ণা।

পড়ছিলি ?

হ্যাঁ—

তা বেশ, পড়ু—

কথাটা বলে তাপস আর দাঁড়াল না, সোজা নিজের ঘরের সামনে গিয়ে পকেট থেকে চাবিটা বের করে তালা খুলতে খুলতে হঠাৎ আবার ফিরে এসে দাঁড়াল কৃষ্ণার সামনে।

খনা-লীলাবতী দি গ্রেট !

কৃষ্ণা ইতিমধ্যে আবার পড়ার মধ্যে মন দিয়েছিল।

তাপসের কণ্ঠস্বরে মুখ তুলে তাকাল, কিছু বলছিলে ছোড়দা ?

বুঝতে পারছি আমাদের পূজনীয় ফাদার-মাদারের ফ্যামিলি কনভারসেসনের মধ্যে তোর পড়া হচ্ছে না—তাই না ?

কৃষ্ণা কোন জবাব দেয় না, চুপ করে থাকে।

খুব ন্যাচারাল—ওদের তো আর কাণ্ডজ্ঞান নেই—পাশে বসে যে একই ঘরের মধ্যে একজনের কলেজের পড়া তৈরী করতে হয়—কি করা যাবে বল্ তো বিদুষী খনা-লীলাবতী দি গ্রেট ? হোস্টেলে অবিশ্যি তোকে রাখতে পারলে ভাল হত সব দিক দিয়েই, এই ভিসাস সারকেল থেকে তুই মুক্তি পেতিস, কিন্তু সে যে ভাই অনেক টাকার দরকার—

না, না ছোড়দা—আমার বিশেষ কোন অসুবিধে হয় না, এখানে বসে বেশ নিরিবিলি—

তা বটে—তোর পেছনের গলিটা আরো নিরিবিলি। দেখ্ লীলাবতী দি গ্রেট—তুই এক কাজ কর্।

কি ?

আমার পাশের ঘরটায় তুই চলে আয়—

পাশের ঘরে ?

হ্যাঁ—যত রাজ্যের পুরনো রাবিশ ভর্তি ঘরটায়। কাল রবিবার আছে, সব সাফ করে দেবো—

সত্যি!

হ্যাঁ। কিন্তু—

কি?

ভয় করবে না তো একা একা রাতে ঐ ঘরে থাকতে?

ভয় করবে কেন, তুমি তো পাশের ঘরটাতেই থাক, খুব ভাল হবে ছোড়দা—সেই ব্যবস্থাই করে দাও।

হ্যাঁ দেবো, তবে—হঠাৎ যেন কেমন ইতস্তত করে থেমে যায় তাপস।

কি ভাবছ ছোড়দা?

ভাবছি—

কি?

তা আর ভাবাভাবির কি আছে এর মধ্যে! তুই তো জানিসই অ্যাফেয়ারটা—মানে আমি একটু-আধটু ড্রিঙ্ক করি, তুই তো জানিস! জানিস না?

জানি!

তাই বলছিলাম, জানিসই যখন অ্যাফেয়ারটা—তোর কাছে আর লজ্জা কি! তাহলে সেই ব্যবস্থাই করি, কি বলিস?

কর!

হ্যাঁ দেখ, ভাল করে পড়ে-শুনে মানুষ হয়ে যদি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারিস! বিয়ে তো আর তোর হবে না—নইলে বড়বাবুর যা মতিগতি—ঐ ওল্ড ম্যান চোখ বুজলেই হয়ত বলে বসবে—সব পৃথক হও। তবে আমার ভরসাও বেশী করিস না।

কৃষ্ণা তার ছোড়দার মুখের দিকে তাকায়।

আরে বুঝলি না, ড্রাইভার মানুষ, নেশা-ভাং-করি—কখন হয়ত একটা চরম অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে দুম্ করে পটল তুলেই বসব—

ছোড়দা—আর্ত চাপা কণ্ঠে ডেকে ওঠে কৃষ্ণা।

ভয় পেলি! ওরে—ঐ তো আমাদের মত ড্রাইভারদের এন্ড—

ছোড়দা—

কী—

ও কাজ তুমি ছেড়ে দাও ছোড়দা—

ছেড়ে দেবো, সে কি রে!

হ্যাঁ—ছেড়ে দাও।

ছেড়ে দিলে খাব কি?

না, না—ছেড়ে দাও—যে কাজের মধ্যে অত ঝক্কি—

হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে তাপস।

তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলে, তা কি আর হবে ? মরব—এই তো ? সে তো সব শালাকেই একদিন মরতে হবে রে—

না, না—ছোড়দা, ও কাজ তুমি ছেড়ে দাও—

লীলাবতী দি গ্রেট ! গলার স্বরটা যেন কেমন হঠাৎ থমথমে গম্ভীর মনে হয় তাপসের, তুই দেখছি ভীষণ সেন্টিমেন্টাল—যাক শোন্—

কি ? কৃষ্ণা বলে।

তোর পড়াশুনা করতে খুব ভাল লাগে, তাই না রে—! অনেক জানবার জিনিস ঐ সব বইয়ের মধ্যে আছে, তাই না ?

হ্যাঁ—

তাই বোধ হয় হবে—কেমন যেন কথাটা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় তাপস, মৃণালবাবুকে দেখি কিনা ! মোটর-মেকানিক হলে কি হবে ? আমাদের মোটর মেকানিক দেবেনের মত শুধু হাতেনাতে কাজ করে কাজ শেখা নয়—গাড়ির কলকব্জা-গুলোর সব নাড়ীর খবর পর্যন্ত যেন মৃণালবাবু জানে। তাই মাঝে মাঝে কি ইচ্ছে হয় জানিস ?

কি ?

রাত্রে তোর কাছে যদি পড়ি—পারি না ম্যাট্রিকটা পাস করতে ?

কেন পারবে না ? খুব পারবে—পড়ই না—কোন কঠিন নয়—

কৃষ্ণা আশ্বাস দেয় তাপসকে।

পড়ব আবার বলছিস—

হ্যাঁ—পড় তুমি।

তোর কথা শুনে ইচ্ছে হচ্ছে কোমর বেঁধে লেগেই পড়ি, কিন্তু—

আমি বলছি ছোড়দা, তুমি ঠিক পারবে—

ঠিক আছে, সে না হয় ভেবে দেখি—

না—ছোড়দা তুমি শুরু করে দাও—

পড়াতে বসে না পড়া পারলে কান মলে দিবি না তো ?

কি যে বল—

তাপস হেসে ওঠে।

তারপর বলে, ঠিক আছে—ঠিক আছে। আগে তো কাল সকালে তোর ঘরটার ব্যবস্থা করে দিই।

সত্যিই দেখা গেল পরের দিন সকালেই ঘুম থেকে উঠে তাপস তার ঘরের পাশের ছোট ঘরটা খুলে—ঘরের মধ্যে যে-সব পুরনো জিনিসপত্র বছরের পর বছর জমে উঠেছিল ধুলোবালিতে, সে-সব টেনে টেনে ছাতে বের করে দিচ্ছে।

ঘন্টা দুই পরিশ্রম করে সত্যিই তাপস ঘরটাকে পরিষ্কার করে ফেলেছে যখন, কৃষ্ণা ছাতে এসে ব্যাপারটা জানতে পারল।

কয়েকদিন থেকে আনন্দময়ীর শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না ; সকালে তপনের রান্না একা একা পেরে ওঠে না, তাই কৃষ্ণাকে যেতে হয়েছিল রান্নাঘরে পিসিমাকে সাহায্য করতে।

পিসিমার মেয়ে লাবণ্য—কৃষ্ণার চাইতে বছর দেড়েকের বড়ই হবে, এবং বলতে গেলে একপ্রকার তো ঘরে বসেই আছে, তবু সংসারের কোন কাজে কাউকেই কোন সাহায্য করে না।

লাবণ্যকে কিছু কাজের কথা বলতে গেলে রাধাই হাঁ হাঁ করে বাধা দিয়ে ওঠে, আহা—থাক—থাক—শোকে-দুঃখে মেয়েটা পাথর হয়ে আছে—

শোক-দুঃখ বলতে গেলে চরম শোক-দুঃখই এ বয়সে লাবণ্য পেয়েছে। কথাটা মিথ্যা নয়।

কিন্তু সত্যিই লাবণ্য পাথর হয়ে গিয়েছে কিনা কৃষ্ণা সেটা জানে না।

একপ্রকার জোর করেই বছর আষ্টেক আগে রাধা তার একটিমাত্র মেয়ে লাবণ্যর বিয়ে দিয়েছিল, লাবণ্য তখন মাত্র ক্লাস এইটে পড়ছে।

পাত্র সতীন্দ্র যে ছেলে খারাপ ছিল তাও নয়।

রেলের মালগুদামবাবু। মাইনেও মন্দ নয়—এটা-সেটা উপরি ছিল প্রচুর।

বয়েস অবিশ্যি একটু বেশীই হয়েছিল লাবণ্যের আন্দাজে, কিন্তু রাধা সেটা গ্রাহ্যও করে নি।

এবং দ্বিতীয় পক্ষ হলেও রাধা বলেছিল, তা হোক, আগের পক্ষের তো আর কোন ছেলেপুলে নেই—

জীবানন্দবাবু বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন বোনকে।

বলেছিলেন, লাবণ্যের বয়েস চোদ্দ—ছেলের বয়েস চুয়াল্লিশ—বয়েসের অনেক পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে রাধু—

কিন্তু রাধা বাধা দিয়ে বলেছিল, এমন আর কি, ও তুমি অমত করো না দাদা—বরাতে যদি ওর থাকে, এতেই রাজরাণী হবে—

তা যা বলেছিস। বেশ, আমি আর কি বলব, যা ভাল বুঝিস, কর্।

লাবণ্যর সঙ্গে সতীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু দেড় বছরও গেল না, লাবণ্য মায়ের কাছেই ফিরে এল মাথার সিঁদুর মুছে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে।

সতীন্দ্রনাথ বছর কয়েক ধরেই হাইপার টেনসনে ভুগছিল—হঠাৎ একটা করোনারী অ্যাটাকে দেড় ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল।

লাবণ্যর বয়স তখন ষোল বছর কয়েক মাস মাত্র।

রাধা যতটা কান্নাকাটি করল, লাবণ্য কিন্তু ততটা করল না। কারণ দেড় বছরের বিবাহিতা জীবনের মধ্যে মাত্র পাঁচ মাস শেষের দিকে একটানা লাবণ্য সতীন্দ্রনাথের ঘর করেছিল, সে সময়টুকুর মধ্যেও যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা নিবিড় সৌহার্দ্য গড়ে উঠতে পারে না, তেমনি নিবিড় একটা সৌহার্দ্য গড়ে উঠবার মত পরস্পরের মধ্যে বয়সের আকর্ষণও ছিল না।

লাবণ্য সহজেই সতীন্দ্রনাথকে ভুলে গেল।

জীবানন্দবাবুর ইচ্ছা ছিল রাধা আবার ফের মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়, কিন্তু রাধার ইচ্ছা থাকলেও লাবণ্য বললে, না, কৃষ্ণার চাইতে নীচু ক্লাসে গিয়ে আমি পড়তে পারব না।

বেশ তো, স্কুলে না ভর্তি হোস, বাড়িতেই পড়াশোনা কর্—প্রাইভেটেই না হয় পরীক্ষাটা দিবি—

লাবণ্য তাই শুরু করল।

কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল বই নিয়ে সে বসেই থাকে, পড়া সে কিছুই করে না। এবং ক্রমে পড়ার বইগুলোর বদলে এল উপন্যাস আর নাটক এবং যত রাজ্যের সিনেমার কাগজ।

সে সময় লাবণ্যর মা রাধা কড়া হলে হয়ত মেয়ের মতিগতি ফেরাতে পারত কিন্তু রাধা মেয়েকে প্রতিবাদের বদলে বরং প্রশ্রয়ই দিতে লাগল।

থাক—এ বয়েসে তো সবই খেয়াল। ঐ সব নিয়ে যদি ভুলে থাকতে পারে, থাক।

জীবানন্দবাবু প্রথম প্রথম একটু-আধটু বলেছেন, তিনিও যখন দেখলেন রাধাই তার মেয়েকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, তিনিও বলা ছেড়ে দিলেন।

রান্নাঘরের কাজ শেষ করে কৃষ্ণা তার ছোড়দার জন্য এক কাপ চা নিয়ে তার ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল।

সারা গায়ে চোখে মুখে মাথায় ধুলো-ভর্তি তাপসের তখন এক অপরূপ চেহারা।

তাপস ভাঙাচোরা জিনিসগুলো টেনে টেনে ছাতের এক কোণে নিয়ে গিয়ে জড়ো করছিল।

ঐ সময় কৃষ্ণাকে চায়ের কাপ হাতে আসতে দেখে কৃষ্ণার মুখের দিকে চেয়ে সহাস্যে তাপস বললে, থ্যাংক ইউ বিদুষী খনা-লীলাবতী দি গ্রেট, সত্যি প্রাণটা একেবারে চায়ের জন্য আইঢাই করছিল। দে।—হাত বাড়াল তাপস।

তোর ঘরটা ঠিক করে দিলাম—চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলে তাপস, দেখ ঘরের মধ্যে ঢুকে, ঘরটা নেহাত একেবারে মন্দ হয় নি। আয় দেখবি আয়।

তাপসের সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে কৃষ্ণা কিন্তু সত্যিই চমৎকৃত হয়।

কি বলিস—এবার আর তোর পড়াশোনায় হয়ত অত অসুবিধে হবে না—

ওঃ ছোড়দা—আনন্দে সচকিত হয়ে বলে ওঠে কৃষ্ণা, তোমাকে যে কি বলতে ইচ্ছে করছে—

বলে ফেল্ যা বলতে ইচ্ছে করছে।

Thousand and thousand thanks to you ছোড়দা—

যা—এবারে তোর সব জিনিসপত্র নিয়ে আয়! সব গোছগাছ করে দিই—

এক্ষুনি!

নিশ্চয়ই—সব তোর গোছগাছ করে দিয়ে আমি চান করতে যাব।

আমার আর জিনিসপত্র কি ? পড়ার বইখাতাপত্রগুলো—এক্ষুনি নিয়ে আসছি আমি—

কৃষ্ণা নীচে চলে যায়।

এবং একটু পরে কৃষ্ণা তার বইখাতাপত্র নিয়ে আসবার পর তাপস বলে, দাঁড়া—রোস, তোকে একটা টেবিল করে দিই—

টেবিল !

হ্যাঁ রে—দেখ্ না—

একটা কাঠের বাক্স, তার নীচে ইট পেতে—উপরে একটা ছেঁড়া চাদর বিছিয়ে তাপস কৃষ্ণার পড়ার টেবিল করে দিল এবং অন্য একটা বাক্স তার সামনে পেতে বললে, এই টেবিল আর এই চেয়ার। আপাতত এতেই চালিয়ে নে—আমার এক বন্ধুর গ্রে স্ট্রীটে সেকেন্ড-হ্যান্ড্ ফার্নিচারের দোকান আছে—দেখি তার ওখান থেকে যদি একটা টেবিল আর চেয়ার এনে দিতে পারি—

না না—কিছু দরকার নেই ছোড়দা—এতেই আমার চলে যাবে।

তা যাবে না কেন, তবে চেষ্টা করে যদি কমসমে পেয়ে যাই তো ক্ষতি কি ? সে সব তোকে ভাবতে হবে না, তুই শুধু পড়ে যা—

কথাটা বলতে বলতে তাপস ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কৃষ্ণা ঘরটার মধ্যে একাকী চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ছোট্ট—অতি ছোট ঘর।

তবু—এই অত্যন্ত স্বল্প পরিধির মধ্যেও খুশী আর আনন্দের সুর যেন রণিয়ে রণিয়ে উঠেছে।

ছোট্ট পশ্চিমের ঐ খোলা জানলাটা দিয়ে রোদ্রঝলকিত শীতের একটুখানি নীল আকাশের ইশারা।

আর কিছু চায় না। এইটুকু—এই পেলেই সে তার জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে।

সেই রাত্রে।

অনেক রাত তখন। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কৃষ্ণা সেই ছোট্ট ঘরটির মধ্যে বসে বসে পড়ছিল মোমবাতির আলোয়। কারণ অনেক দিনের অ-ব্যবহারে ঘরের ইলেকট্রিক লাইটটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

তাপস আলোটা জ্বালাতে পারে নি। বলেছিল পরে ঠিক করে দেবে মিস্ত্রী ডেকে এনে।

কিন্তু আলো না জ্বললেও কৃষ্ণার কোন অসুবিধা হচ্ছিল না।

ঘরের দরজাটা ভেজানোই ছিল। হঠাৎ খুলে গেল দরজাটা। কিন্তু টেরও পেল না কৃষ্ণা।

টের পেল না কৃষ্ণা যে তাপস এসে ঘরে ঢুকেছে।

প্রচুর মদ টেরে এনেছিল তাপস।

দু-চোখের দৃষ্টি তার রাঙা। সেই রাঙা দৃষ্টি নিয়েই তাকিয়ে থাকে কয়েকটা মুহূর্ত তাপস কৃষ্ণার অধ্যয়নরত মূর্তির দিকে।

জড়িত কণ্ঠে তারপর একসময় ডাকে, লীলাবতী দি গ্রেট—

কে? ও ছোড়দা?

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল কৃষ্ণা।

বস, বস্—আমি যাচ্ছি, তুই পড়্—

কৃষ্ণা অপলক চেয়ে আছে তাপসের দিকে।

তাপস টলছে একটু একটু। ভাল করে দাঁড়াতে পারছে না।

ছোড়দা?

কি রে?

যাবার জন্য ফিরে দাঁড়িয়েছিল তাপস, কৃষ্ণার ডাকে ঘুরে দাঁড়ায়।

চল, তোমাকে ঘরে পেঁছে দিয়ে আসি—

তাপস হেসে ফেলে, কেন রে?

তুমি দাঁড়াতে পারছ না—এগিয়ে আসে কৃষ্ণা তাপসকে ধরবার জন্য।

কিন্তু তাপস সহসা সরে দাঁড়ায়, না—না—আমায় ছুঁস নে—

ছোঁব না?

না। দেখছিস না মদ খেয়েছি।

তা হোক—চল—আবার একবার চেষ্টা করে কৃষ্ণা।

না রে না—বাড়ির সবাই আমাকে মদ খাই বলে ঘেন্না করে—একমাত্র তুই করিস না, আমি জানি—

ছোড়দা—

না রে—তুই আমাকে ঘেন্না করলে আর এক মুহূর্তও এ-বাড়িতে আমি টিকতে পারব না—তুই আমাকে ছুঁস না ভাই—

বলতে বলতে তাপস ঘর থেকে বের হয়ে গেল টলতে টলতে যেন।

আর কৃষ্ণা পাথরের মত ছোট্ট অপরিসর ঘরটার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল।

তার দু-চোখের কোল তখন জলে ঝাপসা হয়ে এসেছে।

॥ ৩ ॥

ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু কৃষ্ণার দু-চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তার চিবুক ও গণ্ড প্লাবিত করে দেয়।

মুহূর্তের আগের তাপসকে তো সে চেনে না। এ তাপস তো তার চেনা নয়। এ যেন অন্য সম্পূর্ণ অপরিচিত নতুন একটা মানুষ।

জ্ঞান হওয়া অবধি বরাবর দেখে এসেছে মানুষটা যেন এই সংসারের মধ্যে থেকেও এ সংসারের কেউ নয়। এ সংসারের কারো সঙ্গেই বলতে গেলে, তার কোন সম্পর্কই নেই।

খেয়ালী, নেশাখোর রগচটা এবং সংসারের সকলেরই অপ্রীতিভাজন মানুষটা।

তার সঙ্গেও যে খুব একটা কিছু কোনোদিন কোন সম্পর্ক ছিল, তা-ও নয়।

তবে এটুকু কৃষ্ণা জানত, তাপস যে কারণেই হোক, তাকে একটু বেশী স্নেহ করে। কিন্তু তাহলেও কৃষ্ণা তাপসকে ভয়ই করে এসেছে।

তাপস অযাচিতভাবে তাকে যতটুকু দিয়েছে, সে হাত পেতে নিয়েছে, কিন্তু কোন দিনই তার চাইতে বেশী কিছু চাইবার সাহস হয়নি।

কাজেই অন্য সকলের মত তার সঙ্গেও সব কিছু মিলিয়ে মানুষটার বরাবর একটা ব্যবধানই থেকে গিয়েছে। তাই আজ হঠাৎ মানুষটা সামনা-সামনি, একেবারে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তাপসের অন্তরের যে বিচিত্র রূপটা, যেটা এতকাল অন্য কারো দূরের কথা তার চোখেও পড়ে নি, কৃষ্ণাকে কেমন যেন বিহ্বল করে দেয়।

কৃষ্ণার দু-চোখের কোল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু নেমে আসে।

এবং অনেকক্ষণ পরে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে পায়ে পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসে।

তাপসের ঘরটা কৃষ্ণার ঘরের একেবারে পাশেই থাকায়, নিজের ঘর থেকে বেরুতেই তাপসের ঘরের আধ-ভেজানো দরজাপথে ঘরের মধ্যেকার আলোর আভাস কৃষ্ণার চোখে পড়ে।

কৃষ্ণা এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে তাপসের ঘরের সেই আধ-ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করে, তারপরই আধ-ভেজানো দরজাটা একেবারে সম্পূর্ণ খুলে তাপসের ঘরের মধ্যে পা দেয়।

তাপস তখনও শোয় নি। এমন কি তার বাইরের জামাকাপড়গুলোও গা থেকে নামায় নি।

পরিধানে সেই খাকী ময়লা লংসটা ও গায়ে হাফ-হাতা ক্রিম রংয়ের বুস সার্টটা —ফিতের খাটিয়াটার উপর বসে একটা বিড়ি টানছিল।

হঠাৎ ঘরের দরজাটা খুলে যাওয়ায় এবং কৃষ্ণা ঘরে প্রবেশ করায় একটু যেন চমকে এবং বিরক্ত হয়েই নেশাগ্রস্ত চোখ দুটো তুলে সামনের দিকে তাকাল।

কিন্তু চোখ তুলে সামনে কৃষ্ণাকে দেখে কুঞ্চিত ভ্রূযুগল সরল হয়ে এল।

কি রে লীলাবতী দি গ্রেট! কিছু বলবি?

খেয়ে এসেছ ছোড়দা?

কৃষ্ণার মুখ দিয়ে ঐ কথাটাই বের হয়ে আসে।

হঠাৎ ও কথা কেন রে?

কেন আবার কি? খেয়ে এসেছ কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি?

ততক্ষণে কৃষ্ণা অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে।

তাপস মৃদু হেসে বলে, তা ধর যদি খেয়ে না এসেই থাকি, খেতে দিবি তুই ?

কৃষ্ণা বলে, বুঝতে পেরেছি খেয়ে আস নি। দেখি—বলে দরজার দিকে পা বাড়াতেই তাপস তাকে বাধা দেয়—শোন্, শোন্—কোথায় যাচ্ছিস ?।

দেখি যদি কিছু রান্নাঘরে—

কিচ্ছু পাবি না। এ-বাড়ির ভাঁড়ারে যে মা ভবানীর চির-অধিষ্ঠান, তা কি আমি জানি না রে ? তাছাড়া আমি কটা রাত্রেই বা চারটি পাবার প্রত্যাশায় এ-বাড়িতে ফিরি, বল্ তো। যা, তোকে ব্যস্ত হতে হবে না। পেট পুরেই গর্জন সিংয়ের দোকানে রোটি কাবাব খেয়ে এসেছি আমি। যা—তুই তোর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড় তো, যা—

কিন্তু তথাপি কৃষ্ণা নড়ে না।

যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকে।

কি রে ? দাঁড়িয়ে রইলি কেন,—যা, অনেক রাত হয়েছে—

ছোড়দা !

কি ?

রাগ করবে না তো একটা কথা যদি বলি ?

না রে না—রাগ করব কেন। বল্ না কি বলবি ?

তুমি খুব বেশী ড্রিংক কর, না ? একটু যেন ইতস্তত করেই কথাটা বলে।

তাপস কৃষ্ণার আচমকা প্রশ্নে একটু চমকেই ওর মুখের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থাকে। তারপর বলে, হ্যাঁ, করি। কেন ?

আমার এক বন্ধুর মামা খুব বেশী ড্রিংক করত। তারপর লিভার খারাপ হয়ে পেটে জল জমে মারা যায়—খুব কষ্ট পায়—সেদিন বলছিল আমাদের—

সে কি আর বেশী মদ খাবার জন্যে রে ? তার মানে সে ভদ্রলোকের লিভার আগে থাকতেই হয়ত খারাপ ছিল—

না না—তা নয় ছোড়দা।

হ্যাঁ, তাই। আমার লিভার কোন দিনই খারাপ হবে না। আর শালা ধেনোয় আছেই বা কি—alcohol তো zero percent !···দেখ্ না, এক বোতল পুরো আজ খেয়েছিলাম—

এক বোতল ! চমকে ওঠে যেন কৃষ্ণা।

হ্যাঁ রে—তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে তাপস, এক বোতল, কিন্তু সব ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই ফুস্‌ফাস—মনে হচ্ছে নতুন একটা বোতল হলে—

কিন্তু কথাটা তাপসের শেষ হয় না। হঠাৎ কৃষ্ণার চোখের দিকে নজর পড়তেই ও থেমে যায়।

কৃষ্ণার দু-চোখের কোল বেয়ে তখন জল ঝরছে।

ও কি রে। কি হল—কাঁদছিস কেন ?

তুমি অত মদ খেয়ো না ছোড়দা—কান্নাঝরা গলায় কৃষ্ণা বলে।

তাই তুই কাঁদছিস ? আচ্ছা পাগল তো ! যা যা—শুগে যা—যা।

কৃষ্ণার আর দাঁড়াবার সাহস হয় না, ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

পাগল ! হাসতে হাসতে কথাটা উচ্চারণ করে আর একটা বিড়ি ধরায় তাপস।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বিড়িটা আর টানা হয় না।

বিড়িটা ধরিয়ে হাতে করেই বসে থাকে।

তারপর একসময় খেয়াল হতে চেয়ে দেখে হাতের বিড়িটা, ঘরের এক কোণে ফেলে দেয়।

না, সত্যিই নেশাটা একদম ঝিমিয়ে গিয়েছে। একটা পুরো না হোক, অর্ধেক একটা বোতল হলেও মন্দ হত না। তাছাড়া গা-গতরের ব্যথাই এখনও মরে নি যেন মনে হচ্ছে।

কাল রাত্রে বের হয়েছিল ট্রাকে করে মাল নিয়ে, সেই মাল আসানসোলে পৌঁছে দিয়েই আজ আবার রাত নটা নাগাদ ফিরে এসেছে কলকাতায়।

কলকাতা টু আসানসোল, আসানসোল টু কলকাতা ! মাঝখানে মাত্র ঘণ্টাখানেক জিরিয়েছিল।

একটানা প্রায় তেইশ ঘন্টা ট্রাক চালিয়েছে। মাজাটা যেন ধরে গিয়েছে।

অথচ শালা শুকলাল আগরওয়ালা বলেছিল মাল আসানসোলে পৌঁছে ফিরে এলেই পঞ্চাশটা টাকা দেবে।

কিন্তু দেবার বেলায় দিল মাত্র পঁচিশটা টাকা।

এক বোতল ব্ল্যাক নাইট আজ শখ করে কিনতেই তো প্রায় সব ফুস হয়ে গেল। পকেট একেবারে গড়ের মাঠ।

শুকলালকে অনুচ্চস্বরে একটা বিশ্রী গালাগালি দিয়ে আলোটা নিভিয়ে শয্যার ওপরে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল তাপস।

অন্যান্য দিন সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর খানিকটা তরল পদার্থ পেটে ঢেলে বাড়িতে ফিরে শয্যায় শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দু'চোখ ভরে ঘুম নেমে আসে তাপসের। তাছাড়া ঘুমটা তার চিরকালই সাধা।

অনেক সময় শয্যার পর্যন্ত প্রয়োজন হয় না, গাড়ির চামড়ার গদীটার উপর কোনমতে আড়াআড়িভাবে শুয়েও নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে তাপস কতদিন।

শুকলালের গ্যারাজের ক্লিনার চুনী বলে, মাস্টার, আচ্ছা ঘুম বাবা তোমার। একটু কাত হতে কোনমতে পারলেই হল—সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকা শুরু।

তাপস সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছে, শালা জানিস, আমি হচ্ছি এমপেরার নেপলিয়ান—

চুনীর বিদ্যার দৌড় কোনমতে ফার্স্ট বুকের এ বি সি ডি পর্যন্ত, তার বেশী সে এগুতে পারে নি—নেপলিয়ান তার কাছে দুর্বোধ্য।

সে তাই প্রশ্ন করেছে, সে ব্যাটা কে মাস্টার ?

ব্যাটা কি রে শালা, এমপারার সম্রাট—মহারাজের চাইতেও বড়।

কোথাকার সম্রাট মাস্টার সে ?

ফ্রান্সের ছিল—সারা ইউরোপকে থরহরি কম্পমান করে তুলেছিল—।

হিট্‌লারের মত বুঝি ?

হুঁ—

তা তার কথা বলছ কেন ?

এমপারার নেপোলিয়ঁ যুদ্ধের সময় ঘোড়ার পিঠে বসে বসেই ঘুমোত জানিস।

সর্বনাশ। তুমিও কি তাহলে গাড়ি চালাতে চালাতে স্টিয়ারিংয়ে বসে ঘুমোও নাকি মাস্টার ?

ভয়ে ভয়ে প্রশ্নটা করে চুনী তাকিয়েছিল তাপসের দিকে।

না, না, ঘুমোই নি কখনও—তবে ঘুমোতে আমি পারি—

আরে—না, না—ও মতলবও করো না। একে শালা যে স্পীডে তুমি গাড়ি ছোটাও, গাছের সঙ্গে একটা কলিশান—তারপর একেবারে দেখতে আর হবে না—সোজা দুজনেই ঐ সগ্‌গে—

তা একদিন না একদিন সগ্‌গে হোক বা নরকেই হোক, যেতে তো হবেই রে চুনী—

তা তো যেতে হবে। তাই বলে মাথা ফাটিয়ে, রক্তাক্ত হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে যাব কেন ? গোটা শরীরটা নিয়েই একেবারে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাব।

কিন্তু আজ সেই তাপসের চোখেই ঘুম আসে না।

চোখ বুজে অন্ধকারে ঘুমোবার চেষ্টা করে, কিন্তু তবু ঘুম আসে না কিছুতেই।

খালি চোখ বুজলেই বোজা চোখের তারায় ভেসে ওঠে কৃষ্ণার জলভরা দুটো চোখ।

বয়সে অনেক ছোট কৃষ্ণা তার থেকে। ছোটবেলা ওকে কত কোলেপিঠে করে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। স্কুল থেকে এসেই ঘরে ঢুকলেই, ছোট ছোট গোল গোল হাত দুটো ওর দিকে বাড়িয়ে দিত। একমাত্র ওর কাছেই যা আদর পেত কৃষ্ণা। তপন তো কোনদিন ওকে ছোঁয়িই নি। আর মা! মার তো বরাবর দেখে এসেছে ওর ওপরে কেমন একটা বিতৃষ্ণা।

ছোটবেলায় কালো রোগা লিক্‌লিকে ছিল। বেচারী জন্মাবার পর কোন দিন মার বুকের দুধই খায় নি—তা রোগা হবে না তো হবে কি ?

ছোটবেলা পেটরোগা ছিল বলে পিসিমা বাটি বাটি বার্লি আর শটির পালো খাইয়েছে। রাত্রেও ঐ পিসিমার কাছেই শুয়েছে!

এক-একদিন মাঝরাত্রে জেগে উঠে ক্ষিধের জ্বালায় কান্না জুড়ে দিত। জীবনানন্দবাবু চিৎকার করে বলতেন, গলা টিপে ধরে রাখো ওটার—

মা বলত—গলায় কাপড় গুঁজে দাও ঠাকুরঝি।

তপনও কম যেত না। বলত—ছাতে বের করে দিয়ে এস।

কেবল কোন জবাব পাওয়া যেত না পিসিমার। তবে তিনিও যে রীতিমত বিরক্ত হতেন, সেটা বোঝা যেত বেচারীর পিঠে যখন দুম্‌দুম্ করে কিল-চাপড় পড়ত—

ঘুম ভেঙে যেত তাপসেরও এবং এতক্ষণ সে চুপ করে শুয়ে থাকলেও ঐ প্রহারের

শব্দে আর কেন যেন চুপ করে শুয়ে থাকতে পারত না, ঘর থেকে উঠে গিয়ে পিসিমার ঘরে ঢুকে হাত বাড়িয়ে ক্রন্দনরতা কৃষ্ণাকে বুকে তুলে নিত। কৃষ্ণাও ঝাঁপিয়ে পড়ত ওর বুকের ওপর।

তারপর ঘর থেকে বের হয়ে ছাতে চলে যেত তাপস।

আর আশ্চর্য!

তাপস ওকে বুকে তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চুপ করে যেত ও। আর কোন সাড়া নেই—কাঁধের ওপরে মাথাটা রেখে ফোঁপাতে ফোঁপাতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ত কৃষ্ণা।

সেই ছোটবেলা থেকেই ধীরে ধীরে একটা স্নেহ পড়ে গিয়েছিল কেমন যেন ঐ মেয়েটার ওপরে তাপসের। তারপর ক্রমশ বড় হবার পর কেমন যেন একটু একটু করে গম্ভীর হয়ে গেল কৃষ্ণা। সবার স্পর্শ বাঁচিয়ে যেন সংসারে একপাশে দূরে দূরে সরে থাকত। তাপসও বুঝি তাই দূরে সরে গিয়েছিল।

তাছাড়া তাপস নিজেও তো সংসার থেকে দূরে সরে গিয়েছে। ইদানীং তো দেখাই হত না বড় একটা ভাই আর বোনে।

তবে দেখা হলে বাড়ির মধ্যে মাকে বাদ দিয়ে একমাত্র কৃষ্ণার সঙ্গেই যা দু-চারটে কথা আগ্রহ নিয়ে বলেছে তাপস।

কৃষ্ণা বড় হবার পর তাপসের নতুন করে তাকে ভাল লাগবার আরও একটা কারণ ছিল। তারই মত সে-ও এই সংসারে থেকেও সংসার থেকে দূরে, বেশী কথা বলে না—মিতবাক, নিজের স্কুল, পড়াশোনা ও বইখাতাপত্র নিয়েই নিজের মধ্যে যেন নিজে একটা ব্যূহ রচনা করে আছে।

কৃষ্ণার সঙ্গে তাপস কথা বলেছে বটে কিন্তু আজকের মত এত কথা তো কই কোন দিনই বলতে শোনে নি ওকে।

কৃষ্ণার কথাই ভাবে তাপস।

যতদূর ও পড়াশোনা করতে চায় কৃষ্ণাকে ও পড়াবে।

মনে পড়ে তাপসের, কৃষ্ণাকে শুধু ও মাসে মাসে কলেজের মাইনেটাই দিচ্ছে কিন্তু কলেজে পড়তে গেলে নিশ্চয়ই আরও আনুসঙ্গিক খরচা আছে।

বইখাতাপত্র, বাসভাড়া এসবও আছে। কলেজের মাস মাস মাইনে ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কিছুই তো দেয় নি ওকে তাপস।

কৃষ্ণাও অবিশ্যি চায় নি।

কলেজের মাইনেটাও মাসের পাঁচ-সাত তারিখে ও যখন দেয় কৃষ্ণা হাত পেতে নিঃশব্দে নেয়। অবিশ্যি সে নিজেও তো কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করতে পারত, আর কিছুর ওর প্রয়োজন আছে কিনা—তাও তো সে আজ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে নি।

সে কি চেনে না কৃষ্ণাকে? জানে না কি কৃষ্ণার মত মেয়ে সে না বললে নিজে থেকে মুখ ফুটে কিছু বলবে না?

সত্যি তাপসের কেমন লজ্জা হয়। সে মনে মনে স্থির করে কালই সে শুধাবে

কৃষ্ণাকে আর কিছুর তার প্রয়োজন আছে কিনা। নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, কিন্তু বলে না কেন ওকে কোন কথা!

শেষ রাত্রের দিকে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল তাপস।

কৃষ্ণার ডাকে ঘুমটা ভেঙে যায়।

ছোড়দা—চা, ছোড়দা—

কে? চোখ মেলে তাকায় তাপস।

বিদুষী খনা-লীলাবতী দি গ্রেট! সামনেই চায়ের কাপ হাতে কৃষ্ণাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে ওঠে তাপস।

তোমার চা ছোড়দা—

এক কাপ ধূমায়িত চা হাতে করে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণা—সেই হাতের চা-ভর্তি কাপটা তাপসের দিকে এগিয়ে ধরে।

তাড়াতাড়ি শয্যার উপরে উঠে বসে তাপস, চা—দে—

হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা বোনের হাত থেকে নেয় তাপস। কাপে একটা চুমুক দিয়ে আরামসূচক একটা শব্দ করে—আঃ!

চায়ের কাপটা তাপসের হাতে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিল কৃষ্ণা, পিছন থেকে তাপস ডাকল, শোন—

ঘুরে দাঁড়াল কৃষ্ণা, কিছু বলছিলে ছোড়দা?

হ্যাঁ।

কি?

তোর কলেজের সব বইখাতাপত্তর কিনেছিস?

নিঃশব্দে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে কৃষ্ণা।

কি রে—জবাব দিচ্ছিস না কেন?

তথাপি নিরুত্তর কৃষ্ণা।

বুঝেছি—কিন্তু তোর মত হাঁদা মেয়ে তো দেখি নি। পরীক্ষাতেই কেবল ভাল-ভাবে পাস করিস, আসল বুদ্ধি দেখছি একরত্তিও নেই। তা বলিস নি কেন আমাকে? আজ সন্ধ্যাবেলায় আমাকে হিসাব করে বলবি কত টাকার বই লাগবে! বুঝেছিস?

কিন্তু ছোড়দা—

কি?

আমি তো ক্লাসে প্রফেসারদের নোট নিই—সেই নোট পড়েই তো—

পড়া হয়ে যায় তোর—কিন্তু শুধু তো পাস করলেই তোর চলবে না। যেমন করেই হোক স্কলারশিপ তোকে পেতে হবে। যে যে বইয়ের দরকার আজ বলবি আমাকে। টাকা দেবো, সব বই কিনে নিয়ে আসবি।

কিন্তু—সে তো অনেক টাকা ছোড়দা—মিছিমিছি—

মিছিমিছি কি অ্যাঁ—মিছিমিছি—ভাবিস আমি মুখ্যু, তোর মত লেখাপড়া শিখি নি বলে বইয়ের কি ভ্যালু আমি বুঝি না, না? বই—বই চাই। নোটের জন্য

তো সব আসল কথা পাবি না—তাছাড়া জানি না তোদের ঐ সব কলেজের মাস্টার-দের, নাম্বার ওয়ান সব ফাঁকিবাজ—

রীতিমত একটা উত্তেজনাই যেন প্রকাশ পায় তাপসের কণ্ঠস্বরে এবং তাপসকে ঐ ভাবেই উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে দেখে হেসে ফেলে কৃষ্ণা।

এবং আসল কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারে না পাছে তার ছোড়দার মনে আঘাত লাগে বলে; এবং এটা তো সে অনেক দিনই বুঝেছিল—নিজের লেখাপড়া হয় নি বলে আজ ওর মনের মধ্যে একটা বেদনাবোধ গুমরে গুমরে ওঠে সর্বক্ষণই প্রায়।

হয়ত বা যে লেখাপড়াকে একদিন অবহেলা করেই শিক্ষামন্দির থেকে দূরে সে সরে এসেছিল, আজ সেই লেখাপড়ার প্রতিই তার মনের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগছে; অথচ সেটা প্রকাশ করতে পারছে না বলেই এবং আকাঙ্ক্ষা সফল করে তোলার কোন পথ আর নেই বলেই কৃষ্ণার ভিতর দিয়ে সেটাকে তৃপ্ত করতে চাইছে।

তাই কৃষ্ণা হাসতে হাসতে বলে, অনেক বইয়ের আমার দরকার নেই ছোড়দা, তবে কটা বই পেলে আমার ভাল হয়।

ঠিক আছে। কি কি বইয়ের তোর দরকার একটা লিস্ট করে কত দাম লাগবে আমাকে বলিস, আমি সন্ধ্যাবেলা তোকে টাকা দেবো'খন।

কৃষ্ণা কিন্তু কথাটা ভুলেই গিয়েছিল!

এবং সে রাত্রেও কৃষ্ণা যখন কলেজের প্রফেসারের দেওয়া নোটগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ছিল, তাপস এসে ঘরে ঢুকল।

আজ তাপস রাত সাড়ে দশটার মধ্যেই বাড়ি ফিরেছিল—যা সাধারণত বড় একটা সে ফেরে না।

তবে শীতের রাত, সাড়ে দশটা সে-ও তো বড় কম নয়, বাড়ির সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। একা কৃষ্ণাই নিজের ঘরে জেগে বসে পড়ছিল।

পদশব্দে কৃষ্ণা নোট থেকে মুখ তুলল, ছোড়দা—

পকেট থেকে দশ টাকার খান দশেক নোট বের করে তাপস এগিয়ে দিল, এই নে টাকা—বই কিনে নিস—একশো টাকা আছে এতে। আর যদি লাগে তো বলিস—

টাকাগুলো হাতে নিয়ে কৃষ্ণা বলে, একশো টাকা দিয়ে কি হবে ছোড়দা—টাকা ত্রিশেক হলেই হয়ে যাবে—

তাপস একটু কড়া সুরেই বলে ওঠে, টাকা ত্রিশেকেই হয়ে যাবে? অমনি বললেই হলো? তোদের এক একটা বইয়ের কত দাম আমি জানি না বুঝি? একি স্কুলের বই নাকি—এ হচ্ছে কলেজের বই!

আজ তাপস মদ্যপান করে আসে নি।

যা যেখান থেকে আজ যোগাড় করতে পেরেছে, সবই নিয়ে এসেছে কৃষ্ণার বই কেনবার জন্য। ঐ টাকা থেকে খরচা করে মদের বোতল সে কেনে নি।

এবং সেজন্য নগেনটার কাছে কম কথা শুনতে হয় নি।

সারাদিনের কাজকর্মের পর রাত্রে বাড়ি ফিরবার আগে শুকলালের গ্যারেজের পিছনদিককার ছোট ঘরটাতে বসেই নগেন আর তাপস দু'জনেই দুটো বোতল চুনীকে দিয়ে অনন্ত সাহার দোকান থেকে পিছনের দরজাপথে নিয়ে এসে বসে শেষ করত। সেই সঙ্গে গর্জন সিংয়ের দোকানের রোটি ও শিক-কাবাব চলত।

কিন্তু আজ যখন চুনী বোতলের দাম চাইলে, তাপস বললে, না—আজ বোতল আনতে হবে না চুনী—

চুনী তো অবাক। বললে, আনতে হবে না—আছে বুঝি একটা একস্ট্রা বোতল, মাস্টার?

না—একস্ট্রা বোতল তোদের জন্য রাখবার উপায় আছে?

তবে?

তবে আবার কি—আজ খাব না।

সে কি মাস্টার—আগরওয়ালার কাছ থেকে একটু আগে অতগুলো টাকা নিলে—

খিঁচিয়ে ওঠে তাপস, বলি টাকা নিয়েছি কি তোদের মচ্ছবের জন্যে—

অঃ, বুঝেছি—

ছোট ছোট চোখ দুটো ট্যারা করে তাকায় চুনী।

কি বুঝেছিস শুনি?

অপর্ণা চেয়েছে টাকা—

তাপস কেবল মৃদুকণ্ঠে বলে, খুব বুঝেছিস গর্দভ কোথাকার—বলে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে সেটায় অগ্নিসংযোগ করতে থাকে।

চুনি কিন্তু থামে না!

বলি, তা চেয়েছে চেয়েছে—অতগুলো টাকা দিতে হবে তার কি মানে আছে—

বলে ওঠে, যা জানিস না—তা নিয়ে মিথ্যে কেন তখন থেকে বক্‌বক্‌ করছিস বল্‌ তো—যা এখান থেকে।

চুনী অতঃপর উঠে চলে যায়।

হঠাৎই যেন অপর্ণার কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে গেল চুনীটা—

অপর্ণা—

অপর্ণার মুখটা মনের পাতায় ভেসে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন কেমন দুর্বল হয়ে আসতে থাকে—না, শালার মনকে বিশ্বাস নেই—

তাপস উঠে পড়ে এবং গ্যারেজ থেকে বের হয়ে সোজা বাড়ির দিকে হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে শুরু করে। সোজাই বাড়িতে চলে এসেছে তাপস। কোন দিকে তাকায় নি।

শেষ পর্যন্ত নোটের গোছাটা হাতে দিয়ে কৃষ্ণার ঘর থেকে বের হয়ে যায় তাপস।

নিজের ঘরে ঢুকে তাপস গিয়ে গায়ের জামাটা ছেড়ে ফিতের খাটিয়াটার উপর বসে একটা বিড়ি ধরায়।

বেশ শীত পড়েছে কদিন ধরে।

খোলা জানলাপথে হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

শীত-শীত করে তাপসের।

দড়ির আলনায় ছেঁড়া সোয়েটারটা ছিল, সেটা টেনে গায়ে দেয়।

এবং বিড়ি টানতে টানতেই মনে হয় কৃষ্ণা যা চেয়েছিল সেই টাকাটা দিলেই হত।

কিংবা গোটা পঞ্চাশেক দিয়ে বাদবাকি পঞ্চাশ থেকে অন্তত গোটা ত্রিশেক সে অনায়াসেই হয়ত অপর্ণাকে দিতে পারত।

সত্যিই অপর্ণার কিছুদিন ধরে অত্যন্ত অভাব আর টানাটানি চলছে।

দু'বছরের একটানা থিয়েটারের চাকরিটা হঠাৎ মাস চারেক হল নাকচ হয়ে গিয়েছে তার।

নতুন বইতে তার নাকি কোন পার্ট ছিল না, তাই 'নাটমঞ্চ' থিয়েটারের মালিক তাকে বরখাস্ত করেছেন।

অবিশ্যি আশ্বাস দিয়ে বলেছেন—আবার পরের বইতে তার যোগ্য কোন রোল থাকলে তাকে ডাকবেন নিশ্চয়ই।

কিন্তু সে তো অনিশ্চিত।

কালেভদ্রে অবিশ্যি অ্যামেচার পার্টি থেকে ডাক আসে, কিন্তু তাতে করে সংসার চালানো যায় না।

তাছাড়া সংসারটাও তো অপর্ণার নেহাত ছোট নয়।

নিজে—মা বিমলা—পক্ষাঘাতগ্রস্ত এক ভাই—তার স্ত্রী ও পাঁচ-সাতটি ছেলে মেয়ে দিদি মাধুরীকে নিয়ে বেশ বড়ই সংসার।

অপর্ণার উপরেই সংসারটা দাঁড়িয়েছিল।

আজ চাকরি যাওয়ায় প্রায় দু-বেলা দু-মুঠো ভাত জোটানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মধ্যে মধ্যে তাপস যা পারে সাহায্য করে। কিন্তু তাই বা কতটুকু পারে, তার সামর্থ্যই বা কি—

দিন দশেক আগে তাপস অপর্ণার ওখানে গিয়েছিল; এবং মধ্যে মধ্যে তাপস অপর্ণাদের বাসায় যায়; সেই সময়েই অপর্ণা বলেছিল বিশেষ করে তাকে কিছু টাকার জন্য লজ্জার মাথা খেয়ে।

অপর্ণার সঙ্গে তাপসের প্রায় বছর তিনেকের আলাপ—কিন্তু কখনও সেদিনের আগে অপর্ণা অমন করে তাকে টাকার কথা বলে নি।

প্রথম দিন যেদিন চাকরি যাবার পর তাপস তার হাতে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিয়েছিল, সেদিনও প্রথমটা টাকাগুলো তাপসের কাছ থেকে অপর্ণা নিতে চায় নি।

বলেছিল, না—তোমার কাছ থেকে আমি টাকা নিতে পারব না, তাপস।

কেন?

কেন, জিজ্ঞাসা করো না। নিতে পারব না তাই বলছি—

কিন্তু টাকার তো তোমার দরকার অপর্ণা—তাপস বলেছিল।

দরকার তো নিশ্চয়ই, আর টাকার কার না দরকার—

তবে? তবে নেবে না কেন?

তোমার হাত থেকে টাকা নিয়ে আমার মনটাকে কিছুতেই আমি মেরে ফেলতে পারব না।

তার মানে?

সহসা ঐ সময় অপর্ণার বুড়ি মা বিমলা ঘরের মধ্যে এসে একপ্রকার যেন ছোঁ মেরেই তাপসের হাত থেকে নোটগুলো নিতে নিতে বলে, আদিখ্যেতা—নেবো না—নিবি নি তো খাবি কি?

মা—

চেঁচিয়ে উঠেছিল অপর্ণা।

বিমলা ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। অপর্ণার তীক্ষ্ম কণ্ঠের ডাকে ফিরে দাঁড়ায় কি?

ফিরিয়ে দাও ওর টাকা—অপর্ণা বলে।

যা, যা—আর ঢঙ করতে হবে না। বলে বেশ্যের আবার সতীপনা—

বিমলা কথাটা বলে আর দাঁড়ায় নি। ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

অপর্ণা কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাপসের দিকে চেয়ে বলেছিল যাও—যাও তুমি—

অপর্ণা—

না, না—যাও— তোমার দুটি পায়ে পড়ি—যাও—যাও তুমি তাপসবাবু—

তাপস সেদিন অতঃপর বের হয়ে এসেছিল বটে, তবে দুদিন পরেই আবার গিয়েছিল আরও কিছু টাকা নিয়ে।

আশ্চর্য—সেদিন কিন্তু অপর্ণা টাকা নিতে আর আপত্তি জানায় নি।

এবং বিমলাকে ডেকে তার হাতে টাকাগুলো দিতে উদ্যত হতে অপর্ণাই হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাপসের হাত থেকে টাকাগুলো নিতে নিতে বলেছিল, দাও, আর লজ্জা করব না, আমিই নেবো—

একটু যেন বিস্মিত হয়েই অপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়েছিল তাপস।

হ্যাঁ তাপস, ভেবে দেখলাম বিনিময়ের প্রশ্নটা যখন নেই, তখন তোমার এ সাহায্যই। তবে একটা কথা—

কি?

যদি কোনদিন ফিরিয়ে দিতে পারি ফেরত নেবে তো? তাহলে আর তোমার কা থেকে হাত পেতে নিতে কোন কিন্তুই থাকে না।

ক্ষণকাল চুপ করেছিল তাপস, তারপর বলেছিল মৃদু কণ্ঠে, বেশ, যদি খুশি হও তো তাই দিও—

খুব খুশী হলাম। কথাটা বলে টাকাটা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে আবার বলে বল, কি খাবে?

খাব ? তাপস অপর্ণার মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ। এক কাপ চা করে আনি ?

না।

খাবে না ?

আজ নয়—এখুনি আমাকে ট্রাক্ নিয়ে আসানসোল যেতে হবে। টাকাটা দিতে এসেছিলাম—

বসো না—এক কাপ চা—কতক্ষণ আর লাগবে—

না—আজ চলি—

তাপস যাবার জন্য পা বাড়াল।

তাপস ! অপর্ণা ডাকল।

কি ? ঘুরে দাঁড়াল তাপস।

রাগ করলে ?

রাগ ! বাঃ, রাগ করব কেন ?

সত্যি রাগ কর নি ?

না, না—কথাটা বলে তাপস ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল।

কিন্তু মুখে সেদিন যাই বলুক, তাপস সত্যিই কি সেদিন প্রসন্ন মনে অপর্ণার বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিল ?

মনের কোণায় কোথাও কি সত্যিই কেমন যেন খানিকটা অভিমানের বাষ্প জমা হয়ে ওঠে নি ?

অপর্ণাকে ঘিরে ইদানীং মনের মধ্যে যে দুর্বলতাটা দানা বেঁধে উঠেছিল, আঘাতটা কি সেইখানেই এসে লাগে নি ? তারপর আরো কয়েক দিন গিয়েছে তাপস, কিন্তু সেই আঘাতটা কি আজও ভুলতে পেরেছে !

শুধু কি তাই ? রঙ্গজগতের এককালের প্রতিষ্ঠাবান অভিনেতা অমরেন্দ্রর অপর্ণার সঙ্গে যে সম্পর্কটা আজও অটুট রয়েছে, সে ব্যাপারটাও কি সে ভুলতে পেরেছে ?

তবু সে যায় আজও অপর্ণার ওখানে। না গিয়ে সে বেশীদিন পারে না, তাই যায়।

আর সত্যি কেন যে সে যায়, আর সকলের অজানা থাকলেও তার নিজের তো অজানা নেই।

মনের অগোচরে কোন পাপ নেই তবে অন্যকে ফাঁকি দিলেও নিজেকে ফাঁকি দেবে কমন করে—

আগে প্রথম প্রথম যখন অপর্ণার ওখানে সে যেত, মনকে বুঝিয়েছে, ক্ষতি কি—গাছাড়া অপর্ণাকে তার ভাল লাগে—

কিন্তু আজ ? আজও কি তাই ! তার বেশী কি কিছুই নয় ?

বন্ধুরা যে অপর্ণাকে নিয়ে নানান কথা বলে তার সম্পর্কে তা কি একেবারেই মিথ্যে !

সে রাত্রে অপর্ণার কথা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ যেন তাপসের মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মনে পড়ে হঠাৎ দিন সাতেক আগে সে কথা দিয়ে এসেছে অপর্ণাকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে আসবে—হয়ত সে সেই টাকার প্রত্যাশায় পথের দিকে চেয়ে রয়েছে।

টাকাটার সত্যিই হয়ত তার অত্যন্ত প্রয়োজন।

ছি ছি, খুব অন্যায় হয়ে গিয়েছে। কাল যেমন করে হোক, কিছু টাকার যোগাড় করে নিয়ে সে অপর্ণার ওখানে যাবেই।

হঠাৎ মনে পড়ে টিনের বাক্সটার মধ্যে গোটা চল্লিশেক টাকা তো আছে। দুর্দিনের জন্য জমিয়ে রেখে দিয়েছিল টাকাটা।

ঐ টাকাটাই তো তাপস অপর্ণাকে দিতে পারে।

আর কাল কেন—আজই তো দিয়ে আসতে পারে। এখুনি—অপর্ণার বাড়ি তো এখান থেকে বেশী দূর নয়!

আর রাত—রাত এখন কি-ই বা হয়েছে! বড়জোর সাড়ে এগারটা।

হ্যাঁ—আজই যাবে সে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল তাপস শয্যা ছেড়ে।

ঘরের কোণে রক্ষিত টিনের বাক্স থেকে চাবি দিয়ে টাকাটা বের করে জামার পকেটে ঢোকাল।

তারপর দড়ির আলনা থেকে পুরাতন গরম চাদরটা টেনে গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

নিজের ঘর থেকে বের হয়ে যেতে গিয়ে তাপসের নজরে পড়ে কৃষ্ণার ঘরের মধ্যে তখনও আলো জ্বলছে।

আর সেই আলোর সামনে একটা মোটা বই খুলে নিঃশব্দে বইটার খোলা পাতার দিকে তাকিয়ে বসে আছে কৃষ্ণা।

থমকে দাঁড়ায় তাপস।

মুহূর্তকাল যেন কি ভাবে, একটু ইতস্তত করে, তারপর মৃদুকণ্ঠে ডাকে, লীলাবতী—

কে?

চমকে মুখ তুলে তাকাল খোলা দরজার দিকে কৃষ্ণা।

আমি একটু বেরুচ্ছি রে—নীচের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যা।

একটু বিস্মিত হয়েই যেন কৃষ্ণা উঠে এগিয়ে আসে, এত রাত্রে কোথায় আবার যাবে ছোড়দা?

একটু কাজ আছে—বলতে বলতে এগিয়ে যায় তাপস।

কৃষ্ণা নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করে।

সমস্ত বাড়িটা একেবারে স্তব্ধ।

কেউ জেগে নেই। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কৃষ্ণা শুধায়, কখন ফিরবে ছোড়দা ?

ফিরব না।

ফিরবে না! রাত্রে আর ফিরবে না ?

না রে। চুনীর ওখানেই শুয়ে থাকব। রাত চারটে নাগাদ ট্রাক নিয়ে বেরুতে হবে—পাটনায় একটা মাল পৌঁছতে হবে—

কৃষ্ণা আর প্রশ্ন করে না।

ছোড়দা তাকে ভালবাসে খুবই বেশী। স্নেহ করে তাও সে জানে ; তবু আবার প্রশ্ন করতে সাহস হয় না কৃষ্ণার।

জানে তো ছোড়দাকে, এখুনি হয়ত ধমকে উঠবে।

তাই নিঃশব্দেই তাকে অনুসরণ করল!

তাপস বের হয়ে যাবার পর কৃষ্ণা সদর দরজায় খিল তুলে আবার উপরে চলে গেল।

সাড়ে এগারটা কলকাতা শহরে এমন কিছু একটা বেশী রাত নয়।

তবে শীতের রাত—সাড়ে এগারটা বাজলেই মনে হয় যেন রাত অনেক হয়েছে।

তাছাড়া কদিন ধরে শীতও পড়েছে কলকাতা শহরে সত্যি!

যাকে বলে কনকনে শীত।

গায়ের গরম চাদরটা দিয়ে মাথা ও কান ঢেকে নিল তাপস বেশ করে।

এক বোতল ধেনোর নেশা অনেকক্ষণ উবে গিয়েছিল।

নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে তাপসের মনে হয়, আর এক বোতল হলে মন্দ হত না।

কিছুদূর এগিয়ে গেলেই নয়া রাস্তা আর চিৎপুরের সঙ্গমস্থলে ছোট সরু গলিটা— যার অস্তিত্ব এখনও একেবারে লোপ পায় নি।

এবং যে গলিটা দিয়ে কয়েক পা গেলেই তেলেভাজার দোকানটা—সে দোকানের ঝাঁপটা এখন বন্ধ হয়ে গেলেও ভিতরে ও জানে এখনও আলো জ্বলছে।

পরিচিত গলার ডাক শুনলে প্রৌঢ়া মনোরমা এখনও সাড়া দেবে।

আর সত্যি কথা বলতে কি, 'সাড়া দেবে বলেই আলো জেবলে রাখে ভিতরে মনোরমা।

কারণ সে জানে প্রতি রাত্রেই অন্তত দু-চারজন তাকে রাত দশটা-বারোটার পর ডাকবেই। মনোরমার কাছে বোতল এখনও একটা অনায়াসেই পাওয়া যায়, যদিও দামটা একটু বেশী দিতে হবে।

সবাই জানে তবু কেউ প্রতিবাদ জানায় নি আজ পর্যন্ত ঐ চড়া দামের জন্য।

যাবে নাকি একবার মনোরমার দোকানটা ঘুরে!

ভিতরে বসে পানের সুবিধা অবিশ্যি নেই—তবে—তাপসের তাতে কিছু এসে যায় না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে বোতলটা গলায় ঢেলে দিতে পারে।

সেই ভাল, সত্যিই বড় ঠান্ডা পড়েছে।

তাপস দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলে মনোরমার দোকানের দিকেই।

মোড়ের পান-সিগারেটের দোকানটা তখনও বন্ধ হয় নি।

কে একটা ছোকরা বেসুরো গলায় কি একটা হিন্দী ফিল্মের গান গাইছে।

চলতে চলতেই প্রথম দুটো লাইন ওর কানে আসে।

মিলে আপ্ যব্ সে।

জিন্দীগী কিৎনী সোহানী হ্যায়।

বেসুরো গলায় হলেও গানের সুরটা মধ্যরাত্রির স্তব্ধতায় মন্দ লাগে না তাপসের।

কিন্তু গলির কাছাকাছি এসে হঠাৎ থেমে যায় তাপস।

অপর্ণার সামনে আজ পর্যন্ত কখনও সে নেশা করে যায় নি!

সহসা যেন থমকে দাঁড়ায় তাপস।

যাবে, না ফিরে যাবে?

সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণার মুখটা মনের পাতায় ভেসে ওঠে।

অপর্ণা।

সুন্দরী নয় অপর্ণা।

কিন্তু সমস্ত দেহে তার টলটলে যৌবনের এক চোখ-আবেশ-করা লাবণ্য যেন।

সুচারু কপালের দু'পাশ দিয়ে দু'গুছি কোঁকড়ানো চুল লতিয়ে নেমেছে। সামনের দুটো দাঁত একটু উঁচু।

তবু—তবু ওর মুখের দিকে তাকালেই মনটা কেমন করে ওঠে বার বার তাপসের।

অপর্ণার বাড়িতে যাওয়া-আসা করে অনেক দিন থেকেই তাপস—কিন্তু কেন জানি না আজ পর্যন্ত কোন ছল-ছুতোতেই স্পর্শ করে নি অপর্ণাকে তাপস।

অপর্ণার বাড়ির দিকে যেতে যেতে অকস্মাৎ এই শীতের মধ্যরাত্রে কেন যেন সেই কথাটাই মনে পড়ে তাপসের। সঙ্গে সঙ্গে আরও দ্রুত পা চালায়।

কতকটা একটা ঝোঁকের মাথাতেই হনহন করে হেঁটে এসে কলুটোলায় অপর্ণাদের বাড়ির গলিটার সামনে দাঁড়াতেই হঠাৎ যেন মনে হয় তাপসের, এই রাত্রে যে কারণেই হোক, অপর্ণাদের বাড়িতে গিয়ে সদর দরজায় ধাক্কা দেওয়াটা হয়ত যুক্তিসঙ্গত হবে না।

পাড়ার লোকরাই বা কি ভাববে। অপর্ণাদের যাই হোক ভদ্রপাড়া এটা!

অপর্ণার সত্যিকারের জীবনযাত্রার পরিচয়টা যদিও আশেপাশে অনেকেই জানে, তথাপি পাড়াটা ভদ্রপাড়াই তো।

দুখানা বাড়ির পরই অপর্ণাদের বাড়িটা একেবারে গলির মুখে।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে তাপস কি করবে, হঠাৎ ঐ সময় একটা রিকশার ঠুং ঠুং আওয়াজ ওর কানে আসে।

ফিরে তাকায় তাপস।

একটা রিকশা ঐ দিকেই আসছে।

রাস্তায় গ্যাসের আলোয় চোখে পড়ে তাপসের, রিকশায় পাশাপাশি বসে দুটি মানুষ।

রিকশাটা আবার সামনে আসতে রিকশার আরোহীদের ওর চিনতে দেরি হয় না।

অপর্ণা আর অভিনেতা অমরেন্দ্র বসু।

এত রাত্রে অমরেন্দ্রর সঙ্গে অপর্ণা ফিরছে!

কোথা থেকে ফিরছে?

ডায়মন্ড থিয়েটারের চাকরি যাবার পর থেকে তো তাপস জানে অমরেন্দ্র বসুর কোন থিয়েটারেই এখন কাজ নেই!

কিছুদিন আগেও অমরেন্দ্র বসু ডায়মণ্ড থিয়েটারের হর্তাকর্তা বিধাতা ছিল।

একাধারে নাট্যকার, পরিচালক, প্রধান অভিনেতা ও মঞ্চের ভিতরকার ব্যাপারের সর্বময় কর্তা। কিন্তু হঠাৎ কি হল!

মঞ্চের একমাত্র স্বত্বাধিকারী মহিমবাবু অমরেন্দ্রকে ছাড়িয়ে দিয়ে নতুন করে আবার ঢেলে ডায়মণ্ড থিয়েটার শুরু করেছেন।

অমরেন্দ্র তার পর থেকে এখানে-ওখানে মঞ্চ ভাড়া নিয়ে এক-আধ রাত অভিনয় করে বেড়াচ্ছে, এই তো জানত তাপস।

রিকশাটা তখন একেবারে তাপসের সামনে এসে পড়েছে।

এবং রাস্তার গ্যাসের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পায় তাপস দুজনকেই।

চট্ করে সরে দাঁড়ায়।

একটা ঝুল-বারান্দার নীচে তাপস নিজেকে আড়াল করে নেয়।

রিকশাটা এসে অপর্ণাদের দরজার সামনে দাঁড়াল এবং অপর্ণাকে নামিয়ে দিয়ে অমরেন্দ্রও যেই নেমেছে রিকশা থেকে, অপর্ণা বলে, ও কি! তুমি আবার এত রাত্রে নামছ কেন?

বাঃ! তবে এত রাত্রে কোথায় যাব আমি?

কোথায় যাবে মানে? বাড়ি যাও।

মানে সেই টালায়! তোমার কি মাথা খারাপ হল?

না না—আজ রাত্রে এখানে অসুবিধে আছে, যাও।

বলার ভঙ্গিটা এমন এবং কণ্ঠের স্বরটা এমন যে অমরেন্দ্র আর কি জানি কেন কোন প্রতিবাদ জানায় না।

রিকশায় আবার উঠে বসে রিকশাওয়ালাকে চালাতে আদেশ দেয়।

ঠুং ঠুং করে ঘন্টি বাজিয়ে রিকশাটা যে পথে এসেছিল সেই পথেই আবার চলে গেল।

অপর্ণা এবার দরজার দিকে এগিয়ে না গিয়ে সোজা অনতিদূরে যে ঝুল-বারান্দাটার নিচে অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়েছিল তাপস, সেই দিকে এগিয়ে আসে।

মৃদু কণ্ঠে ডাকে, তাপস!

অপর্ণাকে এগিয়ে আসতে দেখে ও তার কণ্ঠে তার নাম উচ্চারিত হওয়ায় সত্যিই তাপস চমকে উঠেছিল।

সহসা বুঝি তাই তার গলা দিয়ে কোন জবাব বের হয় না।

অপর্ণা আবার ডাকে, তাপস!

তাপস তবু চুপ।

আহা! সাড়া না দিলে কি হবে? চিনেছি গো চিনেছি।

আরও কাছে এগিয়ে আসে তাপসের অপর্ণা। তাপস চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু কি ব্যাপার, এত রাত্রে এখানে?

একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অপর্ণা তাপসের।

অদূরের রাস্তায় গ্যাসপোস্টের আলোর খানিকটা এসে তাপসের গায়ে পড়েছে।

ঊর্ধ্বাংশটা অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা না গেলেও নিম্নাংশটা দেখা যায়।

কি হল, কথা বলছ না কেন? আমার কাছেই এসেছিলে নাকি?

হ্যাঁ—

এতক্ষণে মৃদু সাড়া দেয় তাপস।

আমার কাছে? সত্যি?

সত্যি।

এত রাত্রে?

হঠাৎ মনে পড়ল তোমাকে, চলে এলাম।

বল কি! একেবারে যে নাটকীয়! অপর্ণা মৃদু গলায় হেসে উঠল।

অপর্ণা!

কিন্তু এভাবে এত রাত্রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাদের কোন পাহারাওয়ালা আলাপ করতে দেখলে খুব সহজভাবে ব্যাপারটা নেবে না—চল, ঘরে যাওয়া যাক।

ঘরে?

হ্যাঁ, এস—বলে অপর্ণা আর দাঁড়ায় না।

সোজা এগিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ায়। দরজায় তালা ঝুলছে একটা।

হাতের ঝোলানো ব্যাগ থেকে চাবি বের করে দরজার তালাটা খুলে পিছন ফিরে তাপসের দিকে তাকিয়ে বললে, এস—

তাপস বিনা বাক্যব্যয়ে অনুসরণ করে অপর্ণাকে।

অন্ধকার একটা সরু ফালি বারান্দা।

আলো ছিল বারান্দায়। তবু আলোটা জ্বালায় না অপর্ণা। অন্ধকারেই দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে বললে, এস।

তাপস তাকে অন্ধকারেই অনুসরণ করে।

অন্ধকার হলেও জায়গাটা চেনা, কোন অসুবিধা হয় না তাপসের।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় এসে নিজের ঘরের দরজা খুলে ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলোটা জ্বালাল অপর্ণা।

বললে, এস—ঘরে এস।

পায়ে পায়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাপস গিয়ে অপর্ণার ঘরের মধ্যে ঢোকে।

এবং এতক্ষণে ভাল করে যেন তাকায় তাপস অপর্ণার দিকে।

নিশ্চয়ই কোথাও প্লে ছিল, চোখে-মুখের প্রসাধন চিহ্ন সাবান ও তেল সহযোগে তুলে ফেললেও একেবারে মোছে নি।

চোখের কাজল, ভ্রূর কালো পেনসিলের টান, ঠোঁটের লিপস্টিকের রক্তাভা এখনও বোঝা যায়।

পরিধানে একটা মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ি।

বগল-কাটা ব্লাউজ গায়ে।

রাঙা ঠোঁটে মোহিনী হাসি ফুটিয়ে প্রশ্ন করে অপর্ণা, কি দেখছ অমন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে?

তাপস বোবা।

বস—দাঁড়িয়ে কেন? আবার অপর্ণা বললে।

ঘরের এক কোণে খাটে শয্যা বিস্তৃত—তারই পাশে একটা চেয়ার ছিল। তাপস সেই চেয়ারটার দিকে একবার তাকায় মাত্র।

বসল না।

বসবার কোন লক্ষণও দেখাল না।

কি ব্যাপার বল তো! একেবারে যে তখন থেকে বোবা! বলতে বলতে মৃদু হেসে এগিয়ে গিয়ে অপর্ণা ঘরের দরজায় ভিতর থেকে খিল তুলে দিতেই যেন চমকে উঠে প্রশ্ন করে তাপস, ও কি!

কি হল?

ঘরের দরজা বন্ধ করলে কেন?

কি করি। রাত তো কম হয় নি—

কিন্তু—

কেন বল তো? এত রাত্রে আবার ফিরে যাবার ইচ্ছে আছে নাকি?

বাঃ যাব না! যেতে হবে বৈকি!

কত রাত জান এখন?

অপর্ণার মুখের কথা শেষ হল না, বাইরের বারান্দার ওয়াল-ক্লকটায় ঢং করে একটা সময়-সংকেত শোনা গেল।

রাত সাড়ে বারটা—

উঃ, অনেক রাত হয়ে গেল! আমি তাহলে এবারে যাই।

আমাকে একা ফেলে?

মানে?

মানে আজ বাড়িতে আমি একা।

একা!

হ্যাঁ, মা দক্ষিণেশ্বরে গেছে। কিন্তু সত্যি আমার ঘুমে চোখ বুজে আসছে, এবার আমি ঘুমোব।

কথাটা বলতে বলতেই অপর্ণা এগিয়ে যায় ঘরের কোণে আলনার কাছে।

আলনা উপরে কতকগুলো শাড়ি কোঁচানো ছিল, তারই একটা হাতে তুলে নিয়ে তাপসের দিকে ফিরে তাকায়।

তাপসের বুকের ভেতরটা কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় যেন তখন রীতিমত ঢিপ ঢিপ করতে শুরু করেছে।

বোবা আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অপর্ণার মুখের দিকে, তাকায় কেমন যেন অসহায়ভাবে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে অপূর্ব হাসিতে উদ্ভাসিত করে হাত বাড়িয়ে ঘরের আলোর সুইচটা খুট করে টিপে দেয় অপর্ণা, মুহূর্তে ঘরটা অন্ধকার হয়ে যায়।

আর অন্ধকারে অপর্ণার হাসির তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে যেন সেতারের তারে সুরের মত।

অন্ধকারে হাসছে অপর্ণা খিলখিল করে।

তাপস সেই শীতের রাতেও ঘামতে থাকে

॥ ৫ ॥

দপ্ করে ঘরের আলোটা নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাপস একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গাঘাতে শক্ খাবার মত মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ অনড় হয়ে গিয়েছিল।

সমস্ত অনুভূতি যেন মুহূর্তের জন্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল তার।

সবটুকু বোধশক্তি যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল।

আর তারপরেই অন্ধকারে অতর্কিতে একটা কোমল দেহ তাপসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা পেলব হাতের নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়ল তাপস।

মৃদু একটা সুগন্ধ নাকে এসে ঝাপটা দেয় তাপসের।

তাপস!

ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ অনুরাগে ভরা একটা ডাক যেন সেই অন্ধকারে মর্মরিত হয়ে ওঠে। শিহরিত হয়ে ওঠে।

তাপস!

কোন জবাব বের হয় না তাপসের কণ্ঠ হতে।

এতটুকু কোন শব্দ পর্যন্ত শোনা যায় না।

কেবল তাপসের বুকের ওপর নিষ্পেষিত আর একটি কোমল বক্ষের ধুকধুকুনি ধক্‌ধক্ করে বেজে চলে।

অতি কোমল আঘাত হেনে হেনে চলে যেন।

তাপস!

তবু সাড়া নেই তাপসের।

পাথরের মতই পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে থাকে তাপস।

তাপসের সর্বাঙ্গে যেন একটা কোমল হাতের নিঃশব্দ পরশ এলোমেলোভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে তাকে—তার দেহের সর্বত্র।

শিহরিত করে যায় তার সমস্ত দেহ।

হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পায় তাপস।

তার অভিভূত চেতনা যেন সহসা সজাগ হয়ে ওঠে। সমস্ত ব্যাপারটা অকস্মাৎ যেন একটা ক্লেদাক্ত ঘৃণায় তার দেহের সমস্ত অণু-পরমাণুকে মোচড় দিয়ে ওঠে।

অত্যন্ত ধীরে ধীরে অপর্ণার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়, আর সেই সময়ই সর্বপ্রথম অপর্ণার মুখ থেকে তীব্র একটা অ্যালকহলের গন্ধ ওর নাসারন্ধ্রে এসে প্রবেশ করে।

আর একটা মুহূর্তও ইতস্তত করে না তাপস।

অপর্ণাকে সরিয়ে দিয়ে বলে ওঠে—আলোটা জ্বাল অপর্ণা—

তাপস!

আলোটা জ্বাল।

অপর্ণার দিক থেকে কোন সাড়া আসে না। তাপস তখন নিজেই হাত বাড়িয়ে ঘরের দেয়ালের সুইচটা অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে।

খানিকটা খুঁজতেই সুইচটা হাতের স্পর্শের মধ্যে পায়। খুট করে তারপর একটা শব্দ, ও ঘরের আলোটা জ্বলে ওঠে।

আর সেই আলোতে সামনের দিকে তাকাতেই তাপসের দু'চোখের দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ হয়।

সম্পূর্ণ—একেবারে সম্পূর্ণ নিরাবরণ অপর্ণা, তার হাততিনেক ব্যবধানে যেন পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে।

তার পায়ের কাছে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে অপর্ণার শাড়ি ও সায়াটা।

কি জানি কেন ঐ মুহূর্তে তাপসের ইচ্ছে হয়েছিল এগিয়ে গিয়ে ঠাস্ ঠাস করে গোটাকতক চড় বসিয়ে দেয় অপর্ণার দু'গালে, কিন্তু পারে না তা।

চোখ তুলে আর ফিরে তাকাতেই পারে না সামনের দিকে।

পুরুষ মাত্রেরই চিরদিনের গোপন লালসাটা যে এমনি করে অকস্মাৎ এমনি একটা ক্লেদাক্ত ঘৃণায় সারা দেহ ও মনকে ঘিনঘিন করে তুলতে পারে, বুঝি তাপস ইতিপূর্বে কোনদিন স্বপ্নেও তা ভাবতে পারে নি।

সঙ্গে সঙ্গে তাপস ঘুরে দাঁড়ায়—হাত বাড়িয়ে ঘরের আলোটা সুইচ টিপে পুনরায় নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারেই ঘর থেকে বের হয়ে যায় দরজার খিলটা খুলে।

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে অন্ধকারেই।

সদর দরজাটা খুলে রাস্তায় গিয়ে পড়ে; তারপর হনহন করে হাঁটতে থাকে।

পিছনে পিছনে যেন ভূতে তাড়া করে আসছে—হন্ হন্ করে রাস্তা ধরে হেঁটে চলে তাপস।

মধ্যরাত্রির নির্জনতা আর স্তব্ধতা চারিদিকে।

হনহন করে হেঁটে চলে তাপস।

এই কি কামনার শেষ কথা!

বাসনার শেষ ধাপ!

ঐটুকুর জন্যই কি অপর্ণার সান্নিধ্য তাকে বার বার আকর্ষণ করেছে! অদৃশ্য এক টানে টেনেছে তাকে অপর্ণার দিকে!

মন্ত্রমুগ্ধের মত বার বার সে এগিয়ে গিয়েছে!

তাই যদি হবে তো সেই তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমস্ত দেহ ও মনটা তাপসের অবিমিশ্র একটা ঘৃণায় ও কুশ্রীতায় ঘিনঘিন করে উঠল কেন অমন করে?

একটা মুহূর্তের বেশী সক্রিয় থাকতে পারল না কেন?

যে আবরণহীনতাকে অবচেতন মনে কত কামনা করেছে, সেই আবরণহীনতার মধ্যেই যে এমন কুশ্রী একটা ব্যাপার থাকতে পারে, এ যে সত্যি সত্যিই ভাবতে পারে নি তাপস।

ছি ছি ছি! কেন আলোটা জ্বালাতে গেল!

কেন? কেন? কেন?

প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তেই বাড়ির সামনে এসে একসময়ে পৌঁছল তাপস।

এবং বাড়ির সামনে এসে যখন তাপস পৌঁছল রাত তখন প্রায় দেড়টা।

সদর দরজাটা বন্ধ।

থমকে দাঁড়াল তাপস।

কৃষ্ণা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে, কে আর এত রাত্রে দরজা খুলে দেবে!

তবু দরজার কড়াটা ধরে নাড়ে খটখট করে তাপস। একবার দুবার তিনবার—আস্তে আস্তেই নাড়ে।

সে শব্দ কারোরই শুনতে পাওয়ার কথা নয় এত রাত্রে—বিশেষ করে ঘুমের ঘোরে। কিন্তু তবু কি আশ্চর্য!

তৃতীয় বার কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজাটা খুট করে খুলে গেল।

দরজা খুলে দিয়েছে কৃষ্ণাই। কৃষ্ণাই সামনে দাঁড়িয়ে।

কোন কথা বলে না তাপস। কৃষ্ণার পাশ কাটিয়ে ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে নিঃশব্দে।

পিছন ফিরে তাকায় না। সোজা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়। ছাতে নিজের ঘরটার মধ্যে এসে ঢোকে।

সুইচ টিপে আলোটা জ্বালায়।

আলোয় চারিদিকে একবার তাকায়, তারপরই জানালার পাল্লার উপর থেকে তোয়ালেটা নিয়ে নীচে কলতলায় চলে যায়।

নীচের একটা চৌবাচ্চায় দিনের পর দিন বাসি জল জমা করা থাকে, সেই জলই

ছোট বালতিটা করে নিয়ে হুড়হুড় করে বারকয়েক মাথায় ঢালে।

নিজের ঘরে ফিরে এসে তোয়ালে দিয়ে গা ও মাথাটা মুছে একটা লুঙ্গি পরে ও গেঞ্জি গায়ে দিয়ে চিরুনিটা দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে যখন, খোলা দরজার সামনে কৃষ্ণার মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ছোড়দা!

কে? ও তুই!

কৃষ্ণার হাতে এক কাপ ধূমায়িত কফি।

এই রাত্রে এত ঠাণ্ডার মধ্যে স্নান করলে কেন ছোড়দা?

ঠাণ্ডা কোথায় রে! ভীষণ গরম লাগছিল। চা এনেছিস? এত রাত্রে আবার কেন চা করতে গেলি?

চা নয়—

তবে কফি নাকি?

কফি।

কফি! কোথায় পেলি কফি?

আমার এক মাদ্রাজী বন্ধু মাদ্রাজ থেকে এক প্যাকেট কফি এনে আমাকে দিয়েছিল।

বাঃ, তাই নাকি! দে—

হাত বাড়িয়ে কফির কাপটা নেয় তাপস।

কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে আরামসূচক একটা 'আঃ' শব্দ করল তাপস, বাঃ! চমৎকার কফি বানিয়েছিস তো!

আনন্দে চোখের তারা দুটো চকচক করে ওঠে কৃষ্ণার।

ভাল হয়েছে?

ভাল মানে! একসেলেণ্ট—চমৎকার! কিন্তু তুই এত ভাল কফি বানাতে শিখলি কোথা থেকে রে পেত্নী?

আমার সেই মাদ্রাজী বন্ধুর কাছ থেকে।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে মাথা নীচু করে তাপস ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ অন্ধকারে অপর্ণা ঘরের মধ্যে যেমন দাঁড়িয়েছিল, স্তব্ধ হয়ে তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকে।

নেশা তখন তার উবে গিয়েছে।

আজ যা ক্ষণপূর্বে ঘটে গেল, এমনটি আর তো কখনও অপর্ণার জীবনে ঘটে নি।

শুধু আলোটা নিভিয়ে চলে যাওয়াই নয়, সেই সঙ্গে যেন খানিকটা ঘৃণার থুতু তাপস ওর সর্বাঙ্গে থু থু করে ছিটিয়ে দিয়ে গেল।

অপর্ণার উনিশ বছরের জীবনে এই যেন প্রথম অপর্ণার অভিজ্ঞতা হল—মেয়েমানুষের ভরা যৌবনের গায়ে এমন পুরুষও আছে যে ঘৃণায় থুতু ছিটিয়ে দিয়ে চলে

যেতে পারে। এ দুনিয়ায় এমন পুরুষও আছে—যে এমনি করে কদর্য অপমান করে যেতে পারে নারীর ভরন্ত যৌবনকে!

নিজের রূপ ও যৌবন সম্পর্কে যেদিন থেকে অপর্ণা সজাগ হয়ে উঠেছিল সেদিন থেকে তার একটা বুঝি ধারণা হয়েছিল—ঐ রূপ আর যৌবন দিয়ে সে অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

আর ইতিহাসেও তো তার নজিরের অভাব নেই।

কিন্তু এ কি হল!

যে তাপসের দু'চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে নিজের রূপ ও যৌবনকে প্রতিফলিত হতে দেখেছে বার বার, সেই চোখের দৃষ্টিতে এত ঘৃণা কোথা থেকে এল!

তবে কি সবটাই তার বোঝবার ভুল?

তাপস যে তার পাশে পাশে এতদিন ঘুরেছে সেটা মিথ্যা, সেটা কিছুই নয়—সবটাই কি তবে তার কল্পনা মাত্র?

সত্য তার মধ্যে কিছুই নেই।

হঠাৎ অপর্ণার দু'চোখের কোল ছাপিয়ে ঝরঝর করে জলে ঝরে পড়ে।

প্রায়-উলঙ্গ অপর্ণা অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে। অবিরল অশ্রুধারায় তার চিবুক ও গণ্ড প্লাবিত হতে থাকে।

ছি ছি! অপর্ণা এ কি করল!

অকস্মাৎ এমন দুর্মতি তার কেন হল?

কেন সে অমন করে আত্মবিস্মৃত হল?

কাঁদতে কাঁদতেই একসময় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না অপর্ণা, ভেঙে মেঝের ওপরে যেন লুটিয়ে পড়ে।

অন্ধকারে মেঝেতে শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে অপর্ণা।

তাপসের কাছে—এক পুরুষের কাছে কিছুক্ষণ আগেকার তার নিদারুণ পরাজয়টা যেন মর্মান্তিক এক লজ্জা ও বেদনায় তাকে দগ্ধাতে থাকে।

এক পুরুষের কাছে এক যৌবনবতী নারীর এ যে কি নিদারুণ পরাজয়—এ যে কি চরম অপমান…কি অপরিসীম গ্লানি, প্রতিটি ফোঁটা অশ্রুর ভিতর দিয়ে যেন অপর্ণা সেটা অনুভব করতে থাকে।

কাঁদতে থাকে অপর্ণা।

এবং অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে একসময় শান্ত হয়। ধীরে ধীরে উঠে বসে অন্ধকারেই।

সায়াটা ঠিক করে পরে—শাড়িটা পরে নেয়।

চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে চোখের কোলে।

ধীরে ধীরে উঠে অন্ধকারেই এগিয়ে গিয়ে জানালাটার সামনে দাঁড়ায়।

নীচে অন্ধকারে নির্জন সরু গলি-পথটা রাত্রির নির্জনতায় যেন থমথম করছে।

তাপস!

তাপস আজ তার গায়ে থুতু ছিটিয়ে দিয়ে গিয়েছে—যে তাপস সামান্য তার একটু কৃপাদৃষ্টির জন্য এতদিন লালায়িত হয়ে ওর চারপাশে ঘুরঘুর করেছে, যে তাপসকে ও সামান্য কৃপাদৃষ্টিতে ধন্য করেছে মাত্র !

সেই তাপস !

খুব বেশীদিন তাপসের সঙ্গে পরিচয় নয় অপর্ণার।

মাত্র বছর দেড়েক।

আর ঘনিষ্ঠতাটুকু মাত্র মাস আষ্টেকের।

ওদের পাড়ার ক্লাবে 'পদ্মিনী'র অভিনয়ে ও পদ্মিনী সেজে অভিনয় করেছিল। চমৎকার অভিনয় করে তাপসও।

তাপস করেছিল আলাউদ্দীনের ভূমিকা আর ও পদ্মিনী।

সেই আলাপের সূত্রপাত উভয়ের মধ্যে।

এবং সেই আলাপের সূত্র ধরেই অতঃপর মধ্যে মধ্যে এসেছে তাপস তাদের গৃহে।

দেখতে সুন্দর তাপস, সে-কারণে কিছুটা আকর্ষণ প্রথম থেকেই অনুভব করেছে অপর্ণা ওর প্রতি।

কিন্তু এও জেনেছে অপর্ণা লেখাপড়া শেখেনি তাপস—সাধারণ একজন ট্রাক-লরী-ড্রাইভার। অবশ্য ড্রাইভারী করে মন্দ উপার্জন করে না।

তবে তাপস লরীর ড্রাইভার। কোন প্রাইভেট গাড়ির নয়।

অপর্ণার মা তাপসের সেই পরিচয়টা পেয়েই বেশী মিশতে দিতে চায়নি কোন-দিনই মেয়েকে তাপসের সঙ্গে।

সরব ও নীরব দু'ভাবেই প্রতিবাদ জানিয়েছে অপর্ণার মা।

কিন্তু অপর্ণা মার ইচ্ছায় সায় দিতে পারেনি।

পুঁথিগত ও স্কুল-কলেজের বিদ্যা তাপসের পেটে কিছু না থাকলেও এবং সে সাধারণ লরী-ড্রাইভার হলেও তার চরিত্রের মধ্যে, ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যেটা অপর্ণাকে আকর্ষণ করেছে।

এবং সেই আকর্ষণেই সে ক্রমশ একটু একটু করে এগিয়ে গিয়েছে তাপসের কাছটিতে। সেই তাপস—সেই তাপস আজ তার গায়ে থুতু ছিটিয়ে দিয়ে চলে গেল !

অশ্রু নয় আর, চোখের তারা দুটো যেন অন্ধকারেই অপর্ণার জ্বলতে থাকে।

তাপস, তুমি ভেবেছ কি ? কি ভেবেছ আমাকে ? অপর্ণাকে তুমি এইভাবে অপমান করে যাবে আর অপর্ণা তাই সহ্য করে যাবে বিনা প্রতিবাদে ?

শুধু চোখের তারা দুটো নয়, অপর্ণার বুকটার ভিতরেও যেন জ্বলতে থাকে।

আক্রোশ আর ঘৃণায় বুকটা জ্বলতে থাকে।

॥ ৬ ॥

স্নান করেও কিন্তু তাপসের ঐ ঘিনঘিনে ভাবটা যায় না।

সমস্ত শরীরটা যেন এখনও জ্বলে যাচ্ছে।

কৃষ্ণা ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল, কফির কাপটাও ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায়।

শূন্য কফির কাপটা মাটিতে নামিয়ে রাখল তাপস।

রাত প্রায় সোয়া দুটো। কৃষ্ণা হয়ত এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ মনে পড়ে তাপসের—রাত ঠিক চারটে নাগাদ ট্রাক নিয়ে বেরুতে হবে।

ট্রাকে মাল বোঝাই হয়ে থাকবে, ট্রাক-ভর্তি মাল পৌঁছে দিতে হবে পাটনায়। ফিরতি পথে হাজারীবাগ হয়ে আসতে হবে—সেখান থেকে সুরজমলের গদি থেকে আবার মাল উঠবে ট্রাকে।

সঙ্গে চুনী যাবে। চুনীকে বলে দিয়েছিল তাপস রাত্রে তার ওখানে গিয়েই থাকবে—তারপর ভোর চারটে নাগাদ বের হয়ে পড়বে।

ছি ছি! বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে!

এখন না বেরুলে সকাল সকাল রওনা হতে পারবে না, এখুনিই বেরুতে হবে!

হাতীবাগানের কাছাকাছি একটা সরু গলির মধ্যে চুনী থাকে। গলির নামটা কখনও তাপসের মনে থাকে না।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল তাপস।

গায়ে জামাটা চড়িয়ে ঘর থেকে বের হয়ে পড়ল। কৃষ্ণার ঘরের সামনে এসে দেখে তার ঘরের দরজা বন্ধ।

ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই এতক্ষণে কৃষ্ণা। ইতস্তত করে তাপস, কৃষ্ণাকে ডাকবে কি ডাকবে না।

কিন্তু না ডাকলেও তো নয়, ডাকতেই হবে কৃষ্ণাকে। সদর দরজাটা তো আর খুলে রেখে যেতে পারে না! কেউ না কেউ বন্ধ না করে দিলে সে যায়ই বা কি করে!

আর কৃষ্ণা ছাড়া তার পক্ষে আর কাউকে ডাকা সম্ভবও নয়।

কিছুটা সংকোচ, কিছুটা দ্বিধা—শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণার বন্ধ দরজার কপাটে দুটো টোকা দিয়ে মৃদু চাপা কণ্ঠে ডাকে, লীলাবতী—

আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে সাড়া আসে, কে?

আমি—

ছোড়দা?

হ্যাঁ, দরজাটা খোল্ তো একটু—

দরজা খুলে কৃষ্ণা সামনে এসে দাঁড়ায়। বিছানায় শুলেও তখনও কৃষ্ণার চোখে ঘুম আসেনি। চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করছিল মাত্র।

কি হয়েছে ছোড়দা ?

কিছু না রে। আমি বেরুচ্ছি, নীচের দরজাটা বন্ধ করে দিবি চল্—

এত রাত্রে আবার বেরুবে ?

একদম ভুলে গিয়েছিলাম—বলেছিলাম না তোকে ভোর চারটের সময় ট্রাক নিয়ে বেরুতে হবে—চল্ দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসবি।

নীচে নেমে এলো তাপস—এবং ও বের হয়ে আসতেই কৃষ্ণা ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

তাপস রাস্তায় এসে নামে, পশ্চাতে দরজা বন্ধ করার শব্দটা শোনা যায়।

বেশী দূর নয় চুনীর বাড়ি।

জোরে হেঁটে গেলে মিনিট দশেক। কিন্তু জোরে হাঁটে না তাপস। মন্থর পায়ে হেঁটে চলে।

অদ্ভুত শান্ত ও নির্জন রাস্তাটা যতদূর দৃষ্টি চলে।

খানিকটা এগিয়ে ভুপেন বোস অ্যাভিনু।

দিনের বেলার সঙ্গে এহ রাত্রির কত তফাত !

তাপসের একটা বিচিত্র শখ আছে। দিনের বেলা সে যত সরু নোংরা গলিঘুঁজি দিয়ে হাঁটে, তা সে যতই কষ্ট হোক ; আর রাত্রে—হ্যাঁ রাত্রে, বড় চওড়া সড়ক ধরেই বেশীর ভাগ হাঁটে।

কত দিন বিনা কাজে বিনা প্রয়োজনে--কোন কাজের জন্য নয়, কোন প্রয়োজনেও নয়, বড় চওড়া সড়ক ধরে স্তব্ধ রাত্রে হেঁটে হেঁটে চলেছে।

বিচিত্র যেন মনে হয় তাপসের শহরের চওড়া বিরাট সড়কগুলো মধ্যরাত্রির স্তব্ধ-তায়।

দিনের বেলা যানবাহনে—অসংখ্য মানুষের এদিক ওদিক চলাচলে, গুঞ্জন ও নানাবিধ মিশ্র শব্দের বিচিত্র কলরবে যে সড়কগুলো অচেনা—রূঢ় কঠিন মনে হয়, মধ্য-রাত্রির স্তব্ধতায়—নির্জনতায় সেই সড়কগুলো যেন মনের মধ্যে তাপসের বিচিত্র এক সাড়া জাগায়। মনে হয়, অচেনা হলেও চেনা। কত পরিচিত, কতকাল যেন ঐ রাস্তায় রাস্তায় সে হেঁটেছে আর হেঁটেছে। মনে হয় তাপসের, যেন ও রাস্তাগুলো কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে কি কথা বলছে। বলছে যেন আস্তে চল—আমি আছি—আমি আছি।

শুধু কি তাই ? যেন আরো কি বলতে চায়।

যেন কখনো মনে হয় না দিনের বেলা! ঠিক তেমনি দিনের বেলা মনে হয় তাপসের সরু নির্জন গলিপথগুলো দিয়ে চলতে। অথচ রাত্রির নির্জনতায় ঐ গলি-পথগুলোই যেন মনে হয় মরে রয়েছে। প্রাণহীন।

কবরের তলায় কোন ঘুমন্ত মানুষের মতই যেন অতীত। আর তারা কোন দিন কথা বলবে না।

আজও রাত্রির স্তব্ধতায় ভুপেন বোস অ্যাভিনু ধরে হাঁটতে হাঁটতে একা একা মনে

হয় তাপসের—কারা যেন তার পাশে পাশে রয়েছে।

কারা যেন তার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেছে। সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে। তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ—ধুতি ও শাড়ির মৃদু খসখসানি, মৃদু লঘু পদশব্দ যেন রাতের স্তব্ধতায় মর্মরিত হয়ে উঠেছে।

ভূপেন বোস অ্যাভিনু! এ রাস্তা তো চিরদিন ছিল না।

নয়া সড়ক তৈরী হয়েছে। প্রশস্ত নয়া সড়ক। ছিল এখানে শ্যামবাজার ও বাগবাজার অঞ্চল।

ছিল ছোট-বড় অনেক বাড়ি—পাকা-কাঁচা। গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে—পাশাপাশি, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ছিল এলোমেলো রাস্তা।

সব ভেঙে তছ্‌নছ্‌ করে চওড়া সড়ক বের করা হয়েছে। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের পাকা চওড়া সড়ক।

যাদের বাড়ি ভেঙেছে, যাদের অস্বীকার করা হয়েছে—যাদের কেনা হয়েছে পয়সা দিয়ে এবং তাদের মধ্যে যারা বেঁচে নেই, তারাই যেন তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। পাশের একটা নাতিপ্রশস্ত রাস্তা দিয়ে গেলে অবিশ্যি অনেক আগেই পেঁছিনো যেত—তবু বড় রাস্তা দিয়ে যাবে বলে ঘুরে এল তাপস। নলিনী সরকার স্ট্রীটেরই একটা সরু শাখা।

একটা সরু গলি।

বেশ দূরে দূরে গ্যাস পোস্টগুলো থাকায় গলিটার মধ্যে আলোছায়ার একটা লুকোচুরির থমথমানি।

গা কেমন যেন সিরসির করে।

দুজনের বেশী তিনজন লোক পাশাপাশি হাঁটা যাবে না, এত সরু, এত অপ্রশস্ত। সেই গলিরই শেষ প্রান্তে কয়েকটা খোলা ও টিনের ঘর। এজমালি ব্যবস্থা।

এবং তারই মধ্যে মাথা গুঁজে কোনমতে রয়েছে ছেলে, বুড়ো, জোয়ান, যুবতী ও শিশু মিলে অনেকগুলো নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার।

তাদেরই একজন চুনীরা।

চুনীরা অর্থাৎ চুনীর চৌষট্টি বছরের আফিংখোর হেঁপো রোগী বাবা সতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চুনীর মা সাবিত্রী—চুনীর বিধবা বৌদি আশা ও ওদের অর্থাৎ চুনীর মৃত দাদার বছর সাতেকের ছেলে নিমাই।

এই সাড়ে চারজন প্রাণী নিয়ে চুনীরা। চুনীদের সংসার।

চুনীর বাবা সতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এককালে পোর্ট কমিশনারে চাকরি করত। সে চাকরি কবে শেষ হয়ে গিয়েছে—সে চাকরির প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতির টাকাও কবে শেষ হয়ে গিয়েছে।

অবিশ্যি তার জন্য কোন দুঃখ ছিল না।

চুনীর দাদা অতীন্দ্র বি. এ. পাস করে খড়দার একটা জুট মিলে ভাল চাকরি পেয়েছিল, যার ফলে রিটায়ার করার কয়েক বছরের মধ্যে দারিদ্র্যের একটা নিষ্ঠুর কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল, সেটা অপসারিত হয়েছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য সংসারটার। পাঁচটা বছরও গেল না, অকস্মাৎ অ্যাক্সিডেন্টে চুনীর দাদা অতীন্দ্র মারা গেল।

বিয়ে করেছে আশাকে তখন মাত্র দেড় বছর হয়েছে এবং ছেলে নিমাইয়ের বয়স মাত্র সাত মাস।

চুনী অর্থাৎ মণীন্দ্র অনেক ছোট বয়সে অতীন্দ্রর—বছর সাতেক তো হবেই।

লেখাপড়ার দিকে কোনকালেই তার মন ছিল না। শুকলালের গ্যারেজে সাধারণ মেকানিকের কাজ করত অর্থাৎ শিক্ষানবিসী।

একসময় কানাইয়ের সঙ্গে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াত।

তবে স্বাস্থ্য বুদ্ধি দুই-ই ছিল চুনীর। কিছুতেই কিছু করল না।

অতীন্দ্র হঠাৎ মারা যাওয়ায় নিরুপায় চুনীর ঘাড়েই এসে সংসারটা পড়ল। কানাইকে এসে সে একদিন বলল, ওস্তাদ, কিছু টাকা-পয়সার ব্যবস্থা না হলে তো শুকিয়ে মরতে হবে এবার—

কানাই-ই তখন শুকলালকে বলে-কয়ে গ্যারেজে শিক্ষানবিসীরা কাজটা করিয়ে দেয় চুনীর।

কিন্তু সে কাজে আর কত মাইনে। কাজেই কানাই টুকটাক কাজের জন্য পাইয়ে দিত কিছু কিছু মাসে মাসে চুনীকে।

তারপর তাপসের সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হলো ক্রমশঃ চুনীর। এবং তাপসের কেন যেন চুনীকে ভাল লেগে যায়।

তাপস ট্রাকভর্তি মাল নিয়ে লম্বা লম্বা খেপ দেয়—পাটনা—রাঁচী—হাজারীবাগ—গয়া—গোমো—আসানসোল—শুকলালকে বলে তাপস চুনীকে অ্যাসিস্টেন্ট করে নিয়ে নিল।

তাপসের সঙ্গেই চুনী ঘুরতে শুরু করল।

তাপস যে কেবল ড্রাইভিং জানত ভাল তাই নয়, কিছু কিছু টুকটাক মেসিনের কাজও শিখেছিল।

তাপস চুনীকে টুকটাক কাজ শেখাতে থাকে নিজের সুবিধার কথা ভেবে। চুনীও মাস্টারের ছোটখাটো ডিফেক্টের কাজ কয়েক মাসের মধ্যেই শিখে নেয়।

চুনীর আয় বাড়ল।

একটা পচা বস্তিতে কোনমতে ছিল সতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রোজগেরে জ্যেষ্ঠ পুত্রের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর। বছর দুই বাদে চুনী এনে ঐ গলির টিনের চাল-দেওয়া ঘরে তুলল।

বেশী বয়স হয়নি এখনও চুনীর।

বছর তেইশ কি চব্বিশ হবে, ষণ্ডা-গুণ্ডা মার্কা চেহারা।

এখন দু'পয়সা কামাচ্ছেও।

সতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ইচ্ছে এবারে ছেলে বিয়ে করুক। এবং বাপ সতীন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের যত না ইচ্ছে, তার চাইতেও বেশী ইচ্ছে মা সাবিত্রীর।

কিন্তু চুনী আদপেই রাজী নয়।

কেন যে চুনী রাজী নয়, প্রথমটায় তাপস বুঝতে পারেনি। বরং চুনী বিয়ে করতে চায় না শুনে মনে মনে তাকে সমর্থনই করেছে।

বলেছেও, করিস না বিয়ে—ওরা যাই বলুক। শালা এই তো দুটো পয়সা আয়; তা এতগুলো লোককে খাওয়াবি কি?

চুনী বলেছে, বল তো—বল তো মাস্টার। ওই হেপো রোগী বাপ আমার সেটা কি বুঝবে? বলে 'নিজের জোটে না তো শঙ্করাকে ডাক'—যত সব—

তখন বোঝেনি ঠিক, তাপস পরে বুঝেছিল। আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। চুনী ঠিক যে কারণে বিয়ে করতে চায় না, চুনীর মা ঠিক সেই কারণেই চুনীর একটা বিয়ে দেওয়ার জন্য যেন উঠে-পড়ে লেগেছে।

ব্যাপারটা অবিশ্যি বুঝতে পেরে তাপসের প্রথমটায় সত্যিই খুব রাগ হয়েছিল চুনীর ওপর।

ইচ্ছে হয়েছিল মাথায় বেশ কয়েকটা গাঁট্টা বসিয়ে দিয়ে নিজের কাছ থেকে দূরে করে দেয়, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি শেষ পর্যন্ত।

এবং শুধু যে চুনীর ওপরই রাগ হয়েছিল তাপসের তাই নয়—আর একজনের ওপরও হয়েছিল,—ঐ আশা মেয়েটার ওপর!

মনে হয়েছিল মেয়েটা নিশ্চয়ই নষ্ট চরিত্রের। অল্পবয়সী দেবরটির মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছে।

কিন্তু অকস্মাৎ মেয়েটার প্রতি সমস্ত ধারণাটা যেন তাপসের পাল্টে গেল।

মধ্যে মধ্যে চুনীর ওখানে যেতো তাপস; কিন্তু আশাকে নিয়ে চুনীকে সন্দেহ করবার পর ইচ্ছে করেই বড় একটা ওদিকটা মাড়াত না।

মরুক গে, যা খুশি তাই করুক গে। ওর ভাল-মন্দয় আর তাপস নেই।

কিন্তু সেদিন একটিবার না গেলেই নয়। দিন পাঁচেক আসেনি চুনী গ্যারেজে। এদিকে লম্বা একটা খেপ দিতে হবে ডালটনগঞ্জ, পথে সঙ্গে চুনী না থাকলে হাজারো অসুবিধা।

প্রথমটায় ভেবেছিল তাপস চুনীকে সঙ্গে নেবে না। অন্য কাউকে নেবে।

শেষটায় কি ভেবে স্থির করে—চুনীকেই নেওয়া ভাল। ও বেটা আটঘাট জানে, ওর মেজাজ বোঝে।

বিকেলের দিকে ঘুরতে ঘুরতে তাপস একসময় গিয়ে চুনীর বাসার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকে, চুনী—চুনী—

বার দুই ডাকাডাকি করবার পর একসময় দরজাটা খুলে গেল।

এর আগে যত বার এসেছে চুনীর মা কিংবা চুনীর ভাইপো নিমাই দরজা খুলে দিয়েছে।

আজ যে খুলে দিল দরজা, সে তো ওরা কেউ নয় !

ছোটখাটো রোগা কালো একটি মেয়ে।

সরু কালো-পাড় ধুতি পরা।

মাথার মাঝামাঝি ঘোমটাটা খসে এসেছে। রুক্ষ চুল—চূর্ণকুন্তল মুখের দু'পাশে লতিয়ে নেমেছে।

শুষ্ক বিষণ্ণ মুখখানি ; কিন্তু শুষ্ক বিষণ্ণ হলে কি হবে—এবং কালো হলেই বা কি হবে—

সমস্ত মুখখানি জুড়ে যেন ঢল-ঢল লাবণ্য।

নিরাভরণ দুটি হাত।

তাপসকে দেখে মেয়েটি মাথার নেমে-যাওয়া ঘোমটাটা আর একটু সামনের দিকে টেনে দিয়ে নিজেকে একটু যেন আড়াল করে মৃদুকণ্ঠে বলে—আপনি বোধ হয় তাপসবাবু !

হ্যাঁ। চুনী নেই ?

না।

কোথায় গেছে ?

বোধ হয় ডাক্তারের ওখানে—

ওঃ, তা সে এলে বলবেন—অতি অবিশ্যি সে যেন আজই রাত্রে আমার সঙ্গে গ্যারেজে গিয়ে একবার দেখা করে—

মেয়েটি নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানায়।

তাপসও যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়ায়। দু'পা অগ্রসর হয়েছে কি হয়নি, পিছন থেকে মৃদুকণ্ঠে ডাক এল, তাপসবাবু—

তাপস মুখ তুলে তাকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার।

মাথা নীচু করে আছে মেয়েটি।

কিছু বলছিলেন ?

হ্যাঁ—

বলুন।

দু'মিনিটের জন্যে যদি আপনি একটু ভিতরে আসেন তো আপনাকে একটা কথা বলতাম—

তাপস দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে; যাবে কি যাবে না।

আসুন—আমাকে বোধ হয় চিনতে পারছেন—আমি আশা—

চুনীর বৌদি তো আপনি !

হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে আপনি বলে লজ্জা দেবেন না। বয়েসে এবং সব দিক দিয়েই আপনার চাইতে অনেক ছোট - আসুন ভেতরে—

মেয়েটির সেদিনকার আহ্বানের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যেটা লঙ্ঘন করতে পারেনি তাপস। পায়ে পায়ে খোলা দরজাপথে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢোকে।

সামনেই একটা ভাঙা চৌকি। একপাশে তার কিছু ময়লা ও জীর্ণ শয্যা স্তূপীকৃত করা।

বসুন—কেউ নেই বাড়িতে। একা আমিই আছি—

বাড়িতে কেউ নেই ?

না, বাবা মা নিমুকে নিয়ে বৈদ্যবাটিতে একটা দৈব ওষুধের জন্য গিয়েছেন—ঠাকুরপো কিছুক্ষণ আগে ডাক্তারের ওখানে গিয়েছে—

আপনার—মানে তোমার জন্যে বোধ হয় ? তোমাকে দেখে অসুস্থ মনে হচ্ছে।

কিছু না। সামান্য একটু জ্বর। কিন্তু কারও কথা তো শুনবে না—ডাক্তারের কাছে গেছে— যাক গে, যে জন্যে আপনাকে ডেকে এনে কষ্ট দিলাম, সেই কথাটা বলে নিই—যদি হঠাৎ এর মধ্যে সে এসে পড়ে তো বলা হবে না আর—

কথাটা কি বল তো ?

প্রশ্নটা করে তাপস আশার মুখের দিকে তাকায়।

আমি জানি, ও একমাত্র এই পৃথিবীতে কাউকে ভক্তি করে শ্রদ্ধা করে বা মান্য করে তো সে ঐ আপনাকে—তাই কথাটা আপনাকে বলবার জন্যে ছটফট করছিলাম—

ও আমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে কি না জানি না, কিন্তু কথাটা কি ?

ওকে আপনি বুঝিয়ে বলুন—বলুন বুঝিয়ে ও যেন বিয়ে করে—

বিয়ে ?

হ্যাঁ—

মানে চুনীকে বিয়ে করতে বলছ তুমি !

হ্যাঁ—ওকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারছি না—ও না বিয়ে করলে আমার এখানে আর থাকা একটি দিনও সম্ভব নয়—একটি দিনও নয়—কথাগুলো বলতে বলতে দুর্নিবার একটা কান্নায় যেন ওর কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে।

ও মুখটা নীচু করে।

বিস্মিত হতভম্ব তাপস প্রথমটা ঐ কথার কি জবাব দেবে বুঝতে পারে না। কয়েকটা মুহূর্ত যেন বোবা হয়ে থাকে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।

আমি জানি একমাত্র ও আপনার কথাই শুনবে। মেয়েটি আবার বলতে থাকে, ওকে আপনি বিয়ে করতে বলুন—

তাতে তোমার লাভ ?

হঠাৎ যেন মুখ ফস্কে কথাটা বের হয়ে যায় তাপসের। নিজের অজ্ঞাতেই যেন কথাটা বের হয়ে আসে ওর মুখ থেকে আচমকা।

লাভ! এ আপনি কি বলছেন তাপসবাবু ? ও যদি না বিয়ে করে, আমি আর এক দণ্ডও যে এখানে থাকবার অধিকার পাব না ! এ লজ্জাকে ঢাকবার যে আমার আর কোন উপায়ই থাকবে না। কেন এই সহজ কথাটা আপনারা বুঝতে পারছেন না ?

তাপস সেদিন অতঃপর বলতে পারেনি বটে যে, সহজ কথাটাই এ দুনিয়ায় বুঝতে সব চাইতে কষ্ট হয়। সহজ কথাটাই অনেক সময় সব চাইতে ঘোরালো মনে হয়। তবে এটা সে বুঝেছিল—ঐ কালো রুগ্না কৃশা মেয়েটিকে না জেনে, না চিনে সত্যিই তার প্রতি সে অবিচার করেছিল।

আর এও বুঝতে সেদিন সেই মুহূর্তে তাপসের কষ্ট হয়নি, কেন চুনী তার বিয়েতে সম্মতি দিতে পারছে না!

কেন কোনমতেই তাকে বিয়েতে রাজী করানো যাচ্ছে না!

বুঝতে পেরেছিল বিয়ে করাটা চুনীর পক্ষে সত্যিই কেন অসম্ভব। কিন্তু সেই সঙ্গে এও মনে হয়েছিল তাপসের, আশ্চর্য!

সত্যিই আশ্চর্য!

ঐ তো কালো রোগা একটা মেয়ে—তার মধ্যে এমন কোন্ ঐশ্বর্যের সন্ধান পেল চুনী যে পৃথিবীর সমস্ত মেয়ে জাতটাকে অনায়াসেই নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারল!

পুরুষের জীবনে নারীর স্থূল প্রয়োজনটা পর্যন্ত যার কারণে তার মিথ্যে হয়ে গেল। মনে হয়েছিল—এরই নাম কি প্রেম! ভালবাসা!

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি চুনীর, চাইতেও ঐ কালো মেয়েটা যেন সেদিন থেকে আরও বিস্মিত আরও অভিভূত করে দিয়েছিল।

কিসের জোরে ঐ মেয়েটা আজ চুনীর এত বড় দাবিকে অস্বীকার করতে পারল! কোথা থেকে এল মেয়েটার এত বড় অহংকার!

এ তো সহজ অহংকার নয়—যে অহংকারে নিজেকে পর্যন্ত অস্বীকার করা যায় —অতিক্রম করা যায়!

বলুন, এই উপকারটুকু আপনি আমার করবেন, তাপসবাবু?

মেয়েটি আবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। কান্নায় ও কাকুতিতে যেন ভেঙে পড়ে।

পরে—আরও অনেক পরে একদিন তাপস বলেছিল আশাকে, কেন—তোমার চুনীকে বিয়েতে আপত্তিই বা কি?

ছিঃ—

কেন? ছিঃ কেন? তোমরা কি দুজনে পরস্পরকে ভালবাস না?

আমার কথা থাক তাপসবাবু, তার কথা আমি জানি—আর এও জানি তার ঐ ভালবাসা যে কোন মেয়ে পেলে তার জীবন সার্থক হয়ে যেত—

তবে—

ঐ তবেটাই তো সব প্রশ্নের শেষ নয় তাপসবাবু। নিমাই—আমার একমাত্র ছেলে—নিমাইকে আমি ভুলবো কেমন করে!

কিন্তু—

না তাপসবাবু, এর মধ্যে আর কোন 'কিন্তু'ই নেই। যতই হোক—নিমাইয়ের

প্রশ্নটা কোনদিনই কেউ আমরা এড়িয়ে যেতে পারব না। সমস্ত জীবন ধরে একটা কঠিন জিজ্ঞাসা হয়ে আমাদের দুজনার মাঝখানে থেকে যাবে এবং তখন সেটা শুধু দুঃখই নয়, চরম লজ্জাও যে হয়ে উঠবে আমাদের, না, না—তা হয় না। তা হয় না।

॥ ৭ ॥

পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে সে রাত্রে কেন যেন চুনী আর আশার কথাই বার বার মনে পড়ছিল তাপসের।

আশ্চর্য ঐ মেয়ে আশা!

আর অপর্ণা! অপর্ণা মেয়েটাও আশ্চর্য বৈকি!

অভিনয় করে করে জীবনটাকেও সে আজ একটা বুঝি অভিনয়ই ভেবে নিয়েছে। সব কিছুই যেন জীবনে অভিনয়। থিয়েটার।

কি কুৎসিত। কি জঘন্য! ভাবতে গিয়ে আবার যেন সারাটা গা ঘিনঘিন করে ওঠে তাপসের।

অথচ ঐ অপর্ণাকেই ঘিরে তার মন কত সময় কত রঙিন হয়ে উঠেছে। এবং অপর্ণার সান্নিধ্যে অপূর্ণ এক পলকানুভূতিতে সে শিউরে উঠেছে, দিনের পর দিন।

কি এক দুর্নিবার আকর্ষণেই না টেনেছে ঐ অপর্ণা তাকে দিনের পর দিন।

পাশাপাশি দুটো মেয়ের ছবি যেন আজ বার বার মনে পাতায় ভেসে ওঠে তাপসের।

আশা আর অপর্ণা। অপর্ণা আর আশা।

একজন কুৎসিৎ, অপরজন সুন্দরী। একজন তবু কিছুটা লেখাপড়া জানে, সামান্য হলেও অন্যজন ও পথই মাড়ায়নি।

তবু সুন্দরী অপর্ণার কথা ভাবতে গিয়ে মনটা যেন গুটিয়ে যায় তাপসের।

পরে আরও পরিচয় পেয়েছে তাপস আশার। ওর বাপের বাড়ির অবস্থা নেহাত মন্দ ছিল না। এবং বিধবা হবার পর যদি আশা ফিরে যেত ওর বাপের বাড়ি, ওকে তারা সাদরেই গ্রহণ করত ও স্থান দিত। কিংবা ও নিজেও আর কিছু লেখাপড়া করে একটা যা-হোক উপায় করে নিতে পারত।

সে চেষ্টাও যে আশার দুই দাদা মোহিত ও সরিৎবাবু করেননি, তাও নয়।

বহু চেষ্টাই নাকি তাঁরা করেছিলেন বোনটি বিধবা হবার পর তাকে ওঁদের কাছে নিয়ে যেতে কিন্তু রাজী করাতে পারেননি আশাকে।

আশা কিছুতেই গেল না ভাইদের ওখানে, শত অভাব ও লাঞ্ছনার মধ্যে শ্বশুর-গৃহেই পড়ে রইল।

শ্বশুর-গৃহের নিত্যকার অভাব দুঃখ ও নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের মাটি কামড়িয়ে।

কিন্তু সেদিন কি আশা চুনীকে ভালবেসেছিল বলেই শ্বশুর-গৃহ ছেড়ে ভাইয়েদের

নিরাপদ আশ্রয়ে যায়নি ?

না। তা নয়।

পরে তাপসের আশার সঙ্গে আরও ভাল করে পরিচয় হবার পর আশার মুখ থেকেই ও শুনেছিল, চুনীর প্রতি সেদিন তার শ্রদ্ধা থাকলেও যাকে বলে ভালবাসা তা জন্মায়নি। সেটা জন্মেছে আরও অনেক পরে!

অনেক পরে ক্রমশ একটু একটু করে ওরা যত পরস্পরের সান্নিধ্যে এসেছে, তত তিলে তিলে চুনী তার সাহচর্য দিয়ে আশার মনকে জয় করেছিল।

তাপস শুধিয়েছিল, সেটাই তো জানতে চাই বোন। চুনীর মধ্যে এমন কি তুমি পেলে যে তার জন্যে এত বড় পুরস্কারটা ভগবান তোমার হাত দিয়ে তাকে পৌঁছে দিলেন?

আশা বলেছিল, না, না—ও কথা বলবেন না তাপসবাবু, ওকে আপনারা চেনেন না তাই ওর সম্পর্কে এত বড় অবিচারটা করতে পারলেন। বরং আমার মত একটা তুচ্ছ কুৎসিত কালো মেয়ে কি করে ওর এতখানি স্নেহ পেল সেটাই আমার নিজের কাছে আজও আশ্চর্য লাগে—যখনই ভাবি কথাটা। তাছাড়া আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা তাপসবাবু জানি না, আমার স্বামীকেও আমি কম ভালবাসিনি এবং তার কাছ থেকেও কম ভালবাসা পাইনি—তবু কেমন করে তাকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলাম! তাকে হারানোর সমস্ত দুঃখ কেমন করে আমার মুছে গেল! না, ও ছোট নয় তাপসবাবু, পৃথিবীতে ও কারও চাইতে ছোট নয়।

তাপস বলেছিল, তা জানি বোন। সত্যিই ও ছোটো নয়—কিন্তু একটা কথা ভাবছি—এ ভালবাসা তো কাউকে তোমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

জানি—

শুধু জীবন-ভোর দুঃখই দেবে এ ভালবাসা তোমাদের।

তাই তো ওকে বলেছিলাম' তাপসবাবু, এই দুঃখ আমার সইবে কিন্তু ও বিয়ে করুক।

তাতে করে কি তুমি সুখী হতে সত্যিকারের?

হতাম বৈকি। নিশ্চয়ই হতাম।

হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে পায়ে একটা হোঁচট খায় তাপস। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাসূত্রটা ছিঁড়ে যায়।

উত্তরা ও শ্রী সিনেমার সামনে দিয়ে নলিনী সরকার স্ট্রীটের মুখটায় এসে গিয়েছে তখন তাপস।

নলিনী সরকার স্ট্রীটের মুখটাতেই একটা ময়লা ও আবর্জনাপূর্ণ পৌরপ্রতিষ্ঠানের ডাস্টবিন।

একটা কুকুর তার মধ্যে নেমে খাবার খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

স্তব্ধ রাত্রির বাতাস যেন সেখানটায় পচা একটা দুর্গন্ধে ঘুলিয়ে উঠেছে।

নিজের অজ্ঞাতেই নাকে হাতটা চেপে ধরে ননিলী সরকার স্ট্রীটে ঢুকে পড়ে তাপস। তারপর হন্‌হন্‌ করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

বার দুই ডাকতেই দরজাটা খুলে গেল।

একটা হ্যারিকেন হাতে দরজার ওপর দাঁড়িয়ে আশা।

কে! ও, তাপসবাবু?

চুনী আছে না?

আছে। আসুন—বলতে বলতে খোলা দরজার এক পাশে সরে দাঁড়ায় আশা।

অপ্রশস্ত সরু একটা বারান্দা, তারই সামনে, পাশাপাশি দুটো ঘর মাঝারি আকারের এবং পিছনের দিকে একটা ছোট ঘর, রান্নার ব্যবস্থা ঐ ঘরটার পাশেই।

কল পায়খানা বারোয়ারী।

তাপস জানত পিছনের দিককার ছোট ঘরটাতেই চুনী থাকে। হ্যারিকেন হাতে তাপসকে সঙ্গে নিয়ে আশা গিয়ে পিছনের সেই ছোট ঘরটাতে ঢুকল।

ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা উগ্র কটু গন্ধে গা-টা গুলিয়ে ওঠে তাপসের এবং চোখে পড়ে মেঝেতে লম্বা হয়ে পড়ে আছে চুনী।

তাপস বিস্ময় ও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আশার মুখের দিকে তাকায়, কি ব্যাপার?

বেশী খেয়েছিল বোধহয়—বমি করে ফেলেছে। ঘরটা পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার একবার শুধু জলনেকড়া দিয়ে মেঝেটা মুছে নেব—

ঘরের মেঝেতে একপাশে হ্যারিকেনটা রেখে আশা বোধকরি জলনেকড়া আনবার জন্যেই বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

পাশে একটা মলিন শয্যা বিস্তৃত।

চুনীর শয্যা।

তাপস সেই খাটিয়াটার ওপরই বসল।

আশা আবার ঘরে এসে ঢুকল। ঘরের মেঝেটা ভাল করে মুছে নিল। তাপস ঐ নিঃশব্দ কর্মরতা মেয়েটির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

আশা আবার ঘর থেকে বের হয়ে গেল। এবং আশা ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর তাপস এগিয়ে গিয়ে চুনীর সামনে বসে তার গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকে।

চুনী—এই চুনী।

উঁ—

ওঠ্‌। উঠে বস্‌।

না। বেশ আছি—জড়িত অস্পষ্ট কণ্ঠে জবাব দেয় চুনী।

ননসেন্স্‌! সহ্য করতে পারিস না তো এগুলো গিলিস কেন?

কে! মাস্টার—

হ্যাঁ—

এত রাত্রে কেন মাস্টার?

এত রাত্রে কেন মাস্টার! খিঁচিয়ে ওঠে তাপস, ভোর রাত্রে ট্রাক নিয়ে বেরুতে

হবে না ? ওঠ্—

বেরুতে হবে বুঝি ? চুনী জিজ্ঞাসা করে।

বেরুতে হবে বুঝি ! তাই তো বলেছিলাম বাড়িতে যাস না, গ্যারেজে থাক।

উঠে বসবার চেষ্টা করতে করতে জড়ানো স্বরে চুনী বলে, রাত কি শেষ হয়ে গিয়েছে মাস্টার ?

শেষ না হলেও শেষ হতে খুব বেশী আর বাকি নেই—

উঠে বসবার চেষ্টা করলেও চুনী উঠে বসতে পারে না। টলে পড়ে যায় মেঝেতে। এবং মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে চোখ বুঝে জড়ানো সুরে বলে, তুমি বলছিলে মাস্টার— এগুলো খাই কেন। না খেয়ে কি করি বল ! ভাবি এক-একবার চলে যাব শালা এখান থেকে—এ নরকে আর থাকব না ; কিন্তু আমি গেলে নিমেটাকে আর ঐ হারামজাদা মাগীকে দেখবে কে ! তাও তো বলি চল আমার সঙ্গে—তাও যাবে না। মাইরি, তুমি একবার ওকে বুঝিয়ে বল না মাস্টার ?

জলনেকড়া হাতে আশা আবার ঘরে এসে ঢুকল।

উঠে খাটে গিয়ে শোও না। পারবে না ? মেঝেটা একবার ভাল করে মুছে নিই— আশা চুনীকে সম্বোধন করে কথাগুলো বলে।

পারব। খুব পারব—উঠে বসবার আবার চেষ্টা করে চুনী, কিন্তু পারে না। তাপসই তখন তাকে ধরে তুলে শয্যায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়।

চুনী আপন মনেই বলতে থাকে, কেন ধরতে গেলে মাস্টার, ঠিক পারতাম—সব পারি আমি। সব পারি।

ইতিমধ্যে আশা ঘর মুছে চলে যায়।

এবং আশা ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপসের মনে হয়—হঠাৎ যেন কেমন একটা স্তব্ধতা ঘরটার মধ্যে নেমে এল।

ঘরের অল্প অল্প হ্যারিকেনের আলোয় হাতঘড়িটার দিকে তাকায়। রাত প্রায় শেষের দিকে, সারাটা রাত ঘুম হল না, এখন চোখ দুটো একটু একটু জ্বালা করছে। একটু যেমন করে হোক গড়িয়ে নিলে মন্দ হত না, কিন্তু তার আর কোনোই সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু তার চাইতেও এখন যে ভাবনাটা মাথার মধ্যে এসেছে, সেটা হচ্ছে চুনীর তো ঐ অবস্থা, ও কি সঙ্গে যেতে পারবে ?

না, সঙ্গে নেওয়াটাই ওকে ঐ অবস্থায় যুক্তিসঙ্গত হবে না। তার চাইতে মোহনলাল স্ট্রীট থেকে রাখালকে ডেকে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না।

তা সে রাখালকেও আবার পাওয়া যাবে কিনা কে জানে।

রাখালটা কিছুদিন থেকে আবার মথুরাপ্রসাদের গ্যারেজে কাজ করছে।

আশা আবার ঐ সময় এসে ঘরে ঢুকল।

দু হাতের এক হাতে তার এক কাপ ধূমায়িত চা ও অন্য হাতে একটা কাচের গ্লাসে লেবু দিয়ে 'র' চায়ের লিকার !

এ কি ! এর মধ্যে আবার চা করে আনলে। এত রাত্রে আবার এর কি দরকার ছিল বল তো ?

বাঃ, এ আবার এমন কি কষ্টটা—নিন, ধরুন—চিনি অত্যন্ত কম, দেখুন খেতে পারবেন কি না।

আশা চায়ের কাপটা তাপসের হাতে তুলে দিতে দিতে বলে।

চায়ের নেশা যাদের, তাদের একটু-আধটু চিনি কম হলে কি আর কিছু হয় ? দাও—

তাপসের হাতে চায়ের কাপটা দিয়ে শয্যার দিকে এগিয়ে যায় আশা, এই নাও—একটু গরম লেবু-চা করে এনেছি, খেয়ে নাও—

নিঃশব্দে এবারে উঠে বসে হাত বাড়িয়ে আশার হাত থেকে চায়ের গ্লাসটা নেয় চুনী।

গোটা দুই চুমক দিয়েই যেন একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

রাত কটা হল মাস্টার ? প্রশ্ন করে চুনী।

রাত প্রায় সাড়ে তিনটে—

বল কি ! তবে তো রেডি হতে হয় !

যেতে পারবি ?

মানে !

মানে আর কি, যা গেলা গিলেছিস—

তুমি হাসালে মাস্টার—চুনীর মদ খেলে কখনও কিছু হয় দেখেছ ?

আশা অল্প দূরে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসে।

আশার মিটিমিটি হাসিটা চুনীর নেশাগ্রস্ত চোখের দৃষ্টিকেও এড়ায় না। সে তাপসের দিকে চেয়ে বলে ওঠে, লজ্জা করে না হাসছ ! রাতদুপুরে মাতাল দেওরের বমি পরিষ্কার করতে এসেছ, ভাব কারও চোখে পড়ে না, না ?

আঃ ! কি হচ্ছে চুনী ?

ধমকে ওঠে তাপস চুনীকে।

এ বাড়িতে আমার আর থাকা হবে না মাস্টার, এ তোমাকে আমি বলে রাখছি, যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব শালা—বলতে বলতে আবার উঠে দাঁড়ায় চুনী।

এবারে আর আগের মত টলে না।

কি হল, উঠলি কেন ? তাপস প্রশ্ন করে চুনীকে।

দড়ির আলনায় জামাটা ঝুলছিল ; সেটা টেনে নিয়ে গায়ের উপর ফেলে বলে চুনী, চল মাস্টার—

পারবি—

হ্যাঁ—হ্যাঁ, চল—

সত্যি সত্যিই চুনী এবারে দরজার দিকে এগিয়ে যায় এবং এগিয়ে যেতে যেতেই বলে আশার দিকে ফিরে, চল ঠাকরুণ, দরজাটা বন্ধ করে দেবে চল—

তাপসও চুনীর পিছনে পিছনে অগ্রসর হয়।

সবার পশ্চাতে আশা।

রাত তখনও শেষ হতে ঘন্টাখানেক বাকি।

রাতের কালো আকাশটা ফিকে ফিকে হয়ে এসেছে।

সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে একটা আলোছায়ার পর্দা যেন থিরথির করে কাঁপছে—

দক্ষিণেশ্বরকে পেছনে ফেলে গঙ্গার ওপর দিয়ে ব্রিজটা ক্রস করে তাপসের ট্রাক এগিয়ে চলে, পাশে বসে চুনী।

হঠাৎ চুনী একসময় কথা বলে, সত্যিই আর আমি পারছি না মাস্টার—

হাত দিয়ে ঠেলে গাড়ির গীয়ারটা সেকেণ্ড থেকে থার্ডে দিতে দিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বলে তাপস, কেন, কি হল ?

তুমি কি দেখেও কিছু বুঝতে পার না শালা মাস্টার ? খেঁকিয়ে ওঠে চুনী, আশার কথা বলছিলাম।

আশা!

হ্যাঁ, হ্যাঁ—কেন ও এমনি করে মিথ্যে কষ্ট আর অপমান মুখ বুজে সহ্য করে বলতে পার ? কি ফয়দা হচ্ছে শালা এতে—

কিন্তু তোকে বিয়ে করলেই কি ওর ঐ অপমান আর দুঃখ থেকে তুই ওকে মুক্তি দিতে পারবি, চুনী ?

কেন, পারব না কেন ? আলবৎ পারব—অন্য জায়গায় গিয়ে ঘর বাঁধব—

কিন্তু সেটাই তো শেষ কথা নয় চুনী ? ঐ নিমাইয়ের কথাটা একবার ভেবেছিস ? তোর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আশাই কি আর ছেলের কাছে তারপর মুখ দেখাতে পারবে মনে করিস—

রেখে দাও তো তোমার মুখ-দেখানো। কেন পারবে না শুনি ?

দেখ্ চুনী, তোর কাছে আশা একজন মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু নিমাইয়ের কাছে তো তা নয়—নিমায়ের কাছে সে তার মা।

ও সব বাজে কথা। আসলে কি জান ব্যাপারটা, মাস্টার—

কি ?

স্টিয়ারিং হুইলটা হাতের জোরে ঘুরিয়ে একটা বাঁক নিতে নিতে তাপস প্রশ্ন করে চুনীর দিকে না তাকিয়েই, কি ?

আমাকে শালা থেঁতলেই ওই মাগীর আনন্দ। কিন্তু আমিও বলে রাখছি, বেশী-দিন আর এ আমি সহ্য করবো না। হয় একটা এস্পার না হয় ওস্পার করে ফেলব। নিত্য বাড়িতে গেলেই মায়ের মুখ খিঁচুনি আর আমার ভাল লাগে না—

আমি একটা কথা বলব—

কি শুনি—

তা আশা যা বলছে—তুই একটা বিয়ে করে ফেল না।

কি বললে মাস্টার, বিয়ে ?

হ্যাঁ বিয়ে—

ঐ মাগী বেঁচে থাকতে ! তুমি তো চেন না চিজটিকে—ও নিজেও বিয়ে করবে না, আমাকেও বিয়ে করতে দেবে না ।

তাপস সামনের দিকে চেয়ে স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে গাড়ি চালাতে চালাতে হেসে ফেলে ।

একটা বিড়ি ধরিয়ে পাশে বসে কথা বলতে বলতে টানছিল চুনী, তাপসের হাসিটা তার নজর এড়ায় না ।

হাতের বিড়িটা ফেলে দিয়ে বলে, তুমি হাসছ মাস্টার—কিন্তু তুমিই বল তো দেখি, বিয়েতে ওর এত আপত্তিই বা কেন ? এমনি করেই জীবনটা ও কাটাবে নাকি মনে করেছে—আর আমিই চিরকাল এমনি করে ওর বোঝা টেনে বেড়াব যদি মনে করে থাকে তো—বলে দিও ওকে তুমি, ভুল, ওর ভুল হচ্ছে সেটা । চলে যাব । আমিও ওকে একদিন কলা দেখিয়ে যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাব ।

তাপস চুনীর কথার কোন জবাব দেয় না ।

চুপচাপ বসে স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে সামনের দিকে তাকাতে তাকাতে গাড়ি চালিয়ে যায় ।

সিগারেট আছে মাস্টার—শালার বিড়ি আর টানা যায় না । মুখ তেঁতো হয়ে গিয়েছে—

বাঁ হাত দিয়ে পকেট থেকে তাপস সিগারেটের একটা টিনের কেস বের করে চুনীর দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে দেয় ।

চুনী তা থেকে একটা সিগারেট বের করে সেটায় অগ্নিসংযোগ করে টানতে থাকে ।

হঠাৎ একসময় আবার চুনীই বলে, কি জান মাস্টার, ঐ মেয়েছেলে জাতটাই বড় নেমকহারাম—

তাই বুঝি ?

নয় ? এই দেখ না, আশা ঠাকরুণের ব্যাপারটাই দেখ না । ও তো কিছু আর কচি খুকিটি নয় যে বোঝে না । সত্যিই ওকে ভালবাসি বলেই বিয়ে করে—

কিন্তু আশাও যে তোকে ভালবাসে চুনী ।

ভালবাসে না ছাই, তুমি কিছু জান না ।

হ্যাঁ, ভালবাসে বলেই আজ পর্যন্ত তোর প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেনি ।

কি যে তুমি মাথা নেই মুণ্ডু নেই আবোল-তাবোল কথা বল মাস্টার—ভালবাসে বলে বিয়ে করতে চায় না—

হ্যাঁ রে—অন্ততঃ আমার তাই মনে হয় । এটা বুঝিস না কেন চুনী—বিয়ে তোকে করতে হলে তা করতে হবে বাড়ির সকলের অমতে—সকলের একান্ত অনিচ্ছায় । যার ফল আদপেই সুখের হবে না । দিনরাত্রি চলবে বাড়িতে অশান্তি—এখন যে অশান্তি—তার চাইতেও ঢের বেশী অশান্তি—

তুমিও যেমন! বিয়ে করে আমি ওখানে পড়ে থাকব নাকি? সে বান্দাই তুমি আমাকে পাওনি মাস্টার। নিমেটাকে একটা হোস্টেলে দিয়ে দেব, আর ওকে নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধব।

কিন্তু আশা তার ছেলেকে ছেড়ে যদি না থাকতে চায়?

ছাড়তে কে বলেছে। মাঝে মাঝে—খুশিমত আসবে যাবে।

ব্যাপারটা তুই যত সোজা ভাবছিস ততটা নয় রে চুনী।

খুব সোজা—ভাবলেই সোজা।

না—

কিন্তু কেন না বলতে পার?

সে অনেক কিছু আছে এর মধ্যে—

ঘোড়ার ডিম—কিচ্ছু নেই—

আচ্ছা ধর, না হয় বিয়ে হল, তার পর—

কি তারপর?

নিমাইকে তো ফেলতে পারবি না—

ফেলছে কে—

নিমাই তাহলে বিয়ের পর তোকে কি বলে ডাকবে?

কেন? যেমন ডাকে কাকা। কথাটা বলতে গিয়েই বোধ হয় হঠাৎ ব্যাপারটার মধ্যে যেটা বিসদৃশ, সেটা নজরে পড়ে যায়—কেমন সংকুচিত হয়ে পড়ে চুনী।

কাকা ডাকবে বলছিস?

না, মানে—

মানে এর মধ্যে কিছু নেই চুনী। কেন বুঝতে পারছিস না আশা তার ছেলেকে যেমন ভালবাসে, তেমনি ভালবাসে তোকে আর তাইতেই কাউকে সে ছাড়তে রাজী নয়।

তাহলে বলতে চাও মাস্টার এইভাবেই চলবে?

তাই তো বলছিলাম বিয়ে কর একটা—

চুনী কোন জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে।

অপর্ণা ভেবেছিল জীবনে আর তাপসের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না।

যে একজন পুরুষ হয়ে একজন স্ত্রীলোককে এত বড় অপমান করে গেল, তার সঙ্গে সম্পর্কটা আবার কিসের।

কিন্তু অপর্ণা জানত না ইতিমধ্যে কখন তার মন ঐ তাপসের কাছেই বাঁধা পড়েছে।

ঘৃণা করতে গিয়ে তাই কেঁদে ফেলে অপর্ণা।

ভাবনা না ভেবেও তাপসের কথাই ভাবতে থাকে।

অনুক্ষণ কেমন মনে হয় তাপস যদি আর একবার আসত!

কিন্তু তাপস আসে না।

সেই যে রাত্রে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে তখুনি আবার নিভিয়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল, তারপর আর অপর্ণাদের ওখানে আসেনি তাপস।

ঐ পাড়ারই একটা ছেলে বিনোদ, অপর্ণাদেরই নীচের তলায় থাকত এবং কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করত। তাকেই একদিন দুপুরে ডেকে আনল ঘরে অপর্ণা।

বিনোদ—

কি অপর্ণাদি—

আমার একটা কাজ করতে পারবি ভাই ?

কি কাজ ?

সার্কুলার রোডে 'জুবিলী গ্যারেজ' আছে জানিস ? দেখেছিস কখনও ?

না, জানি না—দেখিওনি গ্যারেজটা কখনও। তা হোক, সার্কুলার রোড তো—ও আমি ঠিক খুঁজে বের করে নিতে পারব—

পারবি ?

কেন পারব না !

শোন্, সেই জুবিলী গ্যারেজে তাপসবাবু বলে একজন ড্রাইভার আছে—

কি নাম বললে—তাপসবাবু ?

হ্যাঁ—

দাঁড়াও—দাঁড়াও—সেই যে তুমি কার্ড দিয়েছিলে তোমার থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম যুবক সংঘে—'উল্কা' প্লে হয়েছিল। তাপসবাবু সুবীর সেজেছিল, তুমি সেজেছিলে মিলি—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—সেই ভদ্রলোক। পারবি তাকে একটা খবর দিয়ে আসতে ?

কেন পারব না। খুব। ওদিকে তো মধ্যে মধ্যে যাই। এবারে যেদিন যাব বলে আসব—কথাটা বলে বিনোদ ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। অপর্ণা তাকে ডেকে ফেরায়।

এই শোন্,—এই টাকাটা নে—

আঁচল থেকে একটা এক টাকার নোট বের করে বিনোদের দিকে এগিয়ে দেয় অপর্ণা. সিনেমা দেখিস—তোকে একবার আজই যেতে হবে ভাই তাপসবাবুর কাছে—

এখুনি যাব ?

না। এখন গেলে তো তাকে পাবি না।

তবে ?

সন্ধ্যের পর যাবি।

বেশ।

টাকাটা শার্টের পকেটে রাখতে রাখতে বিনোদ ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

বিনোদও বের হয়ে যায়, একটু পরে অমরেন্দ্র এসে ঢোকে।

অমরেন্দ্রকে হঠাৎ ঐ সময় ঘরে ঢুকতে দেখে ভ্রূ-দুটো কুঁচকে অপর্ণা অমরেন্দ্রর

দিকে তাকায়—তারপর বলে, তুমি—

হুঁ—অমরেন্দ্র জবাব দেয়।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু এ সময় কি ব্যাপার—

হ্যাঁ,—একটু দরকার আছে—গম্ভীর হয়ে বলে অমরেন্দ্র, চল তোমার ঘরে, ওপরে—চল—

দুজনে দোতলায় এসে অপর্ণার শোবার ঘরে ঢোকে।

বল কি কথা ?

অপর্ণা।

কি ?

তুমি বাইরের নানা অফিস ক্লাবে আজকাল থিয়েটার করে বেড়াচ্ছ ?

করছি—

কিন্তু কথাটা আমাকে জানাওনি ; গোপন করে গিয়েছ আমার কাছ থেকে।

গোপন করব কেন ?

ওকে গোপন করাই বলে—

তা যদি মনে কর তো আমি নাচার—

কিন্তু অন্য কোথাও গিয়ে তুমি থিয়েটার কর, এটা আমি পছন্দ করি না, তা তুমি ভাল করেই জান।

জানি।

তবে ?

তবে কি তুমি চাও—মা আমি বড়দি আর দাদা ও তার ছেলেমেয়েগুলো না খেয়ে শুকিয়ে মরি ?

তার মানে !

মানে তুমি জান না ? যতদিন তোমার থিয়েটারে বাঁধা চাকরি ছিল কোন কিছু আমায় ভাবতে হয়নি। কিন্তু—

দেখ অপু—ওসব আবোল-তাবোল কথা বলে আমাকে ভোলাতে পারবে না। আসলে তুমি উড়তে শুরু করেছ—

কি বললে !

যা বলছি, বুঝতে পারছ না ? ছিলে তো খেঁদী পেঁচী—পাখী-পড়া করে একটু একটু করে মানুষ করে দিয়ে এখন—

মনে হচ্ছে এই কথাগুলো বলবার জন্য যেন অনেক দিন থেকেই সুযোগ খুঁজছিলে। তবে তুমিও শুনে রাখ অমরেন্দ্রবাবু, আমি কারও কেনা বাঁদী বা সাত পাকের ইস্ত্রী নই যে ওঠ্ বললেই উঠব, বস্ বললেই বসব।

বটে ! ডানা বেশ বড় বড় হয়েছে দেখতে পাচ্ছি ! হুঁ, এত দিনে বুঝতে পারছি শ্রীমান তাপস ড্রাইভারের এখানে যাতায়াতটা—

কি ? কি বললে ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ,—জানি, জানি—ঐ লোফার ড্রাইভার তাপসটা—আক্রোশে আর হিংসায় যেন একেবারে ফেটে পড়ে অমরেন্দ্রবাবু—

অমরেন্দ্রবাবু—

ওসব চোখরাঙানি অন্যের প্রতি প্রয়োগ করো সুন্দরী, অমরেন্দ্র কেয়ার করে না—

বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে এই মুহূর্তে, যাও—

চাপা গলায় তর্জন করে ওঠে অপর্ণা।

পাশের ঘরেই ছিল মাধুরী, অপর্ণার দিদি—সে ছুটে আসে ঘরে।

কি, কি হল অপু। চেঁচামেচি করছিস কেন?

ওকে এখান থেকে চলে যেতে বল দিদি—

ফুলতে থাকে অপর্ণা।

কি ব্যাপার অমরবাবু?

অমরেন্দ্র মাধুরীর প্রশ্নের কোন জবাবই দেয় না।

অপর্ণার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে চাপা আক্রোশভরা কন্ঠে বলে, আচ্ছা—এক মাঘে শীত পালায় না। আমিও দেখছি—

অমরেন্দ্র হনহন করে ঘর থেকে বের হ'য়ে যায়।

কি ব্যাপার অপু?

মাধুরী বোনের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

ছোটলোক, অত্যন্ত নীচ, ইতর—

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে অপর্ণা।

সেই দিনই রাত নটা নাগাদ বিনোদ এল।

মাথার যন্ত্রণায় নিজের ঘরে সন্ধ্যায় শুয়ে ছটফট করছিল অপর্ণা। ঘর অন্ধকার।

দরজার বাইরে থেকে বিনোদ ডাকে, অপর্ণাদি—

কে রে—

আমি বিনোদ।

আয়, ভেতরে আয়।

অন্ধকারেই শয্যার উপর উঠে বসে অপর্ণা, দেখা হয়েছে তাপসের সঙ্গে তোর?

হ্যাঁ—হল—

বললি আমার কথা?

বলেছি।

কি বলল?

কিছু বলল না।

কিছু বলল না কিরে!

হ্যাঁ, কিছু বলল না। পাশে আর একজন কে ছিল। দুজনেই মদ খাচ্ছিল। সেই লোকটা বললে, কেটে পড় যাদু—কেন অবেলায় বাঁশরী বাজাও—

॥ ৮ ॥

অপর্ণার সংসারটা খুব ছোট ছিল না।

নিজে, মা এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভাই রবীন ও তার স্ত্রী মলিনা—তাদের তিন-চারটি ছেলে-মেয়ে। রবীন যতদিন সুস্থ সবল ছিল লোহালক্কড়ের কারখানায় চাকরি করত।

অনেক না হলেও মোটামুটি যা উপার্জন করে আনত এবং অপর্ণার থিয়েটারের চাকরি থেকে যা আসত, ওদের সংসারটা একরকম চলে যেত। যাচ্ছিলও।

কিন্তু হঠাৎ বছর তিনেক আগে রবীনের বাঁ হাত ও বাঁ পা-টা অসাড় পঙ্গু হয়ে গেল।

হাসপাতালের ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন—এ গোপন যৌন ব্যাধির বিষময় ফল।

দেহে অনেকদিন ধরেই যৌন ব্যাধির বিষ ছিল, সম্পূর্ণ চিকিৎসা হয়নি—পক্ষাঘাত সেই বিষ থেকেই।

তবু অপর্ণা ভাইকে সুস্থ করে তোলবার অনেক চেষ্টা করেছিল। ডায়মন্ড থিয়েটারে চাকরি করত সে তখন এবং অমরেন্দ্র ছিল তখন ঐ থিয়েটারের একদিক দিয়ে সর্বময় কর্তা।

ডায়মন্ড থিয়েটারের মালিক হরিসাধনবাবু লোকটা এক বিচিত্র চরিত্রের মানুষ।

দুই পুরুষ ধরে থিয়েটার চালাচ্ছিলেন হরিসাধনবাবু।

হরিসাধন থিয়েটারের একমাত্র টাকাকড়ির ব্যাপার ও বিক্রীর দিকটাই দেখাশোনা করতেন—বাদবাকি নাটক পছন্দ করা থেকে তাঁর প্রডাকসনের যা কিছু দায়-দায়িত্ব পরম নিশ্চিন্তে এবং পরম বিশ্বাসে অমরেন্দ্রর উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। নিঃসন্দেহে হরিসাধনবাবু অযোগ্য পাত্রে দায়িত্ব দেননি।

শিক্ষিত ভদ্রবংশের সন্তান অমরেন্দ্র—নাট্যকার থেকে জীবন শুরু করেছিল এবং বুদ্ধি, ক্ষমতা ও যোগ্যতা তো তার ছিলই, তার চাইতে বড় কথা তাকে বিশ্বাসও করা যেত।

তাই হরিসাধনবাবু অমরেন্দ্রর ওপর থিয়েটারের অন্যান্য যাবতীয় কর্মভার ও দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চন্তই ছিলেন।

অমরেন্দ্রও যে সে দায়িত্ব বিশ্বাসের সঙ্গে পালন করেনি তা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অমরেন্দ্র ক্রমশঃ নিজের ক্ষমতা ও অধিকারের সীমানার বাইরে পা ফেলতে শুরু করল।

উপর্যুপরি জীবনের সাফল্য তার বুদ্ধির ভারসাম্যকে ক্রমশঃ বিঘ্নিত করতে লাগল; এবং ভাগ্যের যে কৃপাদৃষ্টি তাকে একদিন সাফল্যের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছিল, সেই

ভাগ্যই এবারে বুঝি মুখ ফিরিয়ে নিল।

কিন্তু সে তো অমরেন্দ্রর ইতিহাস। এই বর্তমান কাহিনীর সে আরও পরের কথা। তার আগে অপর্ণার কথা।

ডায়মণ্ড থিয়েটারের যখন অমরেন্দ্র সর্বময় কর্তা, তখনই একদল নাচিয়ে সখীর মধ্যে অপর্ণার প্রতি দৃষ্টি পড়ে অমরেন্দ্রর।

অপর্ণার তখন নিটোল স্বাস্থ্য এবং সদ্য-জাগ্রত যৌবন দেহের প্রতিটি রেখায় রেখায় বিকশিত হয়ে উঠেছে।

প্রম্প্টার শিবু ছিল অমরেন্দ্রের সর্ব ব্যাপারে অনুচর।

নাট্যজগতে প্রম্প্টার শিবুর একটা পরিচয় ছিল।

বিচিত্র চরিত্রের একটি জীব।

পনের বছর বয়েসের সময় থিয়েটার-জগতে এসে সে ঢুকেছিল—কাটা সৈনিক সাজত প্রথম প্রথম, তারপর কোন ছোট অভিনেতাদের অনুপস্থিতিতে কাজ চালিয়ে দিত—তারপর শুরু করে প্রম্প্টিং ও মোসাহেবী—মঞ্চে সেরা অভিনেতার মোসাহেবী ও সেই-ই নারী যোগান দিত।

তারই প্ররোচনায় অমরেন্দ্র—নাট্যকার অমরেন্দ্র একদিন অভিনেতা হিসাবে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিল।

অমরেন্দ্ররই একটা নাটক 'ময়ূর সিংহাসনে'র মহলা চলছিল। হঠাৎ প্রধান অভিনেতা বিপিন লাহিড়ীর সঙ্গে অমরেন্দ্রর খটাখটি লেগে গেল।

নাটকের উদ্বোধন রজনীর আর মাত্র সাতদিন বাকি তখন।

বিপিন লাহিড়ী বেঁকে বসায় অমরেন্দ্র মুশকিলে পড়ল।

ভাবছে কি করা যায়—প্রম্প্টার শিবু এসে ঘরে ঢুকল—অত ভাবছেন কেন স্যার—

না হে—সর্বত্র পোস্টার পড়ে গিয়েছে—উদ্বোধন রজনী ঘোষিত হয়ে গিয়েছে—ম্লান কণ্ঠে কথাগুলো থিয়েটারে নিজের বসবার ছোট ঘরটিতে পায়চারি করতে করতে বলতে থাকে অমরেন্দ্র।

তা হয়েছে হয়েছে—থিয়েটার হবে। শিবু বলে।

কেমন করে? কাকে আনি ঔরংজীবের ভূমিকার জন্য এখন?

কাউকে আনতে হবে না। আপনিই নেমে পড়ুন ঐ রোলে—

কি বলছ শিবু!

ঠিকই বলছি। শালারা দেখুক—চমকে যাবে সবাই বিস্ময়কর এক আবিষ্কারে।

তোমার দেখছি মাথার গোলযোগ হয়েছে শিবু—

শুনুন স্যার, গোলযোগ নয়—কথাটা অনেক দিন থেকেই ভেবেছি—আপনার ঐ চেহারা—ঐ কণ্ঠস্বর—ঐ বাচনভঙ্গী—লুফে নেবে পাবলিক—আজকের নট-সূর্যকে আপনি মেরে বেরিয়ে যাবেন—

না—না—

আর দোমনা করবেন না স্যার—নেমে পড়ুন।

কিন্তু—

কেন কিন্তু করছেন, দেখান দেখি আপনার মত একজন চেহারা—অমন গলা—তাছাড়া আপনার নিজের সৃষ্ট চরিত্র—আপনি যে রূপ দেবেন তা কেউ পারবে না—

শিবু—

আর শিবু নয় স্যার। নেমে পড়ুন—

বলছ ?

হ্যাঁ। ভাবাভাবি আর নয় স্যার—আমি চললাম পোস্টার ছাপাতে—

শিবু বের হয়ে গেল ঘর থেকে, আর অমরেন্দ্র এসে আয়নার সামনে দাঁড়াল।

সিংহাসন। ঐ ময়ূর সিংহাসন—না, না—চুপ। চুপ চুপ ঔরংজীব। বাতাসেরও কান আছে। দারা-সুজা-মুরাদ—সম্রাট বৃদ্ধ—কিন্তু ভগিনী জাহানারা—

সত্যি সত্যিই ঔরংজীবের ভূমিকাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করল মঞ্চে অমরেন্দ্র।

এবং শিবুই হাতে ধরে টেনে নামাল মঞ্চে তাকে।

শিবু দশটা চোখ মেলে থাকত অমরেন্দ্রর ব্যাপারে চারদিকে।

নিজের জীবনের তখন শেষ অধ্যায় চলছে শিবুর।

ভগ্ন জীর্ণ স্বাস্থ্য—নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের উপরে আফিঙের নেশা। থিয়েটারে তার চাকরি থাকবার কথা নয়, তবু রয়েছে এবং ভাল মাইনেতেই রয়েছে।

কারণ—অমরেন্দ্র।

অমরেন্দ্র ছিল শিবুর পশ্চাতে।

অপর্ণার দিদি মাধুরীর উপরে যে অমরেন্দ্রর দৃষ্টি পড়েছে, তা বুঝতে ঘুঘু লোক শিবুর কষ্ট হয়নি।

সেই-ই যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিল।

অমরেন্দ্রকে সে-ই নিয়ে গিয়ে তুলেছিল মাধুরীদের গৃহে।

মাধুরীর ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল।

সাধারণ নাচিয়ে সখী সতী-বেহুলা নাটকে অমরেন্দ্রর সঙ্গে প্রধান নারী ভূমিকায় একবার অবতীর্ণ হল।

শুধু থিয়েটারের চাকরিতেই যে মাধুরীর মাইনে বাড়ল তাই নয়, অন্য দিক দিয়েও অমরেন্দ্রর কৃপাদৃষ্টি থেকে সে বঞ্চিত হল না।

মোট কথা মাধুরীদের অবস্থা ফিরে গেল। এবং তারপরই হঠাৎ মাধুরীর ওপর থেকে অমরেন্দ্রর নজর পড়ল এসে অপর্ণার ওপরে।

কিন্তু সে আর ক'বছর ? মাত্র বছর পাঁচেক।

তারপরই অমরেন্দ্রর ভাগ্যের চাকাটা উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করল।

অকস্মাৎ একদিন অমরেন্দ্রর চাকরি গেল ডায়মণ্ড থিয়েটার থেকে।

দীর্ঘ পনের বছরের চাকরি এক কথায় নাকচ হয়ে গেল।

হরিসাধন পাকা ব্যবসায়ী মানুষ।

দুই পুরুষ ধরে থিয়েটার চালিয়েছেন তিনি কিন্তু কখনও গ্রীন রুমে পা দেননি।

বুঝতে পেরেছিলেন তিনি হাতের একটা আঙুলে যখন পচন ধরেছে—সময় থাকতে গোড়া থেকেই হাতটা কেটে বাদ না দিলে ঐ পচনের বিষ শুধু হাতটাকেই শেষ করে থামবে না, একদিন সমস্ত শরীরে তা ছড়িয়ে পড়বে।

আপাততঃ কিছুদিনের জন্য থিয়েটার বন্ধ রাখবেন এই অজুহাতে সকলকে এক মাসের মাইনে অগ্রিম দিয়ে নোটিস দিয়ে দিলেন হরিসাধন।

অমরেন্দ্রও নোটিস পেল।

তারপরই দুর্ভাগ্যের ধাপের পর ধাপে নেমে এসেছে অমরেন্দ্র।

যেখানে হাত দিয়েছে সেখানেই অকৃতকার্যতা। ব্যর্থতা—

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণারও ব্যর্থতা তাকে গ্রাস করেছে ক্রমশঃ।

নিষ্ঠুর দারিদ্র্য যেন অক্টোপাশের মত চারিদিক থেকে ক্রমশঃ ঘিরে ধরেছে।

দিশেহারা হয়ে পড়েছে অপর্ণা, কিন্তু তবু—তবু অমরেন্দ্রকে সে ত্যাগ করেনি।

অমরেন্দ্রকে সে আগের মতই আঁকড়ে ধরে থেকেছে।

অন্ধকারে বিনোদ চলে যাবার পর শয্যায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল অপর্ণা।

সেই অমরেন্দ্র—অমরেন্দ্র যে অপমান করে চলে গেল, সেই অপমানের কথাটাই ভাবছিল।

ঐ অমরেন্দ্রর কাছে একদিন সে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করেছিল।

তার মুকুলিত প্রথম যৌবনকে ঐ অমরেন্দ্রর হাতেই তুলে দিয়ে নিজেকে ধন্য ও সার্থক করেছিল অপর্ণা।

মা বিমলা এসে ঘরে ঢুকল, অপু—

কে, মা?

এমন অসময়ে শুয়ে যে? শরীর খারাপ নাকি? কথাটা বলে বিমলা ঘরের আলোর সুইচটা টিপতে যাচ্ছিল, অপর্ণা বাধা দেয়—থাক মা। আলোটা আর জেবলো না—

বিমলা অন্ধকারেই আন্দাজে নির্ভর করে শায়িতা অপর্ণার শয্যার উপর এসে বসল।

অপর্ণা জানে, কেন মা বিমলা এসে তার পাশে বসেছে।

ভনিতা তার কিসের।

বিমলার সব রকম প্রস্তুতি আর ভনিতার সঙ্গেই অপর্ণা পরিচিত।

হলও তাই। বিমলা পরক্ষণেই কথাটা পাড়ল, ঘরে তো একটা টাকাও আর নেই।

অপর্ণা কোন জবাব দেয় না মার কথার।

জবাব দেবেই বা কি!

দেবার আছেই বা কি?

টাকা যে ঘরে নেই, বিমলাকেই বা সেটা বলতে হবে কেন? অপর্ণা কি জানে না?

সে কি জানে না যে দিন দশেক আগে এক অফিসে থিয়েটার করে চল্লিশটা টাকা এনে বিমলার হাতে দিয়েছিল ?

তারপর আর কাজও পায়নি। পয়সাও একটি আনতে পারেনি।

পরশু অমরেন্দ্রর সঙ্গে এক জায়গায় অভিনয় করে এসেছে বটে, কিন্তু সে টাকাটা অমরেন্দ্রর কাছেই আছে।

চেয়ে নেওয়া হয়নি।

অথচ বাড়িতে এতগুলো লোক। তাদের শাক ডাল ভাত যাই হোক দু-বেলা আহার তো আছেই—

মাকে দোষ দিয়েই বা কি হবে!

বিমলা আবার বলে, আছে নাকি তোর কাছে কিছু ?

বিমলার কথাটা শুনে হঠাৎ যেন অপর্ণার সর্বাঙ্গ রি রি করে ওঠে। কথার ভঙ্গি দেখ একবার!

আছে নাকি কিছু তার কাছে! থাকলে সে আর দিয়ে দিত না যেন!

কিন্তু প্রতিবাদ জানাতেও যেন ইচ্ছে করে না ঐ মুহূর্তে অপর্ণার। অন্ধকারে শয্যার উপর চোখ বুজে যেমন পড়েছিল তেমনি পড়ে থাকে।

কাল সকালে উঠে চা চিনিটুকু কেনবার পয়সাও নেই কিন্তু—

বিমলার কথাটা শেষ হয় না। হঠাৎ শয্যা থেকে উঠে পড়ে অপর্ণা। এবং উঠে পড়ে অন্ধকারেই শাড়িটা বদলে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

এখন আবার কোথায় বেরুচ্ছিস ? বিমলা প্রশ্ন করে।

অপর্ণা কোন জবাব দেয় না। পায়ে স্যাণ্ডেলটা গলিয়ে অন্ধকার ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

সরু গলিপথটা পার হয়ে বড় রাস্তা।

রাস্তা ধরে হন হন করে এগিয়ে চলে অপর্ণা।

কি কুৎসিত জঘন্য ক্লেদাক্ত জীবন!

কি নিষ্ফল হাস্যকর বেঁচে থাকার প্রয়াস!

একটা কপর্দকের সংস্থান নেই, প্রতিটি কপর্দক উপার্জন করতে হচ্ছে রূপ আর যৌবনকে হাজার দর্শকের লালসাসিক্ত দৃষ্টির সামনে প্রতিদিন তুলে ধরে।

তারপর সেই টাকা দিয়ে উদরের অন্নের সংস্থান।

তবু পেটের মধ্যে ঘা হয়ে যায়নি।

নাড়িভুঁড়ি সব শুকিয়ে যায়নি।

তবু বেঁচে আছে।

কিন্তু কি প্রয়োজন ? এ জীবনকাহিনী রচনার কি প্রয়োজন! এইখানে এই মুহূর্তে শেষ হয়ে গেলেই তো হয়।

হুড়মুড় করে একটা ডবল ডেকার বাস ওর ওপরে এসে পড়ে ওর এই ব্যর্থ পঙ্গু জীবনকাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে না ?

কিম্বা একটা ট্রাম লাইন থেকে ছিটকে এসে ওকে শেষ করে দিতে পারে না?

এত ট্রাম চলছে পর পর! এদিক থেকে ওদিক ডবল ডেকারগুলো চলেছে—অথচ ওর কিছু হচ্ছে না!

টাকা নেই। ঘরে একটা টাকাও নেই।

অথচ টাকা চাই—রাত্রি প্রভাতের আগেই চাই। কিন্তু কোথা থেকে পাবে সে টাকা অপর্ণা!

কোথা থেকে পাবে?

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে একসময় অপর্ণা তাপসের গ্যারেজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে টেরই পায়নি।

রাত নেহাৎ কম নয়। সাড়ে নটা তো হবেই।

গ্যারেজের টিনের গেটের বিরাট পাল্লা দুটো ভেজানো কিন্তু সম্পূর্ণ ভেজানো নয়। এবং দুটো পাল্লার ফাঁক দিয়ে ভিতরের আলোর আভাস আসছে একটা।

থমকে দাঁড়াল অপর্ণা মুহূর্তের জন্য—কি যেন ভাবল। তারপরই দুটো পাল্লার ফাঁক দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল।

এদিকে ওদিকে খান কয়েক গাড়ি।

কয়েকটা গাড়ির মেসিন—তারই এক পাশে একটা দড়ির খাটিয়ার ওপর বসে আছে একাকী তাপস।

তাপসের সামনে একটা ছোট, একটা উপুড়-করা প্যাকিং কাঠের বাক্সর ওপর একটা অর্ধেক ভর্তি গ্লাস ও একটা রামের বোতল।

বোধ হয় পঁচিশ ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের টিমটিমে একটা বিদ্যুতবাতি গ্যারেজের মধ্যে জ্বলছে।

আবার বোধ হয় একটু ইতস্ততঃ করে অপর্ণা, তার পরই মৃদুকণ্ঠে ডাকে, তাপস-বাবু—

প্রথম ডাকটা তাপস শুনতে পায়নি—

আবার ডাকে অপর্ণা, তাপসবাবু—

কে?

মুখ তুলে তাকাল তাপস।

দু-এক চুমুক পান করলেও তাপসের নেশা হয়েছে বলে মনে হয় না।

আমি। অপর্ণা—

অপর্ণা!

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় তাপস। একটা লোহার সরু শিকলি দিয়ে গেটের পাল্লা দুটো বাঁধা ছিল ভিতর থেকে। সেটা খুলে দিতেই অপর্ণা ভিতরে এসে ঢুকল।

কি ব্যাপার? তুমি হঠাৎ—

আমি—মানে—

আমতা আমতা করে অপর্ণা।

কিছু বলবে ?

না, হ্যাঁ—মানে বলতে এসেছিলাম সেদিনকার রাত্রের ব্যাপারটার জন্য সত্যিই আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আমাকে ক্ষমা কর তুমি। ক্ষমা কর—

হঠাৎ অপর্ণার দু'চোখের কোণ অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে যায়, যা বলতে চাইছিল তা আর বলা হয় না, গলা বুজে আসে।

কান্নার একটা দুর্দমনীয় বেগ বুকের তলা থেকে ঠেলে ঠেলে ওপরে উঠে আসতে চাইছে।

অপর্ণার আকস্মিক আবির্ভাবে তাপসের হতভম্ব ভাবটাও তখন প্রায় কেটে গিয়েছে।

সে তাড়াতাড়ি বলে, বস—বস তুমি—

বসতে বলল তাপস অপর্ণাকে।

কিন্তু বসবে কোথায় অপর্ণা! ঘরময় ধুলো, বালি, মবিল, ও পেট্রোলের গন্ধ বাতাসে।

এটা একটা মোটরের রিপেয়ারিং গ্যারেজ। কারও সাজানো-গোছানো বাসা-বাড়ি নয়, এখানে মেকানিকরা হয় মাটিতে উবু হয়ে বসে বা দাঁড়িয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে কাটিয়ে দেয়।

তার মধ্যেই একটা কালি-ঝুলি মাখা নোংরা টুল ছিল, সেই টুলটাই সামনে টেনে অপর্ণাকে বলে তাপস, বসো—বসো অপর্ণা—

অপর্ণা বসল কিন্তু টুলটার ওপর নয়। তাপস এতক্ষণ যে দড়ির খাটিয়ার ওপর বসেছিল, সেইটার ওপর বসে পড়ল।

তাপস অতঃপর ঠিক কি করবে কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না। সামনেই প্যাকিং বাক্সটার ওপর রামের বোতল ও অর্ধপূর্ণ গ্লাসটা।

কেমন যেন বিশ্রী একটা লজ্জা লজ্জা বোধ করে তাপস ঐ বোতল আর ঐ গ্লাসের জন্য। কিন্তু সে দুটো বস্তু হাত বাড়িয়ে বাক্সর ওপর থেকে তুলে নিতেও পারে না।

আর অদ্ভুত অপর্ণা!

খাটিয়ার ওপর বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়েছে তখন।

কাদছে অপর্ণা।

বিশ্রী লাগে। ভারী বিশ্রী যেন লাগে তাপসের।

এখুনি হয়ত গ্যারেজের মালিক গৌরহরিবাবু এসে যাবে। সামনে মদের বোতল ও গ্লাস আর খাটিয়ার ওপর বসে দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে কাঁদছে অপর্ণা।

কি ভাববে গৌরহরিবাবু, কে জানে!

চুনীটা ছিল এতক্ষণ—এই মিনিট কুড়ি আগে চলে গিয়েছে। চুনীটা থাকলেও এক রকম হত।

একেবারে একা একা।

তাছাড় গৌরহরিবাবু লোকটাও তেমন বিশেষ সুবিধার নয়। মরালিস্ট লোক—

এখানে এসে অপর্ণাকে দেখলে হয়ত দুম্ করে হঠাৎ চটে উঠবে।

অপর্ণা—

কোনমতে ডাকে তাপস।

অপর্ণা ভেজা গলায় সাড়া দেয়, কি ?

বলছিলাম এই গ্যারেজের মালিক গৌরহরিবাবু, মানে লোকটা তেমন সুবিধার নয়। হঠাৎ এসে পড়তে পারে। মানে তার জন্যই আমি অপেক্ষা করছি কি না!

না, না, আমি উঠছি—বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় অপর্ণা, আমি চলে যাচ্ছি—

যাবার জন্য পা বাড়ায় অপর্ণা।

শোন, এখন বাড়িই যাবে তো ?

বাড়ি! অপর্ণা তাকাল তাপসের মুখের দিকে।

হ্যা—বাড়িই যাবে তো! চল তোমাকে যাওয়ার পথে পেঁছে দিয়ে যাব।

অপর্ণাকে কথার আর কোন অবকাশ মাত্রও না দিয়ে বোতলটা আর গ্লাসটা ঘরের কোণে একটা কাঠের আলমারির মধ্যে রেখে, গ্যারেজের গেটে চাবি দিয়ে পাশের পান-বিড়ির দোকানে চাবিটা দিয়ে এল তাপস।

অপর্ণা রাস্তার উপরই গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়েছিল।

চল।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করে ফুটপাত ধরে। কিছুটা এগুতে খান্না সিনেমা। 'ওস্তাদকা খেল'—কি একটা হিন্দি বই হচ্ছে। রাত্রের শোতেও হাউস ফুল নোটিস টাঙানো রয়েছে।

একটা ট্রাম ঘর-র শব্দ তুলে রাজাবাজারের দিকে চলে গেল।

বোধহয় ডিপোতেই রাত্রির মত আজ ফিরে গেল। প্রায় খালি ট্রামটা।

একটা খালি রিকশা ঠুং ঠুং করে যাচ্ছিল দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী—তাকে ডেকে দাঁড় করাল তাপস।

কি হল, রিকশা ডাকলে কেন ? অপর্ণা শুধায়।

রাত হয়ে গিয়েছে, ওঠো—

কি জানি কেন আর কোন কথা না বলে অপর্ণা রিকশায় উঠে বসে—তাপসও ওঠে। গা ঘেঁষে পাশাপাশি বসে দুজনে।

কিধার যায়গা বাবুজী ? রিকশাওলা শুধায় ?

বিডন স্ট্রীট চলো—তাপস বলে।

গ্রে স্ট্রীটের দিকে রিকশাটা এগোয়।

রিকশাটা চলছে, দুলছে—দুজনের গায়ে গা লাগছে। এমনি করে অপর্ণার গা ছুঁয়ে বসা প্রথম তাপসের।

অপর্ণার গায়ের স্পর্শ এই তার প্রথম।

রামের ক্রিয়াটা তখনও মস্তিষ্ক থেকে যায়নি। নেশা ঠিক নয়—নেশার একটা আমেজ আবছা কুয়াশার মত চেতনাকে তখনও যেন তাপসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

তার ওপরে থেকে থেকে অপর্ণার কোমল তনুর সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি।

আশ্চর্য !

সে রাত্রের সেই অপর্ণার প্রতি বিরাগটা যেন মনের মধ্যে কোথায়ও এতটুকু আর অবশিষ্ট নেই মনে হচ্ছিল তাপসের।

বরং ভাল লাগছে এই থেকে থেকে অপর্ণার গায়ের স্পর্শটা তাপসের।

পানের দোকানে রেডিওতে কার যেন সেতার বাজছে।

কি সুর কে জানে! না জানলেও ক্ষতি নেই। ভাল লাগছে তাপসের, অপর্ণা তার পাশে।

॥ ৯ ॥

অমরেন্দ্রকে সেদিন অমন করে কটু কথা বলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ায় অপর্ণার দিদি মাধুরীর ও বিমলা আদৌ খুশী হয়নি।

অবিশ্যি কথাটা মিথ্যে নয় এবং মাধুরী ও বিমলা দুজনেই জানত ডায়মণ্ড থিয়েটারের চাকরি যাবার পর থেকে ক্রমশঃই দিনকে-দিন অমরেন্দ্রের অবস্থা খারাপের দিকেই চলছিল।

তার রন্ধ্রে যেন শনি প্রবেশ করে তাকে চরম দুর্দশা ও দুর্ভাগের মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছিল।

কিছুতেই মানুষটা যেন কোথাও পা ফেলবার জায়গা পাচ্ছিল না এতটুকু।

দুর্ভাগ্য মানুষের জীবনে এক এক সময় এমন অভিশাপ আনে যে রাহুর মত যেন তাকে পিছনে তাড়াকরে নিয়ে বেড়ায় কেবলই।

অমরেন্দ্রর অবস্থাও ঠিক তাই।

ডায়মণ্ড থিয়েটারের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর জীবনে এনেছিল যেন এক অপূর্ব শুভক্ষণ।

ধাপে ধাপে তাকে তুলে দিয়েছিল সেদিন। সাফল্য থেকে আরও সাফল্যের দিকে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

স্বীকৃতি—অর্থ, প্রতিপত্তি সবই তার হয়েছিল।

কিন্তু এই গত দেড় বছর একটু একটু করে আবার সব কিছুই অমরেন্দ্র হারিয়েছে। এমন কি শ্যামাবাজার অঞ্চলে যে বসতবাটিটুকু পর্যন্ত করেছিল তাও বিক্রি হয়ে গিয়েছে—

আজ বলতে গেলে পর্যুদস্ত—হৃতসর্বস্ব অমরেন্দ্র।

অমরেন্দ্র যখন ডায়মণ্ড থিয়েটারে সর্বেসর্বা—সেই সময় থেকেই অপর্ণার দিদি মাধুরীর সঙ্গে তার পরিচয়।

মাধুরী এমন কি প্রৌঢ়া বিমলাও সে সময় কিছুদিন ডায়মণ্ড থিয়েটারে কাজ করেছিল। অপর্ণার তখন কতই বা বয়স!

বড়জোর এগার।

ফ্রক পরে তখনও সে।

অমরেন্দ্র মাধুরীদের বাসায় গেলে অপর্ণা সামনে এসেছে, হয়ত 'খুকী' বলে আদর করে কত সময় গাল টিপে দিয়েছে অমরেন্দ্র।

বলতে গেলে অমরেন্দ্রর নিজের যে মেয়ে মিনতি—তার চাইতেও ছোট অপর্ণা বয়েসে।

বিচিত্র মানুষের যৌনতৃষ্ণা।

সেই মেয়ের বয়সী অপর্ণার প্রতিই শেষ পর্যন্ত অমরেন্দ্র কিনা আকৃষ্ট হল!

ডায়মণ্ড থিয়েটার ছাড়বার বছর খানেক আগে কোন এক নাটকে দশ-এগার বছরের একটি ছেলের ভূমিকায় অপর্ণাকে অমরেন্দ্র নামায়।

এবং সেই সময়ই ব্যাপারটা ঘটে।

নাটক শেষ হয়ে গিয়েছে—অমরেন্দ্র সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় তার নিজস্ব মেক্-আপ রুমে যাচ্ছিল—সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় অপর্ণার সঙ্গে দেখা।

হঠাৎ অমরেন্দ্র অপর্ণাকে দু'হাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নেয় এবং চুম্বন করতে উদ্যত হয়।

নিঃসন্দেহে অপর্ণা প্রথমটায় ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গিয়েছিল কিন্তু কোন মেয়েরই তা সে এগার হোক বা ষোলই হোক পুরুষের নিকট-সান্নিধ্যে ঐ মুহূর্তটা উপলব্ধি করতে দেরি হয় না।

অপর্ণারও হয়নি যদিও সে তখন এগার কি সাড়ে এগার বছরের কিশোরী মাত্র। সে সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়ে অমরেন্দ্রকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

অমরেন্দ্রর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু অমরেন্দ্রর বয়েসী একটা কামার্ত পুরুষের আলিঙ্গন থেকে সামান্য এক কিশোরী অত সহজে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে কেন।

মিনিট দুই ধস্তাধস্তি হয় তারপরই অপর্ণা অমরেন্দ্রর কব্জীতে দাঁত বসিয়ে দেয় প্রাণপণে।

অমরেন্দ্র একটা অস্ফুট কাতর শব্দ করে আলিঙ্গন শিথিল করে দেয়—অপর্ণা তখনও রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

রাগে অপমানে তার দু চোখ ফেটে জল আসে।

উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অপর্ণা—এক ধাপ নীচের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অমরেন্দ্র তখনও।

অপর্ণা ঠাস্ করে একটা চড় কষিয়ে দিলে অমরেন্দ্রর গালে তারপর এক প্রকার ছুটেই যেন বাকী সিঁড়িগুলো ডিঙিয়ে উপরে উঠে যায়।

এবং উপরে উঠতেই চোখাচোখি হয়ে যায় দিদি মাধুরীর সঙ্গে।

মাধুরী সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া দেখেছে দোতলার মেক্আপ রুমের সামনে ল্যানডিংয়ের উপর দাঁড়িয়ে।

অমরেন্দ্রর সঙ্গে মাধুরীর চোখাচোখি হয়ে যায়।

মেক্‌আপ রুমের জোরালো আলো মাধুরীর চোখেমুখে এসে পড়েছে।

তার দু-চোখে ঘৃণা—আক্রোশ যেন উপছে পড়ছে তখন।

অমরেন্দ্র সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিঃশব্দে একবার মাধুরীর দিকে তাকিয়ে দোতলায় নিজের মেক্‌আপ রুমের মধ্যে ঢুকে যায়।

বেশ জোরেই দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল অপর্ণা অমরেন্দ্রর বাম কব্জীতে। কালো হয়ে রক্ত জমে উঠেছে তখন।

জ্বালা করছে বেশ ক্ষতস্থানটা।

আয়নার সামনে চেয়ারটার উপর বসে অমরেন্দ্র টিনচার আয়োডিনের শিশিটা বের করে ড্রয়ার থেকে তুলোয় করে একটু আয়োডিন লাগিয়ে দেয় ক্ষতস্থানের উপর।

মাধুরী এসে ঘরে ঢুকল।

আয়নায় মাধুরীর ছায়া পড়ে।

অমরেন্দ্র যেন দেখেও দেখে না।

সামনে সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে সেটায় অগ্নিসংযোগ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

মাধুরী দাঁড়িয়ে আছে দরজার ওপর।

চেয়ে আছে অমরেন্দ্রর দিকেই।

একটা দীর্ঘ টান দিয়ে সিগারেটটায়, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে অমরেন্দ্র শান্তকণ্ঠে বলে, পিছন দিকে না তাকিয়েই বলে, এস মাধু, কিছু বলবে ?

মাধুরী কোন জবাব দেয় না—নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে।

হঠাৎ যেন ঐ সময় কথাটা মনে পড়েছে এইভাবে অমরেন্দ্র বলে ওঠে, ও—তোমার তো আজ টাকার দরকার—আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, দাঁড়াও—

অমরেন্দ্র সামনের টানা থেকে পার্সটা বের করে তা থেকে দশ টাকার নোট গুনে গুনে দশটা বের করে মাধুরীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে - কত চেয়েছিলে যেন মনে নেই, আপাততঃ এই একশ নাও, দরকার হলে কাল থিয়েটারে এসে আবার নিও।

আশ্চর্য! যে প্রচণ্ড ঘৃণা আর আক্রোশের জ্বালাটা এতক্ষণ মাধুরীর বুকের মধ্যে পুড়িয়ে তাকে খাক্‌ করে দিচ্ছিল সেটা যেন দপ্‌ করে নিভে গেল।

এতটুকু বহিঃপ্রকাশও হল না তার।

বরং হাত বাড়িয়ে মাধুরী নোটগুলো নিল অমরেন্দ্রর কাছ থে:ক, তারপর নিঃশব্দে অমরেন্দ্রর মেক্‌আপ রুম থেকে বের হয়ে এল মাধুরী।

মাধুরী পাশের পর পর দুখানা ঘর ছেড়ে তৃতীয় মেয়েদের মেক্‌আপ রুমের মধ্যে ঢুকে যেন থমকে দাঁড়াল।

থিয়েটার ভেঙে গিয়েছে—অন্যান্য মেয়েরা সব চলে গিয়েছে—কেবল একটা চেয়ারের উপর বসে সামনের টেবিলে মাথা রেখে অপর্ণা ফুলে ফুলে কাঁদছে।

কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল মাধুরী ক্রন্দনরতা অপর্ণার দিকে তাকিয়ে, হাতের

মুঠোয় তখনও করকরে নোটগুলো ঘামে ভিজছে।

একবার মনে হল মাধুরী যায়, তখুনি ছুটে গিয়ে অমরেন্দ্রর মুখের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসে নোটগুলো।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে দু'মাসের বাড়ি ভাড়া চল্লিশ টাকা বাকি পড়েছে—দশ টাকা ইলেকট্রিকের বিল দিতেই হবে কালই—তাছাড়া হাতে বাজার খরচের একটি পয়সা নেই কাল।

গত চারদিন ধরে প্রত্যহ মাধুরী অমরেন্দ্রর কাছে টাকা চাইছিল কিন্তু অমরেন্দ্র দেয়নি।

বলেছে, দেখছ তো বিক্রী একেবারে নেই—নতুন বই পনের-কুড়িদিনের মধ্যেই খুলি, তারপর টাকা নিও।

মাধুরী বলেছিল, ততদিন কি করে বাঁচব—

একেবারেই হাসালে মাধু—তোমাদের উপোস দিতে হবে—

ইচ্ছে হয়েছিল মাধুরীর একটা চড় বসিয়ে দেয় অমরেন্দ্রর গালে কিন্তু পারেনি—পারে তো নিই—আর এও জানত রাত্রে যখন অমরেন্দ্র আসবে তার ঘরে, হেসে তাকেই তার শয্যার পাশটিতে স্থানও করে দিতে হবে। এবং অমরেন্দ্রের ক্ষুধার্ত আলিঙ্গনে ধরাও তাকে দিতে হবে—তা সে যত অনিচ্ছা বা ঘৃণাই হোক।

না—ওসব দুর্বলতার কোন মানে হয় না।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেল মাধুরী অপর্ণার সামনে—ওর মাথায় একখানা হাত রেখে বিষণ্ণ কণ্ঠে ডাকে, অপি—

কাঁদতে কাঁদতেই মাথা তুলে অপর্ণা বলে, ওকে—ঐ রাস্কেলটাকে আমি খুন করব দিদি—খুন করব!

কাকে খুন করবি রে? কি বলছিস তুই—

ব্যাপারটা যেন বিন্দুবিসর্গও জানে না মাধুরী এমনি ভাব দেখায়।

দিদি—

বিস্ময়ে অপর্ণা তাকায় দিদি মাধুরীর মুখের দিকে।

কি রে?

কিছু না—

কাঁদছিলি কেন?

এমনি।

চল্—বাড়ি যাবি না—রাত হল—

হ্যাঁ—চল্।

অপর্ণা চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়াল।

থিয়েটার থেকে বেশী দূরে নয় ওদের বাড়ি।

একটা রিকশায় পাশাপাশি দু বোন বসে যেতে যেতে মাধুরীর বছর তিনেক আগেকার কথা মনে পড়ে।

ডায়মণ্ড থিয়েটারে কাজ করতে করতেই ও অমরেন্দ্রর নজরে পড়েছিল। ওর আগে ছিল ফিরোজা বলে এক অভিনেত্রী।

মাধুরীর সঙ্গে আলাপ হবার পর ফিরোজাকে একেবারে ভুলে গিয়েছিল অমরেন্দ্র। এবং ফিরোজাকে একদিন সেই ব্যাপারে দুঃখ করতে শুনে হেসেছিল মাধুরী।

ফিরোজা সেদিন গালাগালি দিয়েছিল অমরেন্দ্রকে এবং বলেছিল, ইচ্ছে করে ঐ হারামজাদার গলায় পা দিয়ে ওকে শেষ করে দিই—চায়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিই—

কত দুঃখে আর কত লজ্জায় যে একজন মেয়েমানুষের মুখ থেকে তার দয়িতের সম্পর্কে এতবড় নিষ্ঠুর কথা বের হতে পারে সেদিন না বুঝলেও আজ বুঝতে পারে মাধুরী।

এতক্ষণ কাঁদছিল অপর্ণা—এখন পরম নিশ্চিন্তে দিদির কাঁধের উপরেই মাথা দিয়ে রিকশায় বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

আহা ছেলেমানুষ! মাধুরী বাঁ হাতটা দিয়ে সস্নেহে বোনকে জড়িয়ে ধরে।

অনেক ছোট বয়েসে অপর্ণা তার থেকে।

তা খুব কম করেও এগারোর ছোট তো হবেই!

কি জানি কেন হঠাৎ মাধুরীর দু চোখের কোণ জ্বালা করে জল নেমে আসে। সামনের নির্জন রাস্তাটা চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যায়।

পরের দিন আবার অমরেন্দ্র থিয়েটার ভাঙবার আগেই মাধুরীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার মেকআপ রুমে আরও একশো টাকা তার হাতে তুলে দেয়।

আর মাধুরীর কোনো সন্দেহই থাকে না। বুঝতে সে পারে অমরেন্দ্র তাকে দাদন দিচ্ছে—আর কেন যে দিচ্ছে তাও বুঝতে পারে।

বুঝতে পেরেও সে ফিরিয়ে দিতে পারে না, টাকাগুলো হাত পেতেই নেয়।

বুকের ভিতরটা জ্বলতে থাকে, বোন হয়ে নিজের মায়ের পেটের বোনের কত বড় অপমানটাই না সে করছে!

আজ পর্যন্ত কি করেছে কোন মায়ের পেটের বোন কোন মায়ের পেটের বোনের এতবড় অপমান!

বলতে গেলে নিজে হাতেই তুলে দিয়েছিল অপর্ণাকে অমরেন্দ্রর হাতে মাধুরী।

উঃ, সে রাতটার কথা কি আজ ভুলেছে মাধুরী!

কি প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি সেদিন!

সোঁ সোঁ হাওয়ার ঝাপটা! গুরু গুরু মেঘের ডাক। ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ।

দুই বোন এক শয্যায় শুয়েছিল তারপর একসময় অপর্ণা ঘুমিয়ে পড়লে উঠে গিয়ে মাধুরী অমরেন্দ্রকে নিয়ে এসে পাশের ঘর থেকে ঐ ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়েছিল।

তারপর কি দুশ্চিন্তা বাকি রাতটুকু মাধুরীর!

সর্বক্ষণ জেগে বসে পাশের ঘরে কান খাড়া করে ছিল অপর্ণার চিৎকার বা কান্না

শোনবার আশায়।

কিন্তু আশ্চর্য।

কিছুই সে শুনতে পেল না।

সামান্য এতটুকু চিৎকার বা চেঁচামেচি কিছুই না।

এবং একসময় ধীরে ধীরে বৃষ্টি থেমে গেল। হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল—মেঘের ডাক মিলিয়ে গেল।

ভোরের প্রসন্ন আলোয় চারিদিক হেসে ওঠে।

বৃষ্টিধৌত প্রকৃতি যেমন স্নিগ্ধ তেমনি শান্ত।

মাধুরী স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের জল ফোটায়—চা ভেজায়।

কাপে চা ছাঁকছে এমন সময় অপর্ণা এসে দাঁড়াল, চা হয়েছে দিদি আমাকে এক কাপ চা দাও না—

মাধুরী চেয়ে থাকে কেমন যেন বোবা বিস্ময়ে অপর্ণার সদ্য ঘুম ভাঙা ফোলা ফোলা কেমন যেন কুৎসিত মুখটার দিকে।

কোন বিরক্তি আক্রোশ ঘৃণা বা লজ্জার চিহ্নমাত্রও তো অপর্ণার চোখে মুখে কোথাও নেই।

বরং একটা তৃপ্তির ক্লান্তি যেন সমস্ত মুখখানা অপর্ণার জুড়ে রয়েছে।

রাতারাতি অপর্ণা বয়েসের নির্দিষ্ট একটা কোঠা পার হয়ে যৌবনে পা ফেলেছে যেন। সারা দেহে যৌবনের উজ্জ্বলতা যেন টলমল করছে।

অপর্ণা যেন জোয়ারের নদীর মত কানায় কানায় হঠাৎ রাতারাতি ভরে উঠেছে।

মুখ ধুবি না ?

না—তুমি চা দাও! আলস্যের একটা ক্লান্ত হাই তুলে অপর্ণা সামনের ছোট চৌকিটার উপর বসে পড়ে।

মাধুরী বোনকে এক কাপ চা দিয়ে ও আর এক কাপ চা তৈরী করে নিয়ে অমরেন্দ্রর ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

অমরেন্দ্রর তখনও কিন্তু ঘুম ভাঙেনি।

পাশবালিশটা বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে তখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

অমরবাবু— ও অমরবাবু—

অমরেন্দ্র চোখ বুজেই সাড়া দেয়, উঁ—

তোমার চা—

রেখে যাও।

চায়ের কাপটা শয্যার শিয়রে ছোট একটা টুলের ওপর নামিয়ে রেখে ঘর ছেড়ে চলে যায় মাধুরী।

আর মাধুরী ও-পথে পা বাড়ায়নি।

আর কোন পুরুষকে শোবার ঘরে ঢুকতে দেয়নি সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সে।

বরং কেউ কেউ ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলে মৃদু হেসে বলছে, আমার কিন্তু ভাই বিশ্রী একটা রোগ আছে—

রোগ !

হ্যাঁ—শরীরে বিশ্রী একটা রোগ আছে—

কামোন্মত্ত প্রেমিক পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে কথাটা শুনে দু'পা পিছিয়ে গিয়েছে, কি রোগ মাধুরী—

কে জানে ডাক্তাররা রক্তে—

তা চিকিৎসা করাও না কেন ?

ও রোগ নাকি চিকিৎসাতেও সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না।

পুরুষমানুষ পিছিয়ে গিয়েছে।

আগে ও-পথে বেশ কিছু রোজগার হত—এখন পথটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর কেউ না হলেও মা বিমলা ক্ষুন্ন হয়।

বাঁকা বাঁকা কথা বলে।

কিন্তু মাধুরী কান দেয় না সে সব কথায়। এখানে ওখানে অভিনয় করে যা দু-চার টাকা রোজগার করতে পারে মার হাতে এনে দেয়।

তাছাড়া ঐ সময়টা হঠাৎ অমরেন্দ্রও উদার হয়ে উঠেছিল ! থিয়েটারে সুবিধে হয় না দেখে সে তখন যাত্রার দলে নাম লিখিয়েছে।

বেশ মোটা টাকাই উপার্জন করেছে অমরেন্দ্র তখন।

কিন্তু দুটো বছর না ঘুরতে ঘুরতেই চাকা যেন আবার অন্য দিকে ঘুরতে শুরু করল।

যাত্রার কষ্ট অমরেন্দ্রর মত সৌখীন লোকের সহ্য হবে কেন ?

একটানা যাত্রার দলে সে থাকতে পারে না। টৈটৈ করে এ জায়গা থেকে ও জায়গা যাত্রা করে করে ঘুরতেও পারে না।

যাত্রার দল ছেড়ে আবার নিজের একটা ছোট দল গড়ে এখানে ওখানে অভিনয় করে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু তাতে করে নির্দিষ্ট কিছু উপার্জন হয়নি।

কাজেই অপর্ণাদের সংসারে অমরেন্দ্রর দাক্ষিণ্যের হাতটা ক্রমশঃ যেন গুটিয়ে আসতে লাগল।

ইতিমধ্যে অপর্ণাও অমরেন্দ্রর সঙ্গে সঙ্গে এদিকে অভিনয় করতে শুরু করেছে এবং নানা অফিস ক্লাবের অভিনয়ে যোগ দিচ্ছে।

তবু অভাবটা এক এক সময় বিশ্রী ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। মাধুরী দিশেহারা হয়ে পড়ে।

কারণ সংসারের যা কিছু ঝামেলা তাকে সামলাতে হয়।

অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেলেও অমরেন্দ্র মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু দিত যখন যেমন পারত। এবং যা দেয় সেও নেহাৎ কম নয়।

আর সেই কারণেই সেদিন অপর্ণা অমরেন্দ্রকে ঐ ভাবে তাড়িয়ে দেওয়ায় খুশী হতে পারেনি।

টাকার দিকটা তো ছিলই সেই সঙ্গে আরও একটা দিক ছিল মাধুরীর।

হতভাগিনী অমরেন্দ্রকে সত্যি সত্যিই ভালবেসেছিল।

এমন কি সেইজন্য কখনও কখনও অমরেন্দ্র অপর্ণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পরও তার ঘরে যখন এসে ঢুকত মাধুরী তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারত না।

অমরেন্দ্রর লজ্জা বলে কিছু ছিল না কিন্তু বেশ্যার মেয়ে নটী মাধুরীর লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করত—তা সত্ত্বেও অমরেন্দ্রর আলিঙ্গন থেকে পালিয়ে যেত না।

কিন্তু অভাবকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

ইদানীং মাধুরী ও অপর্ণার দুজনের কারোরই বড় একটা অফিস ক্লাব থেকে অভিনয়ের ডাক আসে না!

অমরেন্দ্রও সেই যে কাল গিয়েছে আর দেখা নাই।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে চুপটি করে বসে ছিল মাধুরী, কিছুক্ষণ বিমলার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গিয়েছে—তার আফিং ফুরিয়েছে; আফিং নেই—মাধুরীর কাছে কেনবার পয়সাও নেই।

মাধুরী পাশের ঘর থেকে বের হয়ে অপর্ণার ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢোকে, অপি—

অপর্ণা বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সাজগোজ করে, দিদির মুখের দিকে তাকায়, কেন?

বেরুচ্ছিস নাকি?

হুঁ—

তোর কাছে কিছু আছে রে?

অপর্ণা বালিশের তলা থেকে বটুয়াটা বের করে তা থেকে একটা দশ টাকার নোট তুলে দিদির দিকে এগিয়ে ধরে।

॥ ১০ ॥

রিকশাটা অপর্ণাদের বাড়ির কাছাকাছি এসে পৌঁছল যখন, রাত তখন বেশ হয়েছে। প্রায় সোয়া দশটা।

রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দেয় তাপস।

রিকশাটা ঠুংঠুং ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলে যায়, দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, আর দেখা যায় না।

তাপস অপর্ণার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, তাহলে চলি এবার—

এক্ষুনি চলে যাবে? অপর্ণা মুখ তুলে তাকাল তাপসের দিকে, আবছা আলো-আঁধারিতে ভাল করে বোঝা যায় না তাপসের মুখ।

হ্যাঁ—যাই, রাত হল, তাপস আবার বলে।

ভেতরে আসবে না? অনুরোধ করে অপর্ণা।

না—আজ আর নয়। আজ যাই—

একটু বসে যাবে না?

না—দু'দিন বাড়ি যাইনি—

ওঃ—

মৃদুকণ্ঠে কথাটা বলে অপর্ণা যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকে, ভেতরে যাবার কোন ইচ্ছাই প্রকাশ পায় না।

দূরের গ্যাসপোস্টের আলো একটুখানি অপর্ণার বাঁ গালের একাংশে এসে যেন আলতোভাবে ছোঁয়া দিয়েছে। গালের অন্য দিকটা অন্ধকারে ঝাপসা ঝাপসা মনে হয়, তবু সেই আলো-ছায়ায় ঝাপসা ঝাপসা অপর্ণার দিকে তাকিয়ে তাপসের মনে হয় অপর্ণা যেন একটু কেমন ইতস্ততঃ করছে, যেন কিছু বলতে চায়।

কিছু বলবে অপর্ণা?

তাপসবাবু—

বল।

কটা টাকা দিতে পার? চোখকান বুজে যেন কোনমতে কথাটা উচ্চারণ করে ফেলে অপর্ণা। তারপরই একেবারে চুপ।

নিশ্চয়ই—তা সামান্য এই কথাটা বলতে এতক্ষণ এত ইতস্ততঃ করছিলে কেন? বলতে বলতে পকেটে হাত চালিয়ে গোটা ত্রিশেক টাকা বার করে তাপস।

এই নাও—ত্রিশ টাকা, চলবে?

হ্যাঁ—

অপর্ণা কোনমতে সাড়া দিয়ে হাতটা বাড়িয়ে তাপসের হাত থেকে নোট তিনটে নেয়, তাপসের পকেটে অবিশ্যি আরও প্রায় আশি টাকার মত ছিল ঐ সময়।

দু'দিনের ক্ষেপে মোটা টাকাই কামিয়েছে কিন্তু মাকে সে গোটা চল্লিশেক টাকা দেবে—মার চশমা করতে হবে আর কৃষ্ণারও দেখছিল সেদিন—কলেজে পরে যাওয়ার শাড়িগুলো একদম ছিঁড়ে গেছে—গোটা দুই শাড়ি কেনবার টাকা অন্ততঃ তাকে দিতে হবে, নচেৎ পুরোপুরি পঞ্চাশ টাকাই দিতে পারত তাপস অপর্ণাকে।

অপর্ণা এই প্রথম যেচে তার কাছে টাকা চেয়েছে।

এই প্রথম হাত বাড়িয়েছে সে তার সামনে।

তাপস বলে, আর যদি দরকার থাকে, কাল হবে না, পরশু এসে দিয়ে যাব। কাল আর একটা ক্ষেপের কথা আছে—

না, না—এখন আর দরকার নেই, এতেই চলে যাবে এখন—

তাহলে চলি—

এস—

তাপস আর দাঁড়াল না, অন্ধকারে ধীরে ধীরে গলিপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অপর্ণা কিন্তু তবু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বাড়ির দরজার সামনে, অন্ধকারে কেমন যেন অন্যমনস্ক। তারপর একসময় এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ল।

বার দুই দরজার কড়া ধরে নাড়তেই মাধুরী এসে দরজা খুলে দিল। এবং দরজা খুলে দিয়ে অপর্ণা ফিরে যাচ্ছিল, পিছন থেকে অপর্ণাকে ডাকে দিদি—

মাধুরী ফিরে দাঁড়ায়।

বারান্দায় টিমটিমে একটা পনের পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। ম্লান আলোয় বারান্দাটা থমথম্ করছে।

এই নে—

একখানা নোট নিজে রেখে বাকি দুখানা নোট অপর্ণা দিদির দিকে বাড়িয়ে দেয়—ধর্—

কি ?

টাকা—কুড়ি টাকা আছে—

একবার মাত্র মাধুরী আবছা আলোয় অপর্ণার মুখের দিকে তাকাল। প্রসাধনের কোন চিহ্নও নেই অপর্ণার মুখে।

অপর্ণার প্রসাধনহীন মুখখানি যেন মাধুরীর কেমন বিষণ্ণ কেমন ক্লান্ত বলে মনে হয়, ঐ মুহূর্তে।

তবু কিছু বলে না মাধুরী, হাত বাড়িয়ে বোনের হাত থেকে নোট দুটো নিয়ে এগিয়ে যায়।

অপর্ণা আবার ডাকে, দিদি—

কি ?

কিছু রান্না হয়েছে ?

হ্যাঁ—ভাত আর টকের ডাল—

দেখ্ না কাউকে পাঠিয়ে মোড়ের সিংজীর দোকান থেকে একটু কষা মাংস যদি আনতে পারিস—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে—

তুই ঘরে যা, আমি দেখছি—

অপর্ণা এগিয়ে যায়, কিন্তু দু'পা-ও সে এগোয়নি, হঠাৎ পিছন থেকে মাধুরী ডাকে অপি—

কিছু বলছিলি—

ঘুরে দাঁড়ায় অপর্ণা। তাকায় দিদির মুখের দিকে।

মাধুরী যেন কি বলবার চেষ্টা করে।

অপি—

কি ?

না—কিছু না—তুই যা, আমি মাংস এলেই তোর ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

অপর্ণা আর দাঁড়ায় না। মাধুরীও রান্নাঘরের দিকে চলে যায়—চা কেতলিতে ভিজিয়ে এসেছে।

অন্ধকার আর অপরিসর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নিজের ঘরের দিকে উঠতে থাকে অপর্ণা। সত্যিই কেন যেন অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছে তখন নিজেকে সে।

কিন্তু দোতলায় উঠে নিজের ঘরের দরজা বরাবর এসে হঠাৎ সে যেন থমকে দাঁড়ায়—তার ঘরের দরজাটা খোলা !···একেবারে দরজার কবাট দুটো টান টান করে খোলা।

ঘরের আলো জ্বলছে। সেই খোলা দরজাপথে চোখে পড়ে অপর্ণার ঘরের নীল আলোটা।

আশ্চর্য ! তার ঘরে আলো জ্বলছে কেন ! সে না থাকলে তার ঘরে তো আলো জ্বলে না !

তারপরই নজরে পড়ে খোলা দরজা পথে। দীর্ঘ একটা ছায়া দেয়ালের গায়ে একবার এদিক একবার ওদিকে যেন চলে চলে বেড়াচ্ছে।

অপর্ণা কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে সঞ্চরণশীল ছায়াটা দেখে। তারপর একসময় নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে খোলা দরজাপথে ঘরে পা দেয় এবং ঘরের মধ্যে পা ফেলেই থমকে দাঁড়ায়।

পিছন দিকে হাতদুটো রেখে অমরেন্দ্র ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে একাকী পায়চারি করছে।

বিস্ময়ে যেন একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছে। একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে। একটা কথা পর্যন্ত মুখ দিয়ে বের হয় না। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

অমরেন্দ্র প্রথমটায় ওকে দেখতে পায়নি—দরজাটার দিকে পিছন ফিরে পায়চারি করছিল, হঠাৎ একসময় ঘুরে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে গেল দুজনের।

এই যে অপু—

প্রথমে অমরেন্দ্রই কথা বলে।

অপর্ণা তখনও নির্বাক—তখনও পাথর !

অমরেন্দ্র মৃদু হেসে আবার বলে, ভবতারিণী থিয়েটারে কনট্রাক্ট হয়ে গেল—যোগজীবন সরকারের ওখানে থেকেই সোজা এখানে আসছি—

অপর্ণা চুপ।

অমরেন্দ্র পূর্ববৎ বলে চলে—ওদের নতুন বই খুলছে—মাসে আটশো টাকা মাইনে—শুনলাম, নতুন বইটায় তোমার একটা ভাল পার্ট আছে—আজ একবার যোগজীবন সরকারকে বলেছি, মানে ভণিতা গেয়ে রেখেছি—কাল বলব—পষ্টাপষ্টি। ওখানে যদি হয়ে যায় তোমার—শ'তিনেক তো দেবেই।

ধন্যবাদ—

হঠাৎ যেন একটা বন্দুকের গুলি এসে লাগল অমরেন্দ্রর মুখের উপরে, থতমত খেয়ে ও তাকাল অপর্ণার মুখের দিকে।

অপর্ণা—

অমরেন্দ্রবাবু—

অপর্ণা—

আমি খুব খুশী হব যদি এই মুহূর্তে আপনি এখান থেকে বের হয়ে যান।

অপর্ণা—তু—তুমি—

যান।

চলে যাব?

তাই তো বলছি।

শান্ত, ইস্পাতের মত কঠিন কণ্ঠস্বর অপর্ণার।

ইতিমধ্যে কখন এক কাপ চা হাতে মাধুরী দরজার ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অপর্ণার শেষ কথাটা তার কানে যেতেই সে থমকে দাঁড়ায়।

অপর্ণার বের হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই অমরেন্দ্র এসেছিল এবং এসে মাধুরী ও বিমলার কাছে সে রাত্রের ব্যাপারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ও সেই সঙ্গে গোটা চল্লিশেক টাকাও ওদের হাতে তুলে দিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করল, অপর্ণাকে দেখছি না—অপর্ণা কোথায়?

বিমলা বললে, সে একটু বের হয়েছে।

বের হয়েছে! কোথায়?

তুমি বস বাবা—এখুনি হয়ত সে এসে পড়বে—কাছেই হয়ত কোথাও গেছে।

অমরেন্দ্র আর কোন কথা বলে না—সোজা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় এসে অপর্ণার ঘরে ঢোকে।

বিমলা খুব খুশী।

দুদিন আফিং নেই—তাড়াতাড়ি সে ছোটে আফিং আনবার জন্য। কিন্তু মাধুরী নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

কি জানি, কেন সে একটু যেন অস্বোয়াস্তি বোধ করতে থাকে।

অপর্ণাকে সে ভাল করেই চেনে।

সে রাত্রের পর সহজে অপর্ণা অমরেন্দ্রকে ক্ষমা করতে পারবে না—পতিতা অভিনেত্রীর ঘরের মেয়ে হলেও অপর্ণার একটা অদ্ভুত আত্মসম্মান-বোধ আছে যেন।

এত সহজে সে মাথা নোয়াবে না।

তারপর অপর্ণা ফিরে এল—টাকা দিল তার হাতে।

বলতে গিয়েও অমরেন্দ্রর কথাটা যেন বলতে পারল না মাধুরী অপর্ণাকে।

চা প্রায় হয়ে গিয়েছিল—তাড়াতাড়ি চায়ের কাপটা হাতে মাধুরী উপরে উঠে আসে।

কই—এখনও দাঁড়িয়ে রইলেন—যান—যান ঘর থেকে বের হয়ে।

আবার অপর্ণার কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

মাধুরী বুঝতে পারে অতঃপর আর তার দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হবে না। সে এবার এগিয়ে গিয়ে ডাকে পিছন থেকে, অপি—

কিন্তু অপর্ণা দিদির দিকে ফিরেও তাকায় না—সাড়াও দেয় না। সে আবার বলে, যান—যান বের হয়ে—

আঃ, অপি—কি হচ্ছে—

মাধুরী বাধা দেবার চেষ্টা করে।

থাম্ তুই দিদি—কোন্ সাহসে আবার এ বাড়িতে ও পা ফেলেছে আমি জানতে চাই—

অমরেন্দ্র এতক্ষণে মুখ খোলে, সাহস আবার কি—একটা বেশ্যার ঘরে আসতে সাহসের প্রয়োজন হয় না অপর্ণা দাসী—প্রয়োজন যা হয়, সেটা হচ্ছে টাকা—আর সে টাকা অগ্রিম হাতে তুলে দিয়েই ঘরে পা দিয়েছি—

তীব্র শ্লেষ আর প্রচণ্ড ঘৃণার বিষ যেন অমরেন্দ্রর মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি কথার মধ্যে ঝরে পড়ে।

মাধুরীও এবার নির্বাক। বোবা।

দিয়ে দাও আমার টাকা—

দিদি—

ফিরে তাকায় অপর্ণা মাধুরীর মুখের দিকে।

মাধুরীর আঁচলেই টাকা ছিল—মাত্র দশটা টাকা বিমলা নিয়েছিল—তবু মাধুরী কি করবে—কি বলবে ভেবে পায় না।

কিন্তু তাকে আর বেশী অবকাশও দেয় না অপর্ণা—সহসা এগিয়ে এসে প্রচণ্ড এক থাবা বসিয়ে দিদির হাত থেকে চায়ের কাপটা ফেলে দেয়।

ঝন্‌ঝন্ শব্দে চায়ের কাপটা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

কোথায় ওর টাকা ?

বাঘিনীর মত যেন রুখে দাঁড়িয়েছে তখন অপর্ণা।

দু চোখে আগুন।

মাধুরী আঁচল থেকে টাকা খুলে অপর্ণার হাতে দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণা সেই নোটগুলো—অমরেন্দ্রর নোটগুলো অমরেন্দ্রর গায়ের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বলে ওঠে, নিন—বেরিয়ে যান—

অমরেন্দ্র নোটগুলো তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

আর অমরেন্দ্র বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কান্নায় যেন একেবারে ভেঙে পড়ে অপর্ণা।

বলে, ছিঃ ছিঃ, এত নীচে তুই নামলি কি করে দিদি—গলায় দড়ি জুটল না তোর—বিষ খেতে পারলি না—গঙ্গায় জলের তো অভাব ছিল না—

মাধুরীর দু চোখের কোলও তখন জলে ভরে গিয়েছে—সে এগিয়ে এসে অপর্ণাকে দু হাতে জড়িয়ে কেঁদে ওঠে, আমাকে ক্ষমা কর্ অপি—আমাকে ক্ষমা কর্ বোন—

অপর্ণাও দুহাতে মাধুরীকে জড়িয়ে ধরে !

দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে।

॥ ১১ ॥

অনেক রাত্রে ফিরেছে তাপস—ঘুম ভাঙেনি তাই।

ঘুম ভাঙল মায়ের ডাকে, এই তপু—উঠবি না—কত ঘুমোচ্ছিস!

তাপস চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে।

সামনে দাঁড়িয়ে মা আনন্দময়ী। মায়ের হাতে এক কাপ ধূমায়িত চা—

একটু বিব্রতই হয় তাপস। চা-টা তো বরাবর কৃষ্ণাই তাকে ঘরে এনে দেয় যতক্ষণ সে বাড়িতে থাকে, তা তার যত কাজই থাকুক না কেন।

এবং আশ্চর্য, ঠিক সময়েই যেন চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ায় কৃষ্ণা তাপসের সামনে।

কতদিন তাপস বলেছে—উঃ, এবারে বুঝতে পারছি, সত্যিই নিদারুণ চায়ের পিপাসা পেয়েছিল, কিন্তু কেমন করে তুই বুঝতে পারিস বল তো পেত্নী—

কি?

ঠিক কখন আমার চায়ের পিপাসা পাবে।

কৃষ্ণা জবাব দেয় না। হাসে। মৃদু মৃদু হাসে।

মায়ের হাতে তাই আজ চায়ের কাপটা দেখে সত্যিই বিব্রত হয় তাপস। অথচ পাশের ঘরে যে ঐ সময়টা কৃষ্ণা বসে পড়ছে' তাও তাপস জানে।

খুব ভাল ভাবেই জানে তাপস।

মায়ের হাত থেকে চায়ের কাপটা নিতে নিতে বলে তাপস, তুমি আবার কেন মা—পেত্নীটা কোথায়!

সে বোধ হয় তোর চা রেখে গিয়েছিল—ডেকেও ছিল হয়ত, ঘুম ভাঙেনি তোর। এসে দেখি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে তাই গরম করে নিয়ে এলাম।

তাপসও হাসে।

মা আনন্দময়ী একটি পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। তাপস চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মায়ের মুখের দিকে তাকায়।

অনেক দিন পরে যেন দেখছে ও মাকে। সত্যিই আজকাল তো তাপসের আনন্দময়ীর সঙ্গে বড় একটা দেখাই হয় না।

যা-ও দেখা হয় সামান্য দু-চার সেকেণ্ডের জন্য বাড়িতে ঢুকতে বা বেরুতে।

কয়েক মাস ধরেই একটা মতলব মাথার মধ্যে ঢুকিয়েছে তাপসের সাকরেদ—চুনী। বলেছে, মাস্টার—রোজগার তো তুমি মন্দ কর না, তাই বলছিলাম—

কি চুনী?

এ শালা চিনির বলদ আর কত কাল থাকবে!

তা কি করা যাবে বল্, লেখাপড়া শিখলাম না—ড্রাইভারী করেই যখন জীবনটা কাটাতে হবে—

সত্যি মাস্টার—তুমি যেন শালা মাইরী দিন দিন কেমন মেনীমুখো হয়ে যাচ্ছ—তুমি আবার শালা আমাকে উপদেশ ঝাড়—

কি বলতে চাস বলবি তো ?

কিছু কিছু করে যা পাও, তা থেকে জমিয়ে একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ি কিনে ট্যাক্সি করে ফেল—

ট্যাক্সি !

হ্যাঁ—নিজের গাড়ি ডাঁটসে চালাবে যখন খুশি—তাছাড়া দেখবে—এ শালা উঞ্ছবৃত্তির চাইতে অনেক বেশী কামাবে। ছোঃ ছোঃ, ঝাঁটা মার শালা ড্রাইভারী—

বলছিস ?

তবে কি—

কিন্তু—

কিন্তুটা আবার কি ?

না ভাবছি—ট্যাক্সি করা তো চাট্টিখানি কথা নয়।

মেয়েমানুষের মত কথা বলো না মাস্টার—কেন, ব্যাপারটা কি এমন গুরুচরণ শুনি ?

চুনীর কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেনি তাপস। সত্যিই তো খুব একেবারে অসম্ভব কিছু একটা তো বলেনি চুনী।

আজ না হোক, কাল না হোক—পাঁচ বছর পরেও তো হতে পারে।

ঐ শালা গর্জন সিং—সে বেটাও তো বছর চারেক আগে ড্রাইভারীই করত অন্যের গাড়িতে—মাসকয়েক হল একটা পুরনো ফোর্ড গাড়ি কিনে ট্যাক্সি বানিয়েছে।

দু পয়সা জমাচ্ছেও আজকাল।

সত্যি—

নয় তো কি—

সেদিন হঠাৎ রাস্তায় তাপসের গর্জন সিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, গর্জন সিং বলে. কেমন আছো তাপসবাবু—

ভাল—তোমার খবর কি সিংজী—

তাপস মৃদুকণ্ঠে ট্যাক্সিটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, আজকাল ট্যাক্সি চালাচ্ছ বুঝি ?

হ্যাঁ—

কার ট্যাক্সি ?

চুনীর মুখেই কথাটা শুনেছিল তাপস, তবু শুধায়।

কার আবার, হামার—

তোমার ?

তব্—শালা চিরটাকাল নোক্‌রি করব ! পয়সা জমিয়ে কিনে ফেললাম গাড়িটা—মজাসে আছি এখন। শালা কারো নোকর নই—

সেই থেকেই তাপস মনে মনে স্থির করে ফেলে, টাকা জমিয়ে নিজের ট্যাক্সি একটা করবে।

টাকাও কিছু কিছু সেইজন্য জমাচ্ছিল।

আর সেই কারণেই ইদানীং একটু বেশী করে না খাটলে পয়সা আসবে কোথা থেকে।

মার সঙ্গেও তাই ইদানীং কয়েক মাস বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ হত না তাপসের।

আজ অনেকদিন পর মাকে এত কাছাকাছি দেখে তাপসের হঠাৎ যেন কেন মাকে রুগ্ন ক্লিষ্ট বিষণ্ণ মনে হয়।

আরও মনে হয় মা যেন হঠাৎ কেমন বুড়িয়ে গিয়েছে।

চুলের দু পাশে পাক ধরেছে।

মা—

কি রে ?

আনন্দময়ী তাপসের মুখের দিকে তাকান। একটু যেন চমকেই তাকান।

কি হয়েছে মা ? কিছু বলবে ?

তাপস !

মা—

তপন চলে যাচ্ছে—

কে, বড়বাবু !

হ্যাঁ—

ও বড়বাবুর বুঝি এখানে আর পোষাচ্ছে না ! তা—

সামনের মাসে সে বিয়ে করছে রেজেস্ট্রি করে—

বিয়ে !

হ্যাঁ—তার অফিসেরই একটি মেয়েকে—দুজনেই এক অফিসে চাকরি করে—

ও—

তাই বলছিল—বিয়ের পরে সে-ও চলে যাবে—কোথায় নাকি ছোট বাসা দেখেছে।

তা সেজন্য তুমি এত ভাবিতই বা হয়ে পড়েছ কেন মা ! তাছাড়া বড়বাবু যে একদিন চলে যাবেন, সে কি তুমি জানতে না ?

জানতাম, কিন্তু—

তবে—

ভাবছি ওঁর সামান্য কটা টাকা পেনসন—

সেজন্য ভেবো না তো,—বড়বাবু যাদের সংসারে নেই, তাদের কি সব অচল হয়ে আছে নাকি—

তা নয়—

তবে ! তাছাড়া কতই বা দিতেন সংসারে বড়বাবু। যেতে দাও মা—মাত্র তো

সত্তরটি টাকা—ও টাকা না পেলেও আমাদের একরকম করে চলে যাবে—

সব ভার তুই একা—

তা আর কি করা যাবে। শোন—কৃষ্ণাকে নিয়ে তুমি আজ একবার আমার পরিচিত চোখের ডাক্তার জিতেন চক্রবর্তীর কাছে যাও—

সেখানে গিয়ে আবার কি হবে ?

কি হবে মানে;—বলছিলে না চোখে কম দেখ—দেখতে পাও না ভাল করে—চোখটা দেখাতে হবে না, না কি—

না, না—এখন ওসব—

বালিশের তলা থেকে নোটগুলো বের করে মার সামনে তুলে ধরে তাপস, নাও, টাকাগুলো রাখ—একটা চশমা করতে হবে—আর পেত্নীটার কলেজে যাবার শাড়িগুলো সব ছিঁড়ে গেছে দেখছিলাম; দুটো শাড়ি ওকে কিনে দিও—

বলছিলাম—এখন এই টানাটানির মধ্যে কলেজে পড়ে—

না মা—

তপু—

হ্যাঁ, ওর পড়া তুমি বন্ধ করতে চেও না মা। ওকে আমরা কি দিয়েছি বল—কিছুই দিইনি—দিতে পারবও না—এই লেখাপড়ার মধ্যে দিয়েই হয়ত একদিন ও নিজেকে খুঁজে পাবে, নিজেকে সার্থক করে তুলবে—

কিন্তু—

না মা—আমি লেখাপড়া কোনদিন শিখলাম না—অবিশ্যি তোমরা চেষ্টা করেছ কিন্তু আমার মন বসেনি—ফলে ও-জগতের দরজাটা আমার কাছে বন্ধই হয়ে ছিল। কিন্তু ঐ পেত্নী—বুঝলে মা ঐ পেত্নীটা সেই দরজাটা খুলে দিল আমার চোখের সামনে একদিন—

তপু—

হ্যাঁ মা—আমি দেখলাম—অনুভব করলাম সে এক বিচিত্র আনন্দ যেন—

আনন্দময়ী বলেন, দরকার নেই বাবা তোর লেখাপড়া শিখে—না শিখেছিস তুই, ভালই হয়েছে—

হলে হয়ত তোমার বড়বাবুর মত একজন ছোটবাবু হতাম, তাই না—হাসতে হাসতে তাপস বলে, তা কে জানে, হয়ত সত্যিই হতাম—

বলতে বলতে শয্যা থেকে উঠে পড়ে গায়ে জামাটা চড়াতে থাকে তাপস।

আনন্দময়ী বলেন, বেরুচ্ছিস নাকি ?

হ্যাঁ মা—একটু কাজ আছে—

ফিরবি কখন ?

দেখি—তবে বারোটা সাড়ে-বারোটার মধ্যে না ফিরলে বাইরেই খেয়ে নেব। তুমি বসে থেকো না যেন। আর একটা কথা—

কি ?

বড়বাবুকে বাধা দিও না—যেতে চায়, যাক—

না, বাধা আর দেব না—

হ্যাঁ—দিও না—

উনি হাত ধরে কাল কাঁদলেন—কত বললেন, যতদিন আমি বেঁচে আছি, যাস না—অন্ততঃ একসঙ্গে থাক্, জানি তো একসঙ্গে এরপর থাকবি না—কিন্তু শুনল না।

কি বললে ?

এখানে নাকি সে আর থাকতে পারবে না—

থাকতে পারবে না ?

না, দম নাকি বন্ধ হয়ে আসছে ওর—

তাপস আর কোন কথা বলে না—মৃদু হেসে জুতোটা পায়ে গলিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

সিঁড়ি দিয়ে নামছে—তপনের সঙ্গে মুখোমুখি।

তপন অফিসে বেরুচ্ছিল বোধ হয়, তাপস পাশ কাটিয়েই চলে যাচ্ছিল; কিন্তু তপন ডাকল, তাপস—

তাপস ঘুরে দাঁড়ায়, কিছু বলবে ?

হ্যাঁ—

আমি শুনেছি—

কি শুনেছিস ?

তুমি চলে যাচ্ছ—বিয়ে করছ—

হ্যাঁ, don t mind—বুঝতেই পারছিস, বিয়ে করে একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে এই অভাব, অস্বাস্থ্য ও কুশ্রীতার মধ্যে টেনে আনতে পারি না—

নিশ্চয়ই তো—

তাছাড়া আমার একটা কর্তব্য—দায়িত্বও আছে তার ওপরে—

তাপসের ইচ্ছে হল একবার বলে, ভদ্রলোকের মেয়ে বুঝি একমাত্র সেই মেয়েটিই যাকে সে বিয়ে করতে চলেছে এবং তার প্রতিই তার যা কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব—মা ও বোন বুঝি সে পর্যায়ে পড়ে না—কিন্তু কিছুই বলে না সে সব। কেবল বলে, আর কিছু বলবে ?

না—আর কি—of course, আমি জানতাম তুই বুঝবি আমাকে…at least এ বাড়ির মধ্যে যা তোরই কিছু sense আছে—

তাপস আর দাঁড়ায় না—কোন জবাবও দেয় না তপনের কথার। কি একটা অবিমিশ্র ঘৃণায় তখন তার সর্বশরীর যেন বার বার কুঞ্চিত হয়ে উঠছিল।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যায় তাপস।

তাপসকে সব বলতে পেরে তপনও যেন মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়।

একমাত্র যা ভয় এ বাড়িতে তপনের ঐ তাপসকেই ছিল। আকাট—গোঁয়ার

গোবিন্দ—মান রেখে কথা বলবে না।

হৃষ্টচিত্তেই তপন রাস্তায় বের হয়ে হাঁটিতে শুরু করে।

খবরটা অফিসে গিয়েই সুচিত্রাকে দিতে হবে। বলতে হবে, সব ঠিক হ্যায়—

কটা দিন সত্যিই তপনের ভাবনার যেন অন্ত ছিল না।

বলতে হবেই কথাটা বাড়িতে কিন্তু কেমন করে যে বলবে, সেটাই ভাবছিল। অথচ সব ঠিক—আর না বললেও নয় এবং সুচিত্রাও ঘন ঘন তাগাদা দিচ্ছিল।

আজ আর ট্রামে করে অফিসে যেতে ভাল লাগে না তপনের। একটা ট্যাক্সিতেই হাত ইশারায় ডেকে উঠে বসে।

কিধার জায়গা বাবুজী—

ডালহৌসী স্কোয়ার চল।

আরাম করে ট্যাক্সির ব্যাক সীটে হেলান দিয়ে—গা ঢেলে প্রসন্নভরা মনে একটা সিগারেট ধরায় তপন।

সুচিত্রা—সুচিত্রা আর সে।

তাদের ছোট্ট একটি বাসা। মনের মত বাসা। পেয়েছেও বাসাটি যদিও একটু দূর হয়ে গেল—সেই টালীগঞ্জে—স্টুডিও ক্যালকাটা মুভিটোন ছাড়িয়ে, তা হোক।

আড়াইখানা দোতলায় ঘর—কিন্তু ঘর দুটো নেহাৎ ছোট নয়—বেশ প্রশস্ত—তাছাড়া খোলা বাতাসও প্রচুর।

অনেক খুঁজে বাড়িটা পাওয়া গিয়েছ।

বাড়িওয়ালা বৃদ্ধ গড়াই মশাই লোকটি ভালই মনে হয়।

নির্ঝঞ্ঝাট—স্বামী স্ত্রী বুড়ো বুড়ি। এক মেয়ে, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। থাকে বোম্বাই না কোথায় যেন, অনেক দূরে।

কালেভদ্রে কদাচিৎ আসে।

ভাড়াও কম—মাত্র পঁয়ষট্টি টাকা।

দু'জনে একসঙ্গে চাকরি করবে। হেসে খেলে আনন্দে চলে যাবে।

ইতিমধ্যেই দু'জনে একটা করে বৌবাজার থেকে ফার্নিচার কিনে ঘর সাজিয়েছে।

সামনের মাসের পয়লা বুধবারে বিয়ে—তারপরই নতুন বাড়িতে গিয়ে দু'জন উঠবে। দু'জনেই বিয়ের পর ছুটি নিচ্ছে পনের দিন করে। পনেরটা দিন তাদের হানিমুন নতুন বাড়িতে।

সুচিত্রা অবিশ্যি হাতে যেন স্বর্গই পেয়েছিল। তপনকে স্বামী পাবে কোনদিন কি সে ভাবতে পেরেছিল?

গরীবের মেয়ে—চাকরি করা ছাড়া অন্য কোন গতি নেই। তার উপরে কালো রোগা এবং মুখভর্তি ব্রণ।

পাশাপাশি দুটো টেবিলে বসে দুজনে অফিসে কাজ করতে আলাপ এবং সেই আলাপই ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত।

প্রায় বেলা বারোটা নাগাদ ফিরে এল তাপস। খেয়ে এসেছিল। বাড়ির খাওয়ার তাগিদ নেই।

ঘরে ঢুকতে যাবে সামনে কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে।

কি রে পেত্নী, তোর আজ কলেজ নেই?

কলেজে আমি যাইনি ছোড়দা—

কেন?

ছোড়দা!

তাপস ততক্ষণে নিজের ঘরে ঢুকেছে—কৃষ্ণাও তার পিছনে পিছনে ঘরে এসে ঢোকে।

কি? ফিরে তাকাল তাপস কৃষ্ণার মুখের দিকে।

শুনেছ সব—

কি—বড়বাবু চলে যাচ্ছেন, বিয়ে করছেন—শুনেছি বৈকি—তা চিরকালই কি আইবুড়ো থাকবেন নাকি, আর এই অভাবের নোংরামিতে মাথা খুঁড়বেন?

ছোড়দা—

আলবৎ না। শুধু বড়বাবু কেন—আমিও চলে যাব।

তুমি?

তা যাব না! চিরদিন এখানে পড়ে থাকব নাকি? তাছাড়া কে বলতে পারে—

ছোড়দা—একটা কথা বলছিলাম,

বল।

আমি পড়া ছেড়ে দেব।

Not a bad idea—মতলবটা মন্দ করিসনি, কিন্তু তারপর—

কি তারপর?

অর্থাৎ তারপর কি সেটাও বলে ফেল—খনা-লীলাবতী দি গ্রেট—

তারপর? তারপর আবার কি?

তা আছে বৈকি তারপরও—হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে যায় তাপসের। চড়া রুক্ষ গলায় বলে ওঠে, পাজী হতভাগা মেয়ে, তবে আমার এতগুলো টাকা নষ্ট করলি কেন—

ছোড়দা—

হয় এখুনি আমার সব টাকা ফিরিয়ে দিবি—না হয় যেমন পড়ছিলি তেমনি পড়বি। পড়া বন্ধ হবে—কেন বন্ধ হবে শুনি—না হয় ড্রাইভারীই করি, তাই বলে বড়বাবু আমাদের ওপর টেক্কা দিয়ে যাবে? কেন ভেবেছে কি সে? আমরা বানের জলে ভেসে এসেছি—বলতে বলতে হঠাৎ তাপসের গলার স্বরটা যেন বুজে আসে।

মুখটা ফেরায় সে।

কৃষ্ণা যেন চমকে ওঠে তাপসের গলার স্বরে।

থতমত খেয়ে যায়। কি বলবে অতঃপর ভেবে পায় না।

তাপস কৃষ্ণার দিকে ফিরে তাকায়—দু'চোখ তখন তার অশ্রুতে চক্‌চক্‌ করছে।

বুঝলি বড়বাবুকে আমরাও দেখিয়ে দেব পেত্নী—we can live—আমরাও বাঁচতে পারি। আর বেঁচেও আমরা থাকব। শোন্‌ লীলাবতী দি গ্রেট,—তোকে আরও মনোযোগ দিয়ে আরও ভাল করে পড়াশুনা করতে হবে। একটার পর একটা পাস করে যাবি—স্কলারশিপ পাবি—মেডেল পাবি, ডক্টরেট্‌ হবি—।

ছোড়দা—

হ্যাঁ—দরজার গায়ে ঝক্‌ঝকে পিতলের প্লেটে তোর নাম লিখে বসিয়ে দেব—ডক্টর কৃষ্ণা সেন, এম. এ. পি. এইচ. ডি. ডি. লিট্‌,—আরও কত কি!

কথাগুলো বলতে বলতে আনন্দ আর আবেগে, উচ্ছ্বাসে আর উত্তেজনায় গলাটা যেন ভারী হয়ে আসে তাপসের।

দু'চোখের দৃষ্টি দিয়ে আনন্দ যেন ঝরে পড়ে।

চেয়ে থাকে কৃষ্ণা ছোড়দার মুখের দিকে। তার দু'চোখের দিকে।

তাপস বলতে থাকে—কিন্তু সেদিন, সেদিন মুখ্যু ড্রাইভার ছোড়দাকে তোর চিনতে পারবি তো।

ছোড়দা—

একটা অস্ফুট আর্ত শব্দ যেন গলা দিয়ে বের হয়ে আসে কৃষ্ণার।

তা নাই বা চিনতে পারলি—আমি তো জানব, তুই আমার বোন—আমার গর্ব।

সহসা ছুটে এসে যেন তাপসের বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কৃষ্ণা।

দু'হাতে তাপসকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে, না, না—ছোড়দা, না—কোন দিন তোমার পেত্নী অমন লেখাপড়া শিখবে না।

আজ বলছিস, কিন্তু সেদিন—

সেই দুর্মতিই যদি হয় আমার, তো সেদিন তুমি আমায় চাবুক মেরে আমার পিঠের ছাল তুলে দিও—

না রে না—আমি কি জানি না, তুই তা হবি না। এমনি তোকে ঠাট্টা করছিলাম।

ঠাট্টা করছিলে?

জলভরা চোখে তাকায় কৃষ্ণা তাপসের দিকে।

হ্যাঁ রে—যা এখন, যা দিকি ভাল করে চোখ মুছে জল দিয়ে আমার জন্য এক কাপ স্ট্রং লিকার দিয়ে চা করে নিয়ে আয়।

কৃষ্ণা চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে চায়ের কাপটা তাপসের হাতে—তুলে দিতে দিতে ডাকে—ছোড়দা—

কি রে?

আমি একটা যদি কথা বলি, রাগ করবে না?

কী?

চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকে তাপস ধীরে ধীরে।

আমি ইচ্ছে করলে একটা দুটো টিউশনী পেতে পারি—

কী!

টিউশনী—

না—

আমার তাতে করে পড়ার কোন ক্ষতি হবে না—

তা হোক—প্রয়োজন নেই। মনোযোগ দিয়ে যেমন পড়াশুনা করছিলি, করে যাবি—

কিন্তু মুখে যাই বলুক তাপস, আজকালকার দিনে ছটি প্রাণীর খরচ চালানো কলকাতা শহরে বাস করে খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

মাসের পনের তারিখ যেতে না যেতেই সেটা বুঝতে পারে তাপস। চিন্তিত হয়ে পড়ে তাপস।

যেমন করে হোক রোজগার বাড়াতেই হবে।

বর্তমানে জুবিলী গ্যারেজে কাজ করছে তাপস গৌরবাবুর ওখানে।

গৌরবাবুর গোটা দুই ট্রাক আছে—কলকাতা থেকে মাল পাটনা, হাজারীবাগ, রাঁচী, আসানসোল, চাঁইবাসা প্রভৃতি জায়গায় পৌঁছে দেয়।

দুজন ড্রাইভার—তাপস আর জার্নাল সিং।

জার্নাল সিং!

ঠাকুর জার্নাল সিং লোকটার বয়স হয়েছে।

জাতিতে রাজপুত।

যোধপুরের ওদিকে বাড়ি।

কিন্তু বয়েস হলে কি হবে এখনও একটা দৈত্যের মতই খাটতে পারে যখন খাটে।

লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির কাছাকাছি।

বেশ শক্ত বলিষ্ঠ গড়ন।

গৌরবাবু যদিও লোকটাকে রেখেছে, খুব পছন্দ করে না—বিশেষ করে দুটি কারণে।

প্রথমতঃ অত্যন্ত র‍্যাশ ড্রাইভ করে লোকটা—দ্বিতীয়তঃ প্রচণ্ড মাতাল এবং রগচটা।

তবে লোকটা বিশ্বাসী।

কখনও একটা পাই-পয়সার তঞ্চকতা করবে না।

আর বড় একটা মিথ্যা কথা বলবে না।

বলবে, আমরা হচ্ছি রাজপুত—গিলহোট বংশের ছেলে—এককালে রাজ্য ছিল—সিংহাসন ছিল—রাজপ্রাসাদ ছিল। কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বুক ফুলিয়ে বেড়িয়েছি। আজ শালা একদম নেংটি ইঁদুরটি হয়ে আছি—শালা ইজ্জত নেই, পরিচয় নেই, মান নেই।

অতীত বংশগৌরব ও ঐতিহ্যটা একটা মস্তবড় দুর্বলতা জার্নাল সিংয়ের।

লোকটা বিশ্বাসী বলেই আজ পর্যন্ত গৌরবাবু ওকে রেখেছে কিন্তু পছন্দ করে বলতে গেলে গৌরবাবু সত্যিকারের তাপসকেই।

তাপসও যে র‍্যাশ ড্রাইভ করে না তা নয়, কিন্তু হুঁশিয়ার—অ্যাকসিডেণ্ট তার হাতে বড় একটা হয় না।

কিন্তু জার্নাল সিংয়ের মত ঠিক অতটা খাটতে পারে না একনাগাড়ে। এবং অত্যন্ত খেয়ালী।

মতলব হল তো একটানা আট-দশদিন কাজ করে গেল, আর মতলব যদি না হল তো দশদিন হয়তো কাজেই বেরুবে না।

কিছু বললে বলবে, আমি শালা কারও নোকর নই—খুশিমত কাজে যাব আসব—পছন্দ হয় রাখ, নচেৎ শালা চললাম—

জার্নাল সিং উল্টোডাঙারই একটা বস্তিতে থাকে দুটো ঘর নিয়ে।

কথাটা জানত তাপস কিন্তু ঠিক জার্নাল সিংয়ের ডেরাটা জানত না।

আগের রাত্রে আসানসোলে একটা ট্রিপ দিয়ে এসেছে, এবং ট্রিপ দিয়ে ফিরেছে প্রায় সেই শেষরাত্রে।

বেলা নটা নাগাদ মার ডাকে ঘুম ভাঙল।

আনন্দময়ীর হাতে চায়ের কাপ।

মাকে দেখেই কথাটা মনে পড়ে গেল তাপসের।

মাত্র গত পরশু দিনই আনন্দময়ী বলেছেন, র‍্যাশান ফুরিয়েছে—না আনলে এ হপ্তায় চলবে না।

সেই কথাটাই ঘুম ভেঙে চায়ের কাপ হাতে মাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে পড়ে গেল তাপসের।

কিন্তু মা চায়ের কাপটা দিয়ে চলে গেলেন।

কোন কথা বললেন না।

আনন্দময়ী কোন কথা না বললেও তাপসের মনে হল, যেন মা বুঝি ইচ্ছা করেই কোন কথা বললেন না। এবং কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপসের চা পানের ইচ্ছাটাও ঝিমিয়ে আসে।

কোনমতে অতঃপর চায়ের কাপটা নিঃশেষ করে উঠে পড়ে।

টাকা যোগাড় কিছু করতেই হবে।

র‍্যাশানের কথা বাদ দিলেও কিছু টাকার একান্ত প্রয়োজন।

গৌরবাবুর কাছে চাইলেও পাওয়ার কিছু আশা নেই।

কেন জানি না, আজকাল আর গৌরবাবু অ্যাডভান্স দিতে চায় না সহজে।

ধার আর কোথাই বা পাওয়া যেতে পারে!

পরিচিত জনেদের কথা ভাবতে শুরু করে তাপস। হঠাৎ মনে পড়ল জার্নাল সিংয়ের কথা।

গোটা ত্রিশেক টাকা হয়তো জার্নাল সিংয়ের কাছে পাওয়া যেতে পারে।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ায় তাপস এবং জামাটা গায়ে দিয়ে বের হয়ে পড়ে।

ঐ সময় জার্নাল সিং উল্টোডাঙার বস্তিতে থাকে এইটুকু জানে তাপস, কিন্তু ঠিক কোথায় থাকে জানে না।

সঠিক ঠিকানাটা গ্যারেজ থেকে জেনে নিতে হবে।

গ্যারেজে গিয়ে কিন্তু তাপস জার্নাল সিংয়ের ডেরায় সঠিক সংবাদটা কারও কাছ থেকেই পেল না—একটা মোটামুটি আন্দাজ পেল কেবল।

এবং এও শুনল গত দিন পনের জার্নাল সিং নাকি কাজে আসে না। গৌরবাবু জার্নাল সিংয়ের উপর তাই বেশ একটু চটে গিয়েছে।

তাপস শুনে কোন উচ্চবাচ্য করে না।

জার্নাল সিংয়ের ডেরার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়।

রাস্তায় এসে নামতেই একটা গাড়ি এসে থামল।

গৌরবাবু হেড মিস্ত্রী দেবেনকে নিয়ে গাড়িটায় ট্রায়েল দিতে বের হয়েছিল।

তাপসকে দেখে তাড়াতাড়ি ডাকে গৌরবাবু, এই যে তাপসবাবু, শুনুন—

তাপস দাঁড়ায়।

জার্নাল সিংয়ের খবর জানেন?

না—

বেটা দিন পনেরোর ওপর ডুব মেরেছে—কাজে আসছে না—যাক গে, আপনাকে আজ রাত্রে একবার বেরুতে হবে যে।

কতদূর যেতে হবে?

গয়া—

কখন বেরুতে হবে?

রাত সোয়া দশটা এগারটা নাগাদ বের হয়ে যাবেন—

টাকাটা আমাকে কিন্তু আগাম দিতে হবে—

আগাম কি আবার? মাল ডেলিভারী দিয়ে আসুন, তারপর দেব মিটিয়ে—

আমার কিছু টাকার বিশেষ দরকার—

টাকার দরকার কার না মশাই, বলুন তো? তাছাড়া ঐ আগাম দেওয়া সিস্টেমটাই আমি তুলে দেব ভাবছি।

হঠাৎ কি হল তাপসের, ফট্ করে বলে বসল, তাহলে অন্য লোক দেখুন—

মানে !

মানে আর কি ! আমি আজ যেতে পারব না, আগাম টাকা না দিলে।

হুঁ, তা কত দিতে হবে ? গৌরবাবু তির্যকদৃষ্টিতে তাকায় তাপসের মুখের দিকে।

গোটা চল্লিশেক—

কি বললেন !

চল্লিশ টাকা !

গয়ার ট্রিপের জন্য চল্লিশ টাকা আগাম ?

আমার টাকার দরকার—

কিন্তু গয়ার জন্য তো আমি পঁচিশ করে দিই—

সে তো গতবারেই আপনাকে বলে দিয়েছি—গয়া চল্লিশ—পাটনা পঞ্চাশ দিতে হবে—

মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ! কি আবোল-তাবোল পাগলের মত বকছেন ?

ওর কমে পারব না—

পারবেন না ?

না—

বেশ—ত্রিশ দেব—

না—পুরো চল্লিশই নেব, আর আগাম দিতে হবে টাকাটা।

আর দুটো টাকা না হয় ধরে দেব।

না—আচ্ছা চলি—

তাপস আর দাঁড়াল না—এগিয়ে গেল।

গৌরবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বলে, শালারা সাপের পাঁচ পা দেখেছ—না মগের মুল্লুক—

তাপসের চলন্ত দেহটার দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গ্যারেজের মধ্যে ঢুকে পড়ে গৌরবাবু ডাকে, কেষ্টা—

সর্বাঙ্গে কালিঝুলি মাখা চোদ্দ-পনের বছরের একটি ছেলে এগিয়ে আসে—কি বোলচেন ?

মিশির কোথায় থাকে জানিস ?

জানি—

যা, ডেকে নিয়ে আয় ছুটে গিয়ে তাকে। বলবি জরুরী কাজ আছে, এখুনি আসতে হবে।

কেষ্টা বের হয়ে গেল।

হেডমিস্ত্রী দেবেন এক পাশে বসে একটা রেঞ্চ নিয়ে একটা পিস্টনে টাইট দিচ্ছিল—সে বলে, মিশিরকে তো পাবেন না গৌরবাবু !

কেন ?

মাসখানেক হল সে তো নিখোঁজ !

নিখোঁজ !

হ্যাঁ—পাকিস্তান বর্ডারে মাল নিয়ে গিয়েছিল। আপনি বরং তাপসবাবুর সঙ্গেই একটা মিটমাট করে নিলে পারতেন—

মিটমাট মানে ঐ চল্লিশ টাকা ?

রতনলাল আগরওয়ালা তো আজকাল ঐ রেটই দিচ্ছে।

কে বললে ?

শুনেছিলাম—জার্নাল সিং বোধ হয় সেইখানেই আজকাল কাজ করছে—

তুমি ঠিক জান দেবেন ?

শুনেছি সেই রকমই।

গৌরবাবু আর কোন কথা বলে না—হিসেবের খাতা আর বিল বইটা নিয়ে টুলটার উপর বসে।

তাপসের জার্নাল সিংয়ের ডেরা খুঁজে বের করতে বেশ একটু সময়ই লাগে।

একেবারে ভিতরের দিকে খান দুই ঘর নিয়ে জার্নাল সিং থাকে।

সৌভাগ্যক্রমে জার্নাল সিং ঘরেই ছিল।

বার দুই ডাক দিতেই সাড়া দেয়—কোন ?

সিংজী, আমি তাপস।

কে ?

তাপস—

সিং বের হয়ে আসে—আরে তাপসবাবু যে—এসো, এসো, কি খবর ? হঠাৎ বাদশাজাদা গরীবের মুসাফিরখানায়—

ঠাট্টা করছ নাকি ?

ঠাট্টা ! কি যে বল—এসো—এসো—

তাপসকে একেবারে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে বসায় জার্নাল সিং।

বস্তির ঘর হলে কি হবে, একেবারে ছিমছাম।

একটি শয্যা, পরিষ্কার একটা সুজনি দিয়ে ঢাকা—এক পাশে খান দুই মোড়া। একটা ট্রাংক।

দেওয়ালে একটি সুন্দরী তরুণীর ফটো—তার উপরে মালা ঝুলছে।

বোস তাপসবাবু—আরে এই চুমকী—

যাই—সাড়া এল ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের।

আসতে হবে না—দু'কাপ চা আর হালুয়া বানা—

তাপস তখনও দাঁড়িয়ে !

জার্নাল বলে, কি হলো তাপসবাবু, বোসো, দাঁড়িয়ে কেন ?

তাপস একটা মোড়ায় বসে।

সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দেয় জার্নাল সিং, নাও, ধরাও।

সিগারেটটা নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে তাপস।

তারপর বলো—কি মনে করে? জার্নাল সিং প্রশ্ন করে।

তুমি কি গৌরবাবুর ওখানে আর কাজ করছ না?

না।

কেন?

ধুস্ শালা—একের নম্বরের ডাকু—সব শালা একা খাবে। আমি আগর-ওয়ালার কোম্পানীতে কাজ করছি —

মাইনে নিয়ে না ডে-বেসিসে?

ডে-বেসিসে, প্রত্যেক দিন পনের করে—

বসে থাকলেও?

হ্যাঁ তবে বসে কি থাকতে দেয় নাকি শালা—প্রত্যেক দিন কাজ করায়। তার অবিশ্যি একটা সুবিধাও আছে।

কি রকম সুবিধা?

হপ্তায় হপ্তায় মাইনা দেয়।

বল কি!

হ্যাঁ—

ঠিক ঐ সময় একটি বাইশ-তেইশ বছরের তরুণী এসে ঘরে ঢুকল।

পরনে একটা ঘাঘরা—গায়ে কাঁচুলি—তার উপরে একটা মলমলের সবুজ রংয়ের ওড়না। দু'হাতে দু'কাপ চা।

তাপসের যেন চোখ পড়ে না।

রূপ তার যেন লকলকে একটা আগুনের শিখা।

॥ ১৩ ॥

চুমকী।

তাপসই নয় কেবল, চুমকীও চেয়েছিল তাপসের মুখের দিকে। এবং কয়েকটা মুহূর্ত তারও বুঝি চোখের পলক পড়ে না।

জার্নাল সিংয়ের ব্যাপারটা নজরে পড়েনি। সে জানলাপথে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে জ্বলন্ত সিগারেটটা ডান হাতের মুষ্টিবদ্ধ দু আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরে থেকে থেকে সোঁ সোঁ করে টানছিল।

ঐ ভাবে দীর্ঘ টান দিয়ে ধূমপান করা জার্নল সিংয়ের একটা অভ্যাস।

বাপুজী—

চুমকীর ডাকে জার্নাল সিং মেয়ের দিকে ফিরে তাকায়, লায়া—দো—

চুমকী নিঃশব্দে দুটো কাপই দু'হাতে বাপের দিকে এগিয়ে দেয়।

জার্নাল সিং একটা কাপ নিজে নেয়, অন্য কাপটা পার্শ্বে উপবিষ্ট তাপসকে

চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে বলে—দো—তাপসবাবুকো দো।

কুণ্ঠিত—যেন একটু বিব্রতও চুমকী, বাপের নির্দেশে অন্য কাপটা তাপসের দিকে এগিয়ে দেয়।

তাপস ততক্ষণে তার চোখের দৃষ্টি ভূমিতে নত করেছে, কোনমতে চায়ের কাপটা নেবার জন্য হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

চায়ের কাপটা নেয়।

কিউ বেটি, হালুয়া বানায়া নেহি? চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করে জার্নাল সিং।

চুমকী বাপের সে প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না।

ঘর থেকে বের হয়ে যায় এবং পরক্ষণেই একটা প্লেটে কিছু ভাজা গরম পাপড় এনে তাদের সামনে নামিয়ে দিয়ে পুনরায় ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

হঠাৎ জার্নাল সিংয়ের মেজাজটা কেমন যেন তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। চুমকী ইতিমধ্যে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল এবং তাকেই উদ্দেশ করে তীক্ষ্ম উচ্চ কণ্ঠে বলে, কিউ রে, হালুয়া বানায়া নেহি?

কোন সাড়া আসে না অন্য প্রান্ত থেকে।

দেখো তাপসবাবু তুমনে—কিত্না বেতমিজ লেড়কী—হালুয়া বানানে বোলা—

তাপস তাতে বাধা দিয়ে বলে, তাতে কি হয়েছে সিংজী—পাঁপড়েই চলে যাবে!

নেহি নেহি—তুম জানতে নেহি—চায়ের কাপটা কোনমতে ঠাস্ করে পাশে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায় জার্নাল সিং—ও শালার জাতই আলাদা তাপসবাবু—মেয়েমানুষ—পিঠে ঘাকতক পড়লে তবে ঠিক থাকে, দেখ না তুমি, ওর আজ আমি পিঠের ছাল যদি না তুলে—

আঃ সিংজী, কি হচ্ছে ছেলেমানুষী?

নেহি—

বস বস—বিব্রত তাপস জার্নাল সিংকে বাধা দেবার চেষ্টা করে।

নেহি—তুম্ জানতে নেহি তাপসবাবু।

দুমদাম করে জার্নাল সিং ঘরের বাইরে চলে যায়—তার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা যায় পাশের ঘর থেকে—বল্ হারামজাদী, তোকে হালুয়া বানাতে বললাম—তুই পাঁপড় দিয়ে এলি কেন?

ঘি সুজি কিছুই তো নেহি, কি দিয়ে হালুয়া বানাব—চুমকীর কণ্ঠস্বর।

ঘি নেহি সুজি নেহি—বলিসনি কেন হারামজাদী—

কতবার তো বলেছি—কালও তো যখন বসে মদ খাচ্ছিলে বলেছিলাম—

তবে রে হারামজাদী, আবার মুখে মুখে তর্ক—

প্রহারের শব্দ পাওয়া যায়—তাপস কি করবে বুঝতে না পেরে চিৎকার করে ডাকে—সিংজী—সিংজী—

কিন্তু সিংজীর কোন সাড়া পাওয়া যায় না—সে তখন উদ্দাম প্রহার করে চলেছে

তার মেয়ে চমকীকে বোধহয় এবং কতক্ষণ যে ঐ প্রহার চলত কে জানে, যদি না ঐ সময় বিষ্টু পাকড়াশী এসে ঘরে ঢুকত এবং চিৎকার করে ডাকত—সিংজী—এই সিংজী—

লোকটার ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় জার্নালি সিং বের হয়ে আসে এবং ঘরের মধ্যে আগন্তুককে দেখে বলে ওঠে—আরে বিষ্টুবাবু যে—আসেন আসেন—কি খবর? অনেক দিন পরে পদার্পণ হল—

সিংজীর যেন সে এক অন্য মূর্তি। মুহূর্ত-পূর্বের সেই পশুর মত আক্রোশের চিহ্নমাত্র যেন কোথায়ও নেই।

তাপসও যেন মুহূর্ত-পূর্বের সমস্ত কিছু ভুলে ওর দিকে তাকায়।

লোকটার নাম বিষ্টুবাবু। এবং রতন আগরওয়ালার লোক বলেই ও জানে।

যেমন মোটা তেমনি বেঁটে আকৃতি। কালো কুচকুচে গাত্রবর্ণ।

চৌকো প্যাটার্ণের মুখ। পরনে দামী ট্রপিক্যাল স্যুট মভ কলারের।

হাতে একটা মার্কোভিচ্ সিগারেটের টিন। হাতের মধ্যেও ধরা ছিল একটা জ্বলন্ত সিগারেট।

বসেন—বসেন—শয্যার একাংশ টেনে টেনে দুরস্ত করে দেয় জার্নালি সিং।

আগন্তুক বিষ্টুবাবু খাটের উপর বসতে বসতে বলে—একদম ফুরসুৎ নেই—কাজের যা চাপ! কি করি বল—তারপরই চোখের ইঙ্গিতে তাপসকে দেখিয়ে সুধায়—কে?

বিষ্টুবাবু, যার কথা আপনাকে আমি বলেছিলাম—আমার ফ্রেণ্ড—দোস্ত. তাপসবাবু—ফার্স্ট ক্লাস ড্রাইভিং করে—

তাই বুঝি!

হ্যাঁ। তাপসবাবু, ইনি হচ্ছেন মিঃ পাকড়াশী—বিষ্টু পাকড়াশী—মিঃ আগর-ওয়ালার অজন্তা হোটেলের ম্যানেজার—

অজন্তা হোটেল মানে শহরের—চৌরঙ্গী পাড়ার অন্যতম বিখ্যাত হোটেল।

রাতের বেলা বহুদূর থেকে যার জ্বলজ্বল নিওন সাইনটা দেখা যায়।

জ্বলে আর নেভে : অজন্তা হোটেল।

কতদিন গাড়ি নিয়ে রাতের বেলা যেতে যেতে চৌরঙ্গী পাড়া দিয়ে চোখে পড়েছে অজন্তা হোটেলের প্রবেশ দ্বারের সামনে ঝক্ঝকে উর্দী-পরা বেয়ারা ও দারোয়ানের দলকে।

বড় বড় গাড়ি—ট্যাক্সি—আসছে যাচ্ছে—

সেই অজন্তা হোটেলের ম্যানেজার বিষ্টু পাকড়াশী।

বিষ্টু পাকড়াশীকে মনে হয় যেন কেমন ইতস্ততঃ করছে।

কিছু যেন ও বলতে এসেছিল কিন্তু বলতে পারছে না বোধ করি তাপস ঘরের মধ্যে আছে বলেই।

তাপস ব্যাপারটা বোধ করি বুঝতে পারে এবং বুঝতে পেরেই উঠে দাঁড়ায়—

তাহলে আজ আমি চলি সিংজী—

যাবে—আচ্ছা এস তাহলে—

তাপসও উঠে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু বাধা দেয় বিষ্টু পাকড়াশী, একটু দাঁড়ান—হ্যাঁ হে সিংজী, বলছিলে না তোমার দোস্ত ভাল ড্রাইভিং জানে?

হ্যাঁ—ফার্স্ট ক্লাস ড্রাইভিং করে—

তাহলে আমাদের হোটেলে—

সে তো খুব ভাল কথা। কি বল তাপসবাবু, কাজ করবে?

সঙ্গে সঙ্গে তাপস জবাব দেয়—প্রাইভেট গাড়ি আমি চালাই না—

আরে না না—সে রকম কিছু নয়—বিষ্টু পাকড়াশীই ঐ সময় বলে ওঠে—হোটেলের নিজস্ব দুটো গাড়ি, একটা বুইক আর একটা স্টেশন ওয়াগন আছে—বড় বড় সব রহিস আদমী—ফিল্ম প্রোডাকসন ও ডিস্ট্রীবিউসন লাইনে আসা-যাওয়া করে বোম্বাই মাদ্রাজ থেকে কলকাতা শহরে তাঁদের কাজের জন্য ডে-বেসিসে ঐ গাড়ি হোটেল থেকে ভাড়া দেওয়া হয়—হোটেলের গাড়ি ওঁদের বলা হয় না—বলা হয় ভাড়া গাড়ি—তোমারই জিম্মায় থাকবে—প্রয়োজন মত সেটাকে—

হঠাৎ কি মনে হয় তাপসের, কি যেন ভাবে, তারপর বলে—টাকা-পয়সার ব্যাপারটা কি রকম?

দুরকম সিস্টেম চলতে পারে—বিষ্টু পাকড়াশী বলে।

কি রকম?

এক—তুমি ইচ্ছে করলে ডে-বেসিসও টাকা নিতে পার অথবা মাস মাস মাইনে চাও তাও পাবে। তবে একটা কথা—

কি?

যত দিন ওখানে থাকবে অন্য কোথাও কাজ করতে পারবে না। বুঝতে পারছ—exclusive.

হুঁ—তা ডে-বেসিসেই বা কত—আর মাস-মাইনে হলেই বা কত?

তুমিই বল।

ডে-বেসিসে আমি কুড়ি টাকা করে চাই—

আর মাস-মাইনের হলে কত চাও?

মাস-মাইনেয় কাজ করব না।

কুড়ি নয়—পনের পাবে।

না—তাপস ঘুরে দাঁড়ায়—চলি—

কিন্তু তাপসের যাওয়া হল না। তার আগেই সিংজী ও বিষ্টু পাকড়াশীর মধ্যে পরস্পরের চোখের ইঙ্গিতে যেন কি কথা হয়ে যায়।

বিষ্টু পাকড়াশী তাড়াতাড়ি বলে—ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা কর তাপসবাবু—সিংজীর সঙ্গে একটু কথা বলে নিই আমি। চল সিংজী—

বিষ্টু পাকড়াশী ও সিংজী ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

তাপস চেয়ারটার উপর বসে পড়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে—

একটা সিগারেট নিয়ে অগ্নিসংযোগ করে।

অজন্তা হোটেলে চাকরি!

অজন্তা হোটেলের মত নামকরা এক হোটেলের ম্যানেজার বিষ্টু পাকড়াশী—সিংজীর মত একজন লোকের ঘরে!

একটা অসম্ভব টাকার অংক যা মনে এল বলে বসল তাপস কিন্তু তবু লোকটা তাকে বসতে বলে গেল।

শুনছেন?

কে?

চমকে সামনের দিকে ফিরে তাকায় তাপস।

সামনে দাঁড়িয়ে জার্নাল সিংয়ের মেয়ে চুমকী।

চোখের কোলে তখনও জলের দাগ শুকিয়ে যায়নি—

যান এখান থেকে—শীগ্‌গির চলে যান—ঐ পাকড়াশী একটা সাংঘাতিক লোক—একটা শয়তান, হোটেলের চাকরি কখনো নেবেনা না—

তাপস যেন কেমন থতমত খেয়ে যায়। কি বলবে জবাবে বুঝে উঠতে পারে না।

এখনো বসে আছেন—যান—

কিন্তু কেন—কেন এ কথা বলেছেন আপনি?

বললাম তো—একটা শয়তান। সাংঘাতিক লোক—ওকে জানেন না আপনি—বাপুজীকে ঐ শয়তানটা গ্রাস করেছে নচেৎ বাপুজী এরকম ছিল না—

আরও হয়ত চুমকী কিছু বলত—বলবার ইচ্ছা ছিল তার কিন্তু বলা হল না—পাকড়াশী আর তার বাবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল বাইরে।

চকিতে চুমকী ঘর থেকে চলে যায়। অদৃশ্য হয়ে যায় অন্দরে।

কথা বলতে বলতে বিষ্টু পাকড়াশী ও সিংজী এসে ঘরের মধ্যে ঢোকে।

ঘরে ঢুকে বিষ্টু পাকড়াশী বলে—তাই হবে তাপসবাবু সিংজীর মুখে আগেও তোমার কথা আমি শুনেছি—ও তোমাকে খুব highly recommend করেছে—তোমাকে কুড়িই দেব।

কি ভাবে ডিউটি দিতে হবে আমাকে?

সপ্তাহে দুদিন পুরো ছুটি পাবে আর ডিউটি বিকেল চারটে থেকে রাত সাড়ে বারটা পর্যন্ত—রাজী?

ভেবে দেখি, তাপস বলে।

আরে তাপসবাবু, ভেবে দেখার কি? রাজী হয়ে যাও। কি শালা ও গৌরবাবুর গ্যারেজে চাকরি কর—ইজ্জৎও যায়, পেটও ভরে না! আর এখানে বিষ্টুবাবুর কাছে দুই-ই পাবে। এই দেখ না—দেখে আমার ঘরদোর বুঝতে পারছ না, সামান্য গৌরবাবুর ওখানে 'ট্রাক ড্রাইভ করে এসব হয়? রতনলাল আগরওয়ালার অনেক ব্যবসা, গ্যারেজ আর হোটেলই নয়—অনেক কিছু আছে ওদের, ওখানে তাই কাজ

করেই না—

আঃ, তুমি থাম তো সিংজী—থামিয়ে দেয় বিষ্টু পাকড়াশী জার্নাল সিংকে এবং তাপসের দিকে ফিরে বলে—কি রাজী আছ তো বল তাপসবাবু—অবিশ্যি তুমি ভাবতে চাও ভাব—তবে একটা কথা। বুঝতেই পারছো কুড়ি টাকা মানে মাসে ৬০০ টাকা একজন অফিসারের মাইনে। টাকা দোব তোমার আমি কিন্তু থাকতে হবে অন্ধ আর বোবা—সাফ্ সাফ্ কথা আমার কাছে কোন লুকোছাপা নেই, রাজী থাকলে তুমি জার্নাল সিংকে বলে দিও, ও সব খবর দেবে আমাকে।

আমি রাজী মিঃ পাকড়াশী—হঠাৎ বলে ফেলে কথাটা তাপস।

রাজী ?

হ্যাঁ।

গুড্, এই নাও একশো টাকা আমি অ্যাডভান্স দিচ্ছি—বলতে বলতে পকেট থেকে করকরে একশো টাকার একটা নোট বের করে এগিয়ে দেয় সামনের দিকে বিষ্টু পাকড়াশী।

মুহূর্তের জন্য দ্বিধা বুঝি হয়েছিল তাপসের কিন্তু করকরে ঝক্‌ঝকে বলতে গেলে একেবারে নতুন একশো টাকার নোটটা—তাপস সমস্ত দ্বিধা ও সংকোচ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে হাত বাড়িয়ে নোটটা নেয়।

কাগজ দিন একটা, সই করে দিই, তাপস বলে।

সই। কিসের সই ? না না, সইফইয়ের কারবার আমার নেই তাপসবাবু—আইন-আদালতের আমি কোনদিন ধার ধারি না, আমার আদালত আমার আইন আমারই হাতে—বুঝলেন, হাতের মুঠোটা প্রসারিত করে ধরে বিষ্টু পাকড়াশী তাপসের সামনে—আমার এই হাতের মুঠোর মধ্যেই—

তাপস দেখে বেঁটে মোটা আঙুলগুলো হাতের—বড় বড় লোম তাতে।

মুঠোটা হাতের ছোট কিন্তু মনে হয় লোহার মত শক্ত একবার ঐ মুঠো বন্ধ হলে আর সহজে খোলে না।

আচ্ছা চলি তাপসবাবু, চলি হে সিংজী—

বিষ্টু পাকড়াশী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

তাপস জার্নাল সিংয়ের মুখের দিকে তাকাল, সমস্ত মুখে হাসি আর খুশি যেন উপচে পড়ছে। ঝলমল করছে মুখটা তৃপ্তিতে।

আমি তাপস বলে, আমি তোমার কাছে আমার একটা চাকরির জন্যই এসেছিলাম সিংজী।

সত্যি !

হ্যাঁ। গৌরবাবুর ওখানে আর চাকরি করব না।

দূর দূর, শালা একের নম্বরের চশমখোর—উদয় অস্ত খাটাবে আর পয়সা দেবার বেলা হাতটা মুঠো করে থাকবে—আমি, বুঝলে তাপসবাবু, আমি তোমার কথা বিষ্টুবাবুকে বলেছিলাম—একজন বিশ্বাসী ড্রাইভার ও খুঁজছিল, কোরেশী কাজ ছেড়ে

হঠাৎ মাস চারেক আগে পাকিস্তানে চলে যাবার পর থেকেই। যাও, এবারে কাজে লেগে যাও, টাকার আর কোন ভাবনা থাকবে না। কেবল ঐ যে বলে গেল না বিষ্টুবাবু, অন্ধ আর বোবা হয়ে থাকতে হবে—হে হে—বুঝেছ তো, দেখবে অথচ দেখছ না, চোখে তোমার কিছুই পড়ছে না। শুনছ অথচ শুনছ না—কানে তোমার কিছুই ঢুকছে না—

তাপস শোনে জার্নাল সিংয়ের কথাগুলো—কোন জবাবই দেয় না।

হঠাৎ বাইরে ঐ সময় চুনীর গলা শোনা যায়, মাস্টার আছ নাকি—

কে, চুনী—

হ্যাঁ—

চুনী এসে ঘরে ঢোকে।

কি ব্যাপার চুনী ?

গৌরবাবুর গ্যারেজে গিয়ে দেবেন মিস্ত্রীর কাছে শুনলাম তুমি এদিকে এসেছ।

কিছু দরকার আছে ?

হ্যাঁ, বিশেষ দরকার ছিল—

চল—চলি সিংজী।

চুনীকে সঙ্গে নিয়ে তাপস জার্নাল সিংয়ের বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ে।

মনের মধ্যে তখন তার দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের যেন এক সমুদ্রমন্থন চলেছে।

অনেকগুলো টাকার দরকার—আর সেই একান্ত টাকার দরকারের জন্যই সে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল—করকরে একশো টাকার নোটটা যে এমনি করে পকেটে এসে যাবে ক্ষণপূর্বেও কি সে চিন্তামাত্রও করতে পেরেছে ?

শুধু টাকা নয়—মোটা টাকা—মাস মাইনের চাকরি।

চাই কি এবারে ইচ্ছে করলে ঐ টাকা থেকে কিছু কিছু করে মাস মাস বাঁচিয়ে বছরখানেকের মধ্যে হায়ার পারচেজে সে একটা নিজস্ব ট্যাক্সিও করতে পারবে।

নিজের ট্যাক্সি।

কিন্তু—চুমকী যেন কি বলে গেল !

ও—ঐ বিষ্টু লোকটা একটা শয়তান সাংঘাতিক লোক। ওকে জানেন না আপনি, বাবুজীকে ও গ্রাস করেছে।

বাপুজীকে গ্রাস করেছে—ঐ জার্নাল সিংকে গ্রাস করেছে !

চুমকীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা মনের পাতায় ভেসে ওঠে তাপসের—তার সুঠাম দেহবল্লরী—

যৌবন ঢলঢল দেহসুষমা—

সুরমা-টানা দু চোখের কোলে অশ্রুচিহ্ন।

মাস্টার—

চমকে ওঠে তাপস—কিছু বলছিলী চুনী ?

মাগী সর্বনাশ করে বসেছে—

কি—কে সর্বনাশ করেছে ?

কে আবার—গ্রহের শনি—সেই মাগী—

বুঝতে পারে তাপস—চুনী কার কথা বলছে। বলে—আশা বৌদি কি করেছে—তার—

বিষ খেয়েছে—

বিষ! সে কি! আশা বৌদি বিষ খেয়েছে—

হ্যাঁ—কাল রাত্রে কাজ থেকে ফিরে দেখি বিষ খেয়েছে—হারামজাদী মরবেও না—আমাকেও—

চুনী—গর্জন করে ওঠে তাপস।

কেন—কেন তবে এমন করে আমাকে ও জ্বালাচ্ছে বলতে পার ? কান্নায় ভেঙে পড়ে চুনী—পারছি না—সত্যিই আর আমি পারছি না মাস্টার—

॥ ১৪ ॥

চুনী যেন হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই থমকে দাঁড়িয়েছিল তাপস—কান্নার শব্দে ও চুনীর মুখের দিকে তাকায়।

এক হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে চুনী তখন নিজেকে বোধ হয় সামলাবার চেষ্টা করছে।

কোথায় আছে এখন সে ? তাপস শুধায়।

কে ?

আশা বৌদি—

কোথায় আবার থাকবে, বাড়িতেই ঘরের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে—

Idiot—তা ডাক্তারকে একবার খবর দিসনি ?

হ্যাঁ—ডাক্তারকে ডাকি তারপর হাতে দড়ি পড়ুক আর কি—তাছাড়া ডাক্তার ডাকব—পয়সা কোথায় ? শালা গৌরবাবু এক হপ্তা ধরে একটা পয়সা ছোঁয়াচ্ছে না, কেবল আজ নয় কাল করছে—

তা তোর ঘরে মরলেও তো হাতে দড়িই পড়বে! ডাক্তার না ডাকতে পারিস হাসপাতালেও তো একটা খবর দিতে পারতিস—

কথা বলতে বলতে দুজনে ইতিমধ্যে বড় রাস্তার উপর এসে পড়েছিল।

বেলা তখন অনেকখানি গড়িয়ে গিয়েছে।

চনচনে রোদে যেন আকাশটা ঝলসে যাচ্ছে।

তাপস হঠাৎ বড় রাস্তার উপর দাঁড়ায়—একটা বিড়ি ধরায়।

কয়েকটা মুহূর্ত যেন মনে মনে কি ভাবে, তারপর চুনীর দিকে ফিরে বলে, চ—

সার্কুলার রোডে অমূল্য ডাক্তার আছে কিনা তার ডিস্‌পেনসারিতে একবার দেখি—

সর্বাগ্রে একজন ডাক্তারেরই প্রয়োজন এবং ডাক্তারের কথা ভাবতে গিয়ে তাপসের সর্বাগ্রে ঐ অমূল্য ডাক্তারের কথাই মনে পড়ে।

অমূল্য ডাক্তার একদা স্কুলে তাপসের সহপাঠী ছিল—তারপর পাস করে আজ সে ডাক্তার হয়ে ডিসপেনসারী দিয়ে বসেছে।

এখনও মধ্যে মধ্যে দেখা হলে কথা বলে, আলাপ করে তাপসের সঙ্গে।

তাপস লেখাপড়া করল না—ট্রাক চালায় বলে কোনরকম অচ্ছেদ্দা অবহেলা করে না।

তাপস অবিশ্যি জানত না অমূল্য গুপ্ত ডাক্তারী পাস করে সার্কুলার রোডে ময়দার কলটার উল্টো দিকে ডিসপেনসারী দিয়ে বসেছে।

বছর খানেক আগে একদিন রাত তখন প্রায় দশটা হবে, ট্রাক নিয়ে গ্যারেজ থেকে বেরুতে গিয়ে বেকায়দায় গ্যারেজের দেওয়ালে ট্রাকটা ধাক্কা খায় এবং ওর বাঁ হাতে চোট লাগে।

চোটটা বেশ ভালই লেগেছিল।

যন্ত্রণায় হাতটা তখন যেন ছিঁড়ে পড়বার যোগাড়।

দেবেন মিস্ত্রীই তখন ওকে অমূল্য ডাক্তারের 'দি মডার্ণ ফার্মেসী'তে নিয়ে গিয়েছিল।

দেবেন বলেছিল, ডাক্তারের সঙ্গে তার আলাপ আছে—লোকটা ভাল। একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড অস্টিন টেন আছে সেকেলে মডেলের, দেবেনের কাছে আসত গাড়ির টুকটাক ব্যাপারে।

হাতটা তখন ঝন্‌ঝন্‌ করছে তাই তাপস আর আপত্তি করেনি। বলেছিল—চল্‌—

ডিসপেনসারীতে গিয়ে যখন ওরা হাজির হয় বুড়ো কম্পাউণ্ডার মনমোহনবাবু সামনের কাউণ্টারে বসে ঝিমুচ্ছেন।

ওদিকে—পার্টিশনের ওদিকে ছিল অমূল্য ডাক্তার।

ডাক্তার লোকটা আবার সাহিত্যিক।

মেডিকেল কলেজ থেকেই তার লেখা গল্প-উপন্যাসের বই ছেপে বের হয়।

পার্টিশনের মধ্যে বসে একটা নাটক লিখছিল তখন ডাক্তার—

দেবেন ডিসপেনসারীতে ঢুকে শুধায়—ডাক্তারবাবু আছেন।

মনোমোহনবাবু জবাব দেন, আছেন,—কেন কি দরকার?

এর হাতটা একটু দেখতে হবে, চোট লেগেছে—

মনমোহনবাবু বলেন—যান না—ভেতরে যান—ডাক্তারবাবু ভেতরে আছেন।

দেবেন তখন সোজা তাপসকে নিয়ে ডাক্তার যেখানে পার্টিশনের মধ্যে বসেছিল সেখানে গিয়ে ঢোকে, ডাক্তারবাবু—

কে? দেবেন? ডাক্তার মুখ তুলে তাকালেন, কি খবর?

এর হাতটা একটু পরীক্ষা করে দেখুন না ডাক্তারবাবু—

লিখছিল অমূল্য ডাক্তার কাগজপত্র টেবিলের ওপরে ছড়িয়ে, কলমটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে—কোথায় লেগেছে দেখি—

অমূল্য ডাক্তার যখন তাপসকে পরীক্ষা করছে তখনই লোকটার মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়েছিল তাপসের লোকটার মুখটা যেন চেনা-চেনা লাগছে।

ডাক্তার পরীক্ষা করে আর তাপস চেয়ে চেয়ে দেখে।

না—বিশেষ কিছু নয়—মনে হচ্ছে স্প্রেণ—একটা ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছি—আর একটা খাবার পিল দিচ্ছি—কাল এসে একবার দেখিয়ে যাবে—

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা প্রায় যখন শেষ হয়েছে তাপস তখন চিনতে পেরেছে অমূল্য ডাক্তারকে।

বছর খানেক একবার তাপসরা তার এক মামার ওখানে কালীঘাটে ছিল বাবা বাইরে বদলি হওয়ায়—সেই সময় কালীঘাট স্কুলে ঐ ছেলেটির সঙ্গে বছর খানেক পড়েছিল—চমৎকার গান গাইতে পারত—আর একটা খাতায় কবিতা গল্প কি সব লিখত।

আচ্ছা ডাক্তারবাবু! হঠাৎ তাপসই প্রশ্ন করে।

কিছু বলছেন? অমূল্য ডাক্তার মুখ তুলে তাকায় ব্যাণ্ডেজটায় শেষ 'নট' দিতে দিতে।

হ্যাঁ—আপনি কখনও কালীঘাট হাইস্কুলে পড়েছিলেন?

হুঁ—কেন বলুন তো?

আপনি সে সময় গান গাইতেন, গল্প কবিতা লিখতেন—তাপস বলে।

হ্যাঁ—কিন্তু আপনি—

থার্ড ক্লাসে সেবারে ফেল করেছিলাম।

আপনি—

আপনার বাবা রংপুরে ঐ সময় বদলি হয়ে যান, আপনারা চলে যান—দুই ভাই ছিলেন আপনারা—

হ্যাঁ—আপনি এসব জানলেন কি করে? আপনি কি আমাকে—

আমি চিনতে পেরেছি কিন্তু আপনি আমাকে চিনতে পারেননি। অবিশ্যি আপনি আমাকে চিনবেনই বা কি করে? গাড্ডু মারা ছেলে—এখন ড্রাইভারী করি আর আপনি একজন যাকে বলে পাস-করা ডাক্তার—তাছাড়া বড় একজন নাম-করা লিখিয়ে। বুঝতে পারছি আপনি সেই লেখক অমূল্য গুপ্ত—ঠিক ধরেছি কিনা বলুন।

হ্যাঁ—কিন্তু—

তাপস বলে, মনে পড়ে না আপনার—বল্টু বলে একজন ছিল—লাস্ট বেঞ্চে বসত—ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন ছিল—একবার তো আপনারই নাকের ডগায় ঘুঁষি মেরে সুপুরী বানিয়ে দিয়েছিল—

অমূল্য গুপ্ত সহসা চিৎকার করে ওঠে, আরে আপনি সেই বল্টু মাস্টার—

অমূল্য গুপ্তর চোখের মণি দুটো তখন স্মৃতির আলোয় ঝলমল করছে—একটা খুশির ঢেউ সারা মুখে!

হ্যাঁ—তাপস বলে, আমিই সেই বল্টু মাস্টার। লরী ড্রাইভার—

কি আশ্চর্য—সত্যিই কি যে আনন্দ লাগছে—উঃ কত কালের কথা। তারপর আছেন কোথায়?

আছেন নয় স্যার—আছ কোথায়। তাপস সংশোধন করে দেয়।

সে রাত্রে কোন ফিস্ বা ওষুধের দাম পর্যন্ত অমূল্য ডাক্তার নেয়নি।

বরং বলে দিয়েছিল অমূল্য ডাক্তার যখন প্রয়োজন হবে তাপস যেন নিঃসংকোচে তার কাছে আসে, কিন্তু তা পারেনি তাপস।

কোথায় যেন কি একটা সংকোচ তার পা দুটো টেনে ধরেছে।

কোথায় সে অশিক্ষিত একজন ট্রাক ড্রাইভার আর কোথায় পাস-করা ডাক্তারই নয় শুধু—একজন সাহিত্যিক—অমূল্য গুপ্ত।

তাপস আর যায়নি।

কিন্তু আজ চুনীকে নিয়ে সেই অমূল্যর ডিসপেনসারীতেই গিয়ে উঠল।

অমূল্য ডাক্তার ডিসপেনসারীতেই ছিল।

ওকে দেখে বলে, আরে বল্টু মাস্টার যে, কি খবর? সেই যে হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে গেলে তারপর আর দর্শন নেই—

ডাক্তার—

বল।

একটা উপকার করতে হবে ভাই—

বল না কি?

এই কাছেই আমার সঙ্গে একবার যেতে হবে। একটি মেয়ে বিষ খেয়েছে—

বল কি! কখন?

তা ঠিক জানি না—তবে শুনলাম এখন অজ্ঞান—

হুঁ—চল দেখি—তা কি বিষ খেয়েছে?

তা তো জানি না—

ডাক্তার ব্যাগটা নিয়ে তার গাড়িতে করেই ওদের সঙ্গে চুনীদের গলির মাথায় গিয়ে গাড়ি থেকে নামল।

বাকী পথটুকু গাড়ি যাবে না, হেঁটে যেতে হবে। বাড়ির সদর দরজাটা ভেজানো ছিল।

সামনের ডানদিককার চিলতে বারান্দাটায় প্রৌঢ় সতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বসেছিলেন—ইদানীং দু চোখে ছানি পড়ায় কিছুই দেখতে পান না।

বসে বসে আপন মনে বিড়বিড় করে কি যেন বকছিলেন আর হাঁপাচ্ছিলেন—কয়েক দিন থেকে আবার টানটা বেড়েছে।

পদশব্দে বলে ওঠেন—সাবিত্রী—কে এলো দেখ—

সাবিত্রীর সাড়া পাওয়া গেল না।

চুনী অমূল্য ডাক্তার আর তাপসকে নিয়ে আশার ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

মেঝেতে একটা পাটির উপর অজ্ঞান দেহটা পড়ে আছে আশার।

পাশে বসে সাবিত্রী।

পাথরের মত বসে আছে যেন প্রৌঢ়া সাবিত্রী—চুনীর মা।

খোলা জানালাপথে যে আলো এসেছে তাতেই চোখে পড়ে।

মাথায় ঘোমটা নেই।

মাথায় জল ঢালার জন্য চুলগুলো জল ও কর্দমসিক্ত, লোটাচ্ছে।

অমূল্য ডাক্তার সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ডান হাতটা আশার তুলে নিল নাড়ি দেখবার জন্য।

সমস্ত মুখটা নীল।

চোখ দুটো বোজা।

গায়ের ও বুকের কাপড় এলোমেলো।

নাড়ির গতি অতিমাত্রায় ক্ষীণ।

বিষই খেয়েছেন—কিন্তু—

অমূল্য ডাক্তারের কথা শেষ হল না—একটা মালিশের ওষুধের খালি শিশি এগিয়ে দিল চুনী।

বলল, এই দেখুন—মার বাতের ব্যথা আছে—এই মালিশের তেলটা মা ব্যবহার করেন—এই শিশিটা ওর বিছানায় ছিল।

কিন্তু এখানে তো হবে না—এখুনি হাসপাতালে ইমারজেন্সিতে রিমুভ করা দরকার—স্টমাক পাম্প দেওয়া দরকার। তাছাড়া পয়েজনিং কেস। আরও অনেক হুজ্জত আছে—

চুনী কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, এখানে বাড়িতে হয় না ডাক্তারবাবু?

না—

অমূল্য ডাক্তারই সব ব্যবস্থা করে আধ ঘণ্টার মধ্যে আশাকে বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল।

দুটো দিন তারপর যমে-মানুষে টানাটানি।

তৃতীয় দিন দুপুরের দিকে চোখ মেলল আশা।

মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এল আশা।

হাসপাতালের ওষুধ ছাড়াও অনেক ওষুধ বাইরে থেকে কিনে দিতে হল—তাপসই সব দিল এবং ভাগ্যে বিল্টু পাকড়াশীর দেওয়া টাকাটার মধ্যে গোটা চল্লিশেক টাকা ছিল মাকে দিয়েও—তাপস ম্যানেজ করে নিল।

হাসপাতালের ডাক্তাররা করেছিল বটে তবে অমূল্য ডাক্তারও কম করে নি। অনেক

ওষুধ সেও তার ডিসপেনসারী থেকে দিয়েছিল বিনি পয়সায়।

বিকেলবেলা খবর নিতে এসে সংবাদটা চুনী পেল।

ইমারজেন্সীরই একটা বেডে তখনও শুইয়ে রাখা হয়েছিল আশাকে।

ডাক্তার বললেন—বেশী কথা বলবেন না, রোগিনী এখনও খুব দুর্বল—

চুনী পায়ে পায়ে এসে আশার বেডের পাশে দাঁড়াল।

দু'দিনেই আশার চেহারার কি পরিবর্তনই না হয়েছে! মুখটা ভেঙে চুপসে গিয়েছে একেবারে।

চোখ দুটো বসে গিয়েছে, নাকটা ঠেলে উঠেছে।

শীর্ণ বিবর্ণ দুটো ওষ্ঠ।

শয্যার উপরে একেবারে নেতিয়ে পড়েছিল আশা। দুটি চক্ষু মুদ্রিত।

ধীরে অতি ধীরে আলগোছে হাতটা রাখে চুনী আশার শীর্ণ কপালের উপরে, আশা চোখ মেলে তাকায়।

দুজন চোখাচোখি হয়।

চেয়ে থাকে কয়েকটা মুহূর্ত দুজনের দিকে—দু-জোড়া চোখই অশ্রুতে ছলছল করছে!

শীর্ণ হাতটা দিয়ে আশা চুনীর হাতটা ধরে।

কেমন আছ? চুনী যেন ফিস্‌ফিস করে শুধায়।

কোন কথা বলে না, শুধু ঘাড় নাড়ে আশা।

ভাল—

বিষ খেয়েছিলে কেন—আমাকে জব্দ করতে, তাই না?

আশা কোন জবাব দেয় না।

তার মুদ্রিত দু চোখের কোণ বেয়ে কেবল দু ফোঁটা অশ্রু গাড়িয়ে পড়ে। আশা ক্ষীণ মুঠির মধ্যে ধরা চুনীর হাতটা আর একটু চেপে ধরে।

চুনী বলে—ঠিকআছে—আর তোমার কোন কথাতেই আমি নেই—যে ভাবে তুমি থাকতে চাও থেকো—

আশার চোখে জল, মুখে ম্লান হাসি। হাতটা চুনীর তখনও ধরা, বলে—ঠিক তো?

ঠিক।

তবে একটা কথা দাও—

অস্ফুট একটা আর্তনাদ সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে আসে চুনীর কণ্ঠ চিরে, আশা—

না—কোন কথা নয়—বল এবারে একটা বিয়ে করবে?

চুনী চুপ।

চুপ করে থাকলে হবে না, জবাব দিতে হবে, বল? বলতেই হবে—

বেশ তাই করব—মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় চুনী।

আশা চোখ বোজে—তার বোজা চোখের কোণ বেয়ে দু ফোঁটা অশ্রু আবার

গড়িয়ে পড়ে।

অমূল্য ডাক্তার ঐ সময় এসে ঘরে ঢোকে।

বাঃ, এই যে জ্ঞান হয়েছে—এগিয়ে আসে অমূল্য ডাক্তার, হাতটা তুলে আশার পালসটা পরীক্ষা করতে করতে বলে—পাগলামি করেছিলেন কেন বলুন তো? এমন সুন্দর পৃথিবী, চলে যেতে ইচ্ছা করে নাকি কারও! আমার তো মনে হয় অনন্তকাল ধরে যদি বয়েসটা যেখানে আছে সেখানেই থাকত—এই পৃথিবীতে থাকতে পারতাম!

আশা মৃদু হাসে।

হাসছেন! কিন্তু সত্যি আমি তাই ভাবি—

হাসপাতালের ডাক্তার ঐ সময় এল—আর না—এবার উঠতে হবে—কথাটা সে চুনীর দিকে তাকিয়ে বলে।

চুনী উঠে দাঁড়িয়ে বলে—কবে ওকে নিয়ে যেতে পারব?

দিন কয়েক বাদে নিয়ে যেতে পারেন যদি এর মধ্যে আর কোন কমপ্লিকেশন না অ্যারাইজ করে।

কেন—সে রকম কি কিছু আশংকা করেন?

না—তা নয় তবে পয়েজনিং কেস তো—অনেক সময় কমপ্লিকেশন দেখা দেয়।

চুনী আর অমূল্য ডাক্তার বের হয়ে আসে।

পথে পথে তখন আলো জ্বলে উঠেছে।

অমূল্য ডাক্তার তার ডিসপেনসারীর দিকে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল চুনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে।

ক্লান্ত চুনী হাঁটতে শুরু করে ফুটপাত ধরে হাসপাতালের গেট দিয়ে বের হয়ে।

সমস্ত মনটাই কেমন হঠাৎ যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।

একটা নিরালম্ব শূন্যতা যেন চারিদিক থেকে ওকে গ্রাস করতে চায়।

অন্যমনস্ক শ্লথ ভাবে পথ হাঁটছিল চুনী, হঠাৎ চৌরাস্তার সামনে কে যেন মেয়েলী গলায় তার নাম ধরে ডাকল—চুনীবাবু—

কে?

চেয়ে দেখে - অপর্ণা—

অপর্ণা দেবী!

হ্যাঁ—পুজো দিতে গিয়েছিলাম দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে—জানেন ফিল্মে একটা কাজ পেয়েছি। রোলটা যদিও ছোট, মাত্র দিন চারেকের কাজ, কিন্তু রোলটা খুব ভাল। আচ্ছা আপনার তাপসবাবুর সঙ্গে এর মধ্যে দেখা হয়েছিল?

হ্যাঁ—

তাকে একবার আমার কথা বলবেন।

বলব।

॥ ১৫ ॥

সত্যি অপর্ণা ফিল্মে একটা কাজ পেয়ে গিয়েছিল।

অপ্রত্যাশিতভাবেই পেয়ে গিয়েছিল কাজটা।

জগন্নাথ সেন নামে কে একজন অল্পবয়েসী চিত্রপরিচালক তার প্রথম বইটা কিছু হঠাৎ পয়সা পাওয়ায় এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে সিনেমা এডিটাররা তার পরিচালনার ভূয়সী প্রশংসা করায় জগন্নাথ সেনের মাথাটা বিগড়ে গিয়েছিল।

যাওয়াটা ঐ অবস্থায় এমন কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

এবং তার ফলে চিত্রজগতে আজকের দিনে যা হয়ে থাকে তাই হল শ্রীজগন্নাথ সেনেরও। শ্রীজগন্নাথ সেনের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা অর্থাৎ ছবির ফলোয়া করে বিজ্ঞপ্তি দেখা গেল সব কাগজে কাগজে।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে।

ছবির নাম দেখা গেল কাগজের সিনেমা পেজে ঘোষিত হয়েছে।

ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য—পরিচালনায় শ্রীজগন্নাথ সেন।

সব্যসাচী জগন্নাথ সেন একধারে সব কিছুর দায়িত্ব নিয়েছে এবারে।

এবং ছবির শিল্পীও শোনা গেল তথাকথিত কেউ নয় নামকরা—একেবারে আনকোরা—নতুন মুখ—

শ্রীমতী অনীতা ব্যানার্জী।

রাতারাতি শ্রীজগন্নাথ সেনের পাবলিসিটির জোরে শ্রীমতী অপর্ণা অখ্যাতা-অজ্ঞাতা এক মঞ্চ-অভিনেত্রী হয়ে গেল চিত্রজগতের এক উদীয়মানা তারকা—শ্রীমতী অনীতা ব্যানার্জী।

কাগজে কাগজে তার ছোট বড় নানা ছবি বের হল। অনীতা—শ্রীমতী অনীতা ব্যানার্জীর নানা ভঙ্গির সব ছবি।

শ্রীজগন্নাথ সেনের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা—আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের নব আবিষ্কৃতা তারকা শ্রীমতী অনীতা ব্যানার্জী যে আসলে অপর্ণা দাসী সে কথা কেউই জানল না—যার জীবন একদিন মঞ্চে সামান্য এক ব্যালে গার্ল হিসাবে শুরু হয়েছিল।

ছোট বেলায় খেলতে গিয়ে পড়ে গিয়ে চোট লেগে অপর্ণার সামনের দুটো দাঁত ভেঙে গিয়েছিল—কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই ভাঙা দাঁতেও অপর্ণার কোমল মুখশ্রীর জন্য মুখখানি তার দেখতে ভাল লাগত।

সত্যিই কালো রোগা মেয়েটির মুখশ্রীখানি ছিল অপূর্ব লাবণ্যময়ী।

এবং যদিও চোখ দুটো সামান্য একটু ছোট ছিল তবু ছোট কপাল—বাঁকানো ভ্রূযুগল—পাতলা ওষ্ঠ ও দৃঢ়বদ্ধ চিকণ চিবুক সব কিছু নিয়ে আলগা একটা কোমল লাবণ্য যেন গড়ে তুলেছিল সমগ্র মুখখানি জুড়ে। আর সত্যি কথা বলতে কি ঐ ভাঙা দাঁত দুটিতে মুখশ্রীর কোন ক্ষতিই করেনি অপর্ণার। তথাপি শ্রীজগন্নাথ সেন

বলল, না—ও দাঁত দুটো তুলে ফেলে নতুন দাঁত বসাতে হবে।

অপর্ণাকে বাধ্য হয়েই ডেন্‌টিস্টের কাছে গিয়ে কাঁচা দাঁত দুটো পট পট করে তুলে ফেলে নতুন দাঁত—অবশ্যই ফল্‌স্‌ দাঁত, বসিয়ে নিতে হল শ্রীজগন্নাথ সেনের যুক্তিকে অনস্বীকার্য বলে গ্রহণ করে।

জগন্নাথ সেনের বইয়ে প্রথমেই নায়িকার রোল পেয়ে অপর্ণার আনন্দের যেন অবধি ছিল না।

জগন্নাথ সেনও নানা অ্যাংগল থেকে শ্রীমতী অপর্ণা অর্থাৎ নবাগত অনীতা দেবীর নানা ফটো তুলে নানা ধরনের সিনেমা সংক্রান্ত মাসিকে ও সাপ্তাহিকে ফ্ল্যাশ বালবের আলোর মত চোখ ধাঁধাতে লেগে গেল।

আর অপর্ণা ঘরে বসে বসে আগামী দিনের এক মধুর স্বপ্নের জাল বুনে চলতে লাগল। মোটমাট সমস্ত বইতে অভিনয় করবার জন্য হাজার পাঁচেক টাকা পাবে অপর্ণা ঠিক হয়েছিল—

এবং তার মধ্যে তাকে হাজার এক টাকা অগ্রিম দিয়েই প্রডিউসার ধ্যান চাঁদবাবু কন্‌ট্রাক্ট সই করিয়ে নিয়েছিলেন।

হাজার এক টাকা এমন কিছু একটা টাকা আজকের দিনে না হলেও অপর্ণাদের দারিদ্র্যের সংসারে যেন লক্ষ টাকা হয়ে এসেছিল সেদিন।

অত টাকা একসঙ্গে অপর্ণা কখনও আজ পর্যন্ত চোখেও দেখেনি।

ধ্যানচাঁদ টাকাটা দশ টাকার নোটে নগদই দিয়ে গিয়েছিল।

টাকা দিয়ে কন্‌ট্রাক্ট সই করিয়ে ধ্যানচাঁদ ও জগন্নাথ সেন চলে যাবার পর অনেকক্ষণ অপর্ণা টাকার বাণ্ডিলগুলো সামনে নিয়ে চুপটি করে বসে থাকে।

অপর্ণার মা ও দিদি বিমলা ও মাধুরী বাড়িতে ছিল না ঐ সময়, সকালের দিকে গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিল।

কদিন থেকেই বাড়িতে যেন অশান্তির অন্ত ছিল না—হাতে একটা পয়সা নেই—গত সপ্তাহে অর্থের অভাবে র‍্যাশন পর্যন্ত তোলা হয়নি।

যদিও দিন দশেক আগে হঠাৎ দাদা রবীনের শ্বশুর কালীপদ এসে তার মেয়ে জামাই ও নাতি-নাতনীদের বারাসাত নিয়ে চলে গিয়েছিল তথাপি তিনটি প্রাণীর অন্নসংস্থানও যেন সাধ্যাতীত হয়ে উঠেছিল অপর্ণার পক্ষে।

প্রতিটি মুহূর্তে যেন সে দারিদ্র্য ও অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল—আর ঠিক সেই সময় এসে হাজির হল জগন্নাথ সেনের অ্যাসিস্‌টেণ্ট গোবিন্দ চক্রবর্তী।

কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেল, তবু যেন অপর্ণা ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত যে সত্যি সত্যিই টাকাটা আসবে—কন্‌ট্রাক্ট সই হবে যেন সে ভাবতেই পারছিল না। তাই সত্যি সত্যিই সেদিন সকালে জগন্নাথ সেন তার প্রডিউসারকে নিয়ে এসে কন্‌ট্রাক্ট সই করিয়ে হাজার এক টাকা নগদ গুণে গুণে দিয়ে

গেলে অপর্ণা কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

নতুন করকরে দশ টাকার নোটের পাঁচশো টাকা করে দুটো বাণ্ডিল—

চেয়ে চেয়ে দেখে টাকাগুলোর দিকে, যেন আশা মেটে না অপর্ণার।

জলে দু চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়।

বার বার মনে মনে একটা কথাই কেবল উচ্চারণ করতে থাকে—ভগবান, তুমি আছ—তুমি আছ ভগবান—তুমি আছ—

বিমলাই প্রথমে ঘরে ঢুকেছিল।

মেয়েকে অমন করে খাটের উপর বসে থাকতে দেখে সে তার মুখের দিকে তাকায়।

মেয়ের দুচোখের কোণ বেয়ে অজস্র ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে তখনও।

তার গণ্ড ও চিবুক প্লাবিত করে দিচ্ছে।

অপু—

বিমলা শঙ্কিত কণ্ঠে মেয়েকে ডাকে।

কিন্তু অপর্ণা কোন জবাব দেয় না।

ফিরেও তাকায় না মার মুখের দিকে। যেমন বসেছিল তেমনি বসে থাকে।

দু'পা আরও এগিয়ে আসে বিমলা।

অপু—কি হয়েছে অপু—কাঁদছিস কেন রে?

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল বিমলা মেয়েকে কিন্তু তার আর বলা হয় না—ইতিমধ্যে কখন একসময় মাধুরী এসে ঐ ঘরে ঢুকেছিল, ওরা কেউ জানতে পারে নি।

এবং বিমলার নজরে না পড়লেও মাধুরীর কিন্তু ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়েছিল অপর্ণার সামনে শয্যার উপরে চকচকে দুটো দশ দাকার নোটের বাণ্ডিল।

অপর্ণা হাঁটুর উপর মুখ রেখে বসেছিল আর নোটের বাণ্ডিল দুটো ছিল ঠিক তার পায়ের সামনেই শয্যার উপর একখণ্ড কাগজের উপর।

বড় মেয়ে মাধুরীর কণ্ঠস্বরে ও কথায় বিমলারও এতক্ষণে টাকার উপর নজর পড়ে।

বিমলাও বলে, তাই তো—অনেকগুলো টাকা?

আনন্দে ও সন্দেহের মিশ্রিত একটা সুর যেন বিমলার কণ্ঠে ফুটে ওঠে।

এতক্ষণে অপর্ণা জলে-ভেজা চোখ তুলে তাকায় বিমলার মুখের দিকে।

বলে, আমার টাকা—

তোর টাকা?

বিমলার কণ্ঠস্বরে সেই সন্দেহ—সেই বিস্ময়!

হ্যাঁ—

অত টাকা—

বলছি তো আমার টাকা—আবার অপর্ণা বলে।

কিন্তু কোথা থেকে এল অত টাকা?

বিমলা ও মাধুরী দুজনেই এবারে একই প্রশ্ন করে।

সিনেমায় কনট্রাক্ট পেয়েছি—অপর্ণা বলে।

সিনেমা—বিমলার যেন বিস্ময়ের অবধি নেই।

হ্যাঁ—

সত্যি - সত্যি বলছিস অপু—

বললাম তো—

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় অপর্ণা এবং নোটের বাণ্ডিল দুটো তুলে নেয় হাতে করে।

কত টাকা রে?

প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গে লোভে বিমলার চোখের মণি দুটো যেন জ্বলজ্বল করতে থাকে।

একটা ক্ষুধার্ত কুকুর যেন ডাস্টবিনের সামনে কোন নিমন্ত্রণ-বাড়ির একরাশ এঁটো পাতার দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু এগুতে সাহস পাচ্ছে না।

তা শুনে কি হবে—বলে একটা বাণ্ডিল থেকে কুড়িটা নোট গুনে গুনে তার হাতে দিয়ে বলে, দু মাসের বাড়িভাড়া বাকি আছে সত্তর টাকা—মুদির দোকানে ত্রিশ টাকা—পানওয়ালার দোকানে পাঁচ টাকা—শোধ করে দাও এখুনি। আর র‍্যাশন আনাবার ব্যবস্থা কর। কথাগুলো বলে অপর্ণা দাঁড়ায় না, ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

বিমলা কেঁদে ফেলে—মাধুরীও কেঁদে ফেলে।

সেই উপলক্ষেই অপর্ণা সেইদিন সন্ধ্যার দিকে কালীবাড়ি গিয়েছিল পুজো দিতে। এবং পুজো দিয়ে ফেরবার পথে দেখা তাপসের বন্ধু চুনীর সঙ্গে।

আনন্দে মনটা যেন অপর্ণার হাওয়ায় উড়ছিল।

পুজো দিয়ে সোজা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে গেল একটা রেস্টুরেন্টে, সেখান থেকে কিছু চপ, কাটলেট, ডিমের কারি ও মোগলাই পরোটা গরম গরম ভাজিয়ে একটা রিক্সা ভাড়া করে অপর্ণা যখন বাড়ির সামনে এসে রিকশা থেকে নামল—রাত তখন প্রায় দশটা।

রিকশা ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সামনে এগুতেই নজরে পড়ল সদর দরজাটা হা হা করছে খোলা।

এত রাত্রে দরজাটা খোলা এমন করে।

কথাটা মনে হয়েও মনে হল না যেন অপর্ণার।

হয়ত কেউ এসেছে, কিংবা দিদি মাধুরীই হয়ত কোথায়ও বাইরে বের হয়েছে—এখুনি ফিরে আসবে।

॥ ১৬ ॥

দরজাটা খুলে রেখেই অপর্ণা হাতের ঠোঙাগুলো নিয়ে ভিতরে পা বাড়ায়।

সিঁড়ির আলোটা জ্বলছে।

রান্নাঘরের আলোটাও জ্বলছে। কি ভেবে এবারে অপর্ণা রান্নাঘরের দিকেই এগোয়।

রান্নাঘরের দরজাটা খোলাই ছিল।

ভিতরে দৃষ্টি পড়ে—

থমকে দাঁড়ায় অপর্ণা সঙ্গে সঙ্গে যেন।

উনুনটা দাউ দাউ করে জ্বলছে, আর সেই প্রজ্বলিত উনুনটার দিকে তাকিয়ে স্থির দৃষ্টিতে যেন পাথরের মত বসে আছে দিদি মাধুরী।

দিদি—

প্রথম ডাকে সাড়া পায় না অপর্ণা মাধুরীর।

দ্বিতীয়বার তাই ডাকে, দিদি—

কে?

মাধুরী ফিরে তাকাল, অপি।

কি রেঁধেছিস রে?

মাধুরী জবাব দেয় না।

সকালের মাছ নিশ্চয়ই ফুরিয়ে গেছে। চপ, কাটলেট ডিমের কারি আর মোগলাই পরোটা এনেছি, নে ধর্।

রেখে দে।

কেমন যেন নিরাসক্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দেয় মাধুরী।

আর ঠিক সে মুহূর্তে একটা খিলখিল হাসির শব্দ কুৎসিত উচ্ছৃঙ্খলতায় যেন অপর্ণার কর্ণপটাহের উপরে এসে আছড়ে পড়ে।

জিনিসগুলো হাত থেকে নামাতে যাচ্ছিল অপর্ণা—থমকে দাঁড়ায়।

হাসির শব্দটা তখনও থামেনি এবং কণ্ঠস্বর চিনতেও কষ্ট হয়নি অপর্ণার।

তার মা বিমলার হাসির শব্দ।

বিমলাই খিলখিল করে হাসছে।

মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল অপর্ণা, তারপরই হাতের ঠোঙাগুলো মাটিতে কোনমতে নামিয়ে রেখে অপর্ণা বড় বোনের মুখের দিকে ঘুরে তাকায়।

মা অমন করে হাসছে কেন রে দিদি?

মাধুরী কোন জবাব দেয় না।

নির্বাক।

দিদি—

জবাব নেই মাধুরীর।

অপর্ণা আর দাঁড়ায় না, জিনিসগুলো কোনমতে মেঝেতে নামিয়ে রেখে ঝড়ের মতই যেন রান্নাঘর থেকে বের হয়ে যায়।

বিমলার ঘরের দরজাটা খোলা।

আলো জ্বলছে ঘরে।

ঘরের ভিতরে ঢুকতে হয় না, খোলা দরজাপথে আলোয় সবই স্পষ্ট চোখে পড়ে।

দৃশ্যটা যেমনি কুৎসিত তেমনি যেন ন্যক্কারজনক।

ঘরের মধ্যে মেঝেতে বসে তার পোড়া মা বিমলা আর এক প্রৌঢ়—

সে প্রৌঢ় ব্যক্তিকে অনেক বছর আগে তার মার কাছে মধ্যে মধ্যে আসতে দেখত অপর্ণা। এবং গত দশ-বারো বছর ধরে আর দেখেনি।

হরিধনবাবু—

এককালে থিয়েটারে নাকি নাকিসুরে খুব রসিয়ে জমিয়ে কমিক পার্ট করত।

নামডাক ছিল।

ধনীর ঘরের ছেলে—থিয়েটারের ঝোঁক ছিল, থিয়েটারে ঢুকে সর্বস্ব খুইয়েছিল।

বিমলার সঙ্গে এককালে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল বয়েসকালে হরিধনের।

আসা যাওয়া মাখামাখি ছিল।

তারপর ক্রমশঃ দুজনেরই বয়েস হওয়ায় আসা যাওয়া একটু একটু করে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

প্রৌঢ় হরিধনের পরনে চওড়া কালোপাড় চুনোট করা ধুতি—আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবি গায়ে—

পাঞ্জাবির সারা বুকে মাংসের ঝোল লেগে আছে।

সামনে এক প্লেট মাংস, একরাশ ছড়ানো চিংড়ির খোসা ও হাড়, দুটো দিশি মদের খালি বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে।

হাতে অর্ধপূর্ণ একটা মদের গ্লাস।

সামনে বসে বিমলা।

একটা পুরাতন বেনারসী শাড়ি ও ভেলভেটের একটা ব্লাউজ গায়ে।

মুখে একরাশ রং মেখেছে।

বুকের আঁচল খসে পড়েছে—ঢুলুঢুলু নেশায় রক্তিম চোখ—

হাতে গ্লাস—

খিলখিল করে হাসছে বিমলা।

বিমলি—মনে পড়ে সে সব দিনের কথা—

হরিধনের কথা শেষ হল না—

তীক্ষ্মকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে অপর্ণা—মা—

হঠাৎ বিমলার হাতের গ্লাসটা মাটিতে পড়ে ঝনঝন্ শব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়—

অপর্ণা যেন পাগলের মতই এসে ঘরে ঢোকে এবং হরিধনের দিকে চেয়ে চিৎকার

করে ওঠে আবার, বের হয়ে যান—বের হয়ে যান এখান থেকে, যান—

হরিধন টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়, বিমলি—তোর সেই মেয়েটা না ?

যান—বেরিয়ে যান—আবার চিৎকার করে ওঠে অপর্ণা।

অপর্ণা তখন যেন ক্ষেপে গিয়েছে একেবারে।

বিমলা বোবা—নিস্পন্দ।

বিমলার দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে টলতে টলতে হরিধন বের হয়ে যায় ঘর থেকে।

বিমলার নেশা ততক্ষণে প্রায় কেটে এসেছে।

মেয়ের রুদ্রাণী মূর্তির দিকে চেয়ে বলে, ভদ্দর লোকের ছেলেকে তাড়িয়ে দিলি—

ছিঃ ছিঃ. গলায় দড়ি জোটে না তোমার—

ঘৃণায় লজ্জায় অপর্ণার গলার স্বরটা বুজে আসে।

দু'চোখ ছাপিয়ে সেই সঙ্গে জল আসে।

অপর্ণা আর দাঁড়ায় না।

ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

সোজা এসে নিজের ঘরে ঢুকে অন্ধকারে শয্যাটার উপর লুটিয়ে পড়ে।

ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

আর ওদিকে বিমলা তখনও হতভম্ব হয়ে বসে আছে ঘরের মধ্যে।

মাধুরী এসে ঘরে ঢোকে!

আর তার পশ্চাতে তাপস।

তাপস ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

মাধুরী তাড়াতাড়ি তাপসকে দেখতে পেয়ে তাকে একপ্রকার ঠেলেই যেন ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসে—

চল—তাপসবাবু, পাশের ঘরে চল—

কী ব্যাপার মাধুরী দেবী—

কিছু না—

ঘরের মধ্যে তোমার মাকে যেন দেখলাম—

না, না—মা তো নয়—

কে তবে—মনে হল যেন তোমার মা-ই—

না, না, মা তো গয়া গিয়েছে—হঠাৎ বলে প্রত্যুত্তরে মাধুরী তাপসকে।

কবে ? তাপস শুধায়।

এই তো দিন সাতেক হল। মাধুরী আবার বলে।

হঠাৎ গয়ায়—কেন যেন তাপসের কথাটা তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।

পিণ্ডি দিতে—বলে এবারে মাধুরী।

পিণ্ডি দিতে—কার ?

বাবার—চল—অপু তার ঘরে আছে—তার ঘরে চল—মাধুরী যেন প্রসঙ্গটা

ঐখানেই ইতি করে দিতে চায়।

তাপসকে যেন কোনমতে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যেতে চায়—ঐ ঘর থেকে ঐ মুহূর্তে যে কোন উপায়ে যেন বের করে নিতে চায়।

চল—চল তাপসবাবু—

একপ্রকার যেন টেনেই তাপসকে ঘর থেকে বের করে দেয় মাধুরী আগে, তারপর নিজেও বের হয়ে আসে ঘর থেকে।

এবং সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে ঘরের শিকলটা তুলে দেয় মাধুরী দরজার কপাট দুটো টেনে দিয়ে ক্ষিপ্র হাতে।

এস—

পাশেই অপর্ণার ঘর।

ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল এবং ঘরের ভিতরটা অন্ধকার।

মাধুরী তাপসের জন্য অপেক্ষা করে না—ঘরের মধ্যে ঢুকে আলোটা সুইচ টিপে জেবলে দিয়ে ডাকে, অপি—

অপর্ণা তখনও ঠিক তেমনি ভাবেই শয্যার উপর উপুড় হয়ে পড়েছিল।

কান্নার বেগটাও কমে এসেছিল।

এই অপি—তোর তাপসবাবু এসেছে রে—

মাধুরী আবার বোনকে ডাকে।

অপর্ণা কোন সাড়া দেয় না। যেমন শুয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবেই শয্যার উপর পড়ে থাকে উপুড় হয়ে।

মাধুরী শয্যার কাছে আরও একটু এগিয়ে আসে, এই অপি—তোর তাপসবাবু এসেছে—

তাপসও ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছিল।

বাড়ির মধ্যে কোথাও যে কিছু না কিছু গোলমাল ঘটেছে সেটুকু বুঝতে পেরেছিল ইতিমধ্যেই তাপস এবং না বোঝবার মত বুদ্ধির অভাবও ছিল না তার।

এবং যতই ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করুক—এবং যাই বলুক না কেন মাধুরী, একটু আগে পাশের ঘরে যে সে ওদের মা বিমলাকেই দেখে এসেছে এবং তাকে চিনতেও পেরেছে সে সম্পর্কেও সে নিঃসন্দেহ।

কিন্তু বিমলার ঐ চেহারা, বিচিত্র বেশভূষা—সামনে মদের বোতল গ্লাস ইত্যাদি সেইগুলিই যেন তখনও তার বোধগম্য হচ্ছিল না।

তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে অপর্ণাকে ঐ সময় অমনভাবে সাজগোজ করে শুয়ে থাকতে দেখেও বিস্ময় সে কম বোধ করেনি।

তাপস যেন একটু বিব্রতই বোধ করে।

হঠাৎ এত রাত্রে এভাবে বোধ হয় এখানে না আসাই তার উচিত ছিল—

কিন্তু এসেছিল সে অপর্ণাদের অনেকদিন কোন সংবাদ পায় নি—সংবাদ নেবার জন্য এবং সেই সঙ্গে অপর্ণাকেও কিছু টাকাও দিয়ে যাবে ভেবেছিল।

তাছাড়া অপর্ণাকে অনেকদিন দেখে নি—চোখে একবার দেখার সাধও বোধ হয় কিছুটা।

॥ ১৭ ॥

অপর্ণা কোন সাড়া দিচ্ছে না দেখে মাধুরীও একটু বিব্রত বোধ করে।

কি করবে ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারে না।

পিছন ফিরে ঐ সময় তাকাতেই দেখে তাপস ঘরের মধ্যে এসে ঢুকেছে এবং তাদের দিকে চেয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে।

মাধুরী তাড়াতাড়ি বলে, তুমি বস তাপসবাবু—ওর সেই সন্ধ্যে থেকে মাথা ধরেছে—

মাথা ধরেছে—

হ্যাঁ তাই—শুয়ে আছে—

তাপস তাড়াতাড়ি বলে, না, না—তবে থাক—আমি আজ তাহলে চলি—মনে হচ্ছে ও বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে—ওকে আর বিরক্ত করবেন না—

তাপস কথাগুলো বলে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল. কিন্তু বাধা পেল—অপর্ণা ইতিমধ্যে উঠে বসেছিল—

সে বলে, বস তাপসবাবু—

তাপস ফিরে তাকায়—

মাধুরী ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

তাপস কিন্তু তথাপি ইতস্ততঃ করে। বলে, না থাক—আজ আমি যাই অপর্ণা—তোমার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার মাথার যন্ত্রণাটা বোধ হয় খুব বেশী হচ্ছে—

ও কিছু না—এস বস—

তাপসকে একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে বসবার জন্য ইঙ্গিত করে অপর্ণা।

তাপস তবু বসে না। বলে, রাতও তো হয়েছে—

আমাদের মত মানুষের ঘরে রাত কোথায়—এই তো সবে সন্ধ্যে—বস—

তাপস বসে চেয়ারটায়—

আচ্ছা তাপসবাবু, একটা সত্যি কথা বলবে?

কী?

আমাদের মত মেয়েছেলেদের তোমরা মনে মনে যতই কামনা কর না কেন—তার মধ্যে যে একটা প্রচণ্ড ঘৃণা আছে—এ কথাটা নিশ্চয়ই তুমি অস্বীকার করতে পার না!

তাপস মৃদু হেসে বলে, কে বলল—

বলতে হয় না কারও—প্রয়োজনও হয়নি কারও বলবার। জ্ঞান হওয়া থেকেই আপনা থেকে ব্যাপারটা জানতে পেরেছি—

কিন্তু বিশ্বাস কর অপর্ণা—সত্যিই তোমাকে আমি ঘৃণা করি না—কখনও করিওনি—

ঘৃণা কর না ?

না—

কেন—কেন ঘৃণা কর না ?

তাপসের চোখে চোখ রেখে তাকায় অপর্ণা ।

তার দু'চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ম অন্তর্ভেদী ।

ঘৃণা তুমি কর—তবু কেন মিথ্যে কথাটা বলছ অমন জোর গলায় তাপসবাবু ?

তাপস যেন কেমন থতমত খেয়ে যায় । বলে, মি-মিথ্যে বলছি—

নিশ্চয়ই—যে মিথ্যের চাইতে বড় মিথ্যে আর হতে পাবে না । কিন্তু আর যারই তার প্রয়োজন থাক তোমার তো ছিল না তাপসবাবু—

অপর্ণা—

হ্যাঁ—অন্ততঃ তুমি তো জান—তোমার আমার এই উচ্ছিষ্ট দেহটা এতটুকু প্রয়োজন হলেও অপর্ণার তোমাকে না বলবার শক্তি নেই—তবে—তবে তুমি সত্য কথাটা বলতে পারছ না কেন—

তুমি হয়তো আমার কথাটা বিশ্বাস করছ না—কিন্তু জেনো—তাই যদি হত এখানে আর যেই আসুক আমি আসতাম না—

আশ্চর্য—

কি আশ্চর্য অপর্ণা ?

তুমি খুব ভাল করেই জান কোন্ পাঁকে আমার জন্ম—জাত কুল বংশ—বাপের কোন পরিচয়ই নেই, আর এতকাল কি ভাবে জীবন আমার কেটেছে—তা সত্ত্বেও তুমি আমায় ঘৃণা কর না—করনি কোনদিন—

তার কারণ হয়তো একটা আছে বা ছিল ।

কারণ ? শুধায় অপর্ণা ।

হ্যাঁ—বলে তাপস ।

কী—কী কারণ ? পুনরায় প্রশ্ন করে অপর্ণা ।

কারণ—আর দশজন পুরুষমানুষ তোমার কাছে যেজন্য এসেছে—তোমার সঙ্গে আলাপ করেছে—আমি হয়তো সেই কারণে বা সেই মন নিয়ে আসিনি তোমার কাছে, পরিচয় করিনি তোমার সঙ্গে—

তাপসবাবু—বিশ্বাস করতে পারছি না কথাটা—বিশ্বাসযোগ্য নয়ও—তবু আজ সত্যি বলছি—চেষ্টা করব—তুমি আজ না বললেও সেটা বিশ্বাস করতে চেষ্টা করব ।

কি তোমার হয়েছে আমি জানতে চাই না অপর্ণা—জানবার ইচ্ছেও নেই—তবে না জানলেও এটুকু বুঝতে পারছি যে কারণেই হোক মনটা তোমার আজ সত্যিই বিক্ষিপ্ত, আজ আমি উঠি—

তাপস উঠে দাঁড়ায় ।

আচ্ছা তাপসবাবু—

বল!

তোমার এক ডাক্তার বন্ধু আছে না, লেখক?

হ্যাঁ—অমূল্য গুপ্ত—শুধু ডাক্তারই নয়, নামকরা একজন লেখকও—

জানি—তার সঙ্গে আমাকে একবার আলাপ করিয়ে দেবে তাপসবাবু?

আলাপ—

হ্যাঁ—

কেন বল তো?

লোকটা যুদ্ধে গিয়েছিল, তাই না?

হ্যাঁ—

সেই যুদ্ধের পটভূমিকাতেই একটা বিরাট উপন্যাস লিখেছেন তোমার বন্ধু—

তাই নাকি?

তুমি বোধ হয় পড়নি, আমি পড়লাম সেদিন।

তোমার কথা আমি ঠিক এখনও যেন বুঝতে পারছি না অপর্ণা—

অনেক নারীচরিত্র তাঁর সেই বিরাট উপন্যাস 'ঝড়' যার নাম—তাতে ভড় করে এসেছে—

কিন্তু—

কী—

আমার মত একটি চরিত্রও তাঁর সেই বিরাট 'ঝড়' উপন্যাসের মধ্যে নেই, তাঁকে আমার জীবনকাহিনী বলব—একটা সত্যিকারের উপন্যাস লিখতে আমার মত একটি চরিত্র নিয়ে—

বেশ তো—আলাপ করিয়ে দেব, আজ আমি চলি।

তাপস আর দাঁড়াল না।

ঘর থেকে বের হয়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে চলে গেল।

সেই যে সেরাত্রে তাপস অপর্ণার ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল তারপর আর দীর্ঘ দু বছর তার কাছে যায়নি।

দেখাও হয়নি অপর্ণার সঙ্গে।

দেখা হয়েছিল দীর্ঘ দু'বছর পরে আবার অপর্ণার সঙ্গে তার।

টালীগঞ্জ পাড়ায় এক স্টুডিওতে।

ঐ ডাঃ অমূল্য গুপ্তরই একটা বইতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য মনোনীতা হয়ে এসেছিল সেদিন অপর্ণা নয়—অনীতা ব্যানার্জী।

নবাগতা সেদিন আর সে নেই।

দু'বছরে অনেক পাতা তার জীবনের উল্টে গিয়েছিল।

সে তখন যুগস্রষ্টা চিত্র-পরিচালক কৃষ্ণেন্দু ভৌমিকের বইয়ের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে দেশে-বিদেশে প্রচুর খ্যাতির অধিকারিণী হয়েছে।

লোকের মুখে মুখে তখন ফিরতে শুরু করেছে তার নামটি—অনীতা ব্যানার্জী।

অপর্ণা দাসী নয়—অনীতা ব্যানার্জী !

কিন্তু সে তো আরও অনেক পরের কথা।

দীর্ঘ দুটো বছর।

অপর্ণা দাসী তখন মরে গিয়েছে—

বিডন স্ট্রীট থেকে বেরুনো কি এক অখ্যাতনামা সরু অন্ধকার গলির মধ্যেকার ব্যালে গার্ল থেকে শুরু করে সাধারণ এক মঞ্চাভিনেত্রী অপর্ণা দাসী নয়।

সিনেমা—চিত্রজগতের গ্ল্যামার অনীতা ব্যানার্জী।

সম্পূর্ণ নতুন একটি মেয়ে।

অমূল্য গুপ্তর বইয়ের সেদিন প্রথম সুটিং—স্টুডিওতে।

অমূল্য গুপ্তকে যেতে হয়েছিল তার চরিত্রের পরিচালক মণি বোসের অনুরোধ না এড়াতে পেরে স্টুডিওতে—আর তাপস গিয়েছিল—তার নিজস্ব ট্যাক্সি চালিয়ে এক অভিনেতাকে নিয়ে ভাড়া খাটতে।

অমূল্য গুপ্তকে দেখতে পায়নি তাপস।

সোয়ারী নামিয়ে দিয়ে ভাড়া নিয়ে ট্যাক্সি ব্যাক করে বেরুতে যাবে এমন সময় অমূল্য গুপ্তর গাড়িটা এসে স্টুডিওর মধ্যে ঢুকে তার মুখোমুখি দাঁড়াতেই ব্রেক কষতে হয়েছিল তাপসকে।

অমূল্য গুপ্ত গাড়ি থেকে নেমে ট্যাক্সিচালক তাপসকে দেখতে পায়।

সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, তাপসবাবু না—

বাধ্য হয়েই অতঃপর তাপসকে গাড়ি থেকে নামতে হয়—অমূল্য ডাক্তারের সামনে এসে দাঁড়াতে হয়—

তাপসবাবু—

বাবু নই ডাক্তার সাহেব, শুধু তাপস—হাসতে হাসতে বলে তাপস, কিন্তু আপনি এখানে।

অমূল্য ডাক্তার হাসতে হাসতে জবাব দেয়, আপনি নয়—তুমি—

কিন্তু এখানে কেন ?

ডাক্তারী ব্যাপার নয়, বুঝতেই পারছ—আমার একটা বইয়ের প্রথম সুটিং আজ।

তাই নাকি—

হ্যাঁ।

তা ট্যাক্সিটা নতুন বলে মনে হচ্ছে ? অমূল্য ডাক্তারই প্রশ্ন করে এবারে।

হ্যাঁ—কিনেছি মাস দুই হল। তাপস মৃদুকণ্ঠে বলে।

Very good—নিজস্ব ব্যবসা, আয় কেমন হচ্ছে ?

এই তো সবে মাস দুই হল, তবে মনে হচ্ছে মন্দ হবে না—ভালই হবে।

খুব ভাল কাজ করেছ—পরের চাকরি মানুষে করে—

পেটে দায়ে যে করতে হয় ভাই—তাপস হাসতে হাসতে বলে।

আর ঠিক ঐ সময় প্রডিউসারের ঝক্‌ঝকে ডজ কিংসওয়ে গাড়িতে চেপে বইয়ের নায়িকা অনীতা ব্যানার্জী এসে নামল ওদের সামনে।

হঠাৎ দেখে যেন চমকে গিয়েছিল তাপস, অপর্ণা—অনীতা ব্যানার্জীকে।

টাকার বোধ হয় একটা নিজস্ব রং আছে—

সেই রং লেগে যেন মেয়েটা মাথার চুল থেকে শুরু করে পায়ের নখ পর্যন্ত বদলে গিয়েছে—

গায়ের রংটা আরও ফর্সা হয়েছে—তার উপরে একটা যেন ইচ্ছাকৃত অথচ অনিচ্ছাকৃত যেন মনে হয় এমনি হালকা প্রসাধনের জৌলুস।

স্যাম্পু করা মাথার চুল—এলো খোঁপা করা।

সারা গায়ে আভরণ বেশী না থাকলেও পরিধেয় শাড়িটা রীতিমত দামী—পাতলা পাতলা ফিনফিনে ব্লাউজের তলা থেকে অন্তর্বাস সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়—তার চাইতেও সুস্পষ্ট পীনোন্নত বক্ষের মাধুর্য।

দামী শাড়ির আঁচলটা যেন গায়ের ওপর বুকের ওপরে থাকছে না—থাকতে চাইছে না।

সযত্নলালিত—চেষ্টাকৃত একটা শৈথিল্য ও অগোছাল ভাব বেশবাসে।

দু' বছর আগেকার অপর্ণা নয়—সম্পূর্ণ অন্য মানুষ—

নতুন আবিষ্কৃত একটি মেয়ে যেন।

অপর্ণাকে চিনতে পেরেছিল বলেই প্রথম দৃষ্টিতে অমন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল তাপস।

মণি বোসই—মানে পরিচালক মণি বোসই লেখক অমূল্য ডাক্তারের সঙ্গে অপর্ণার পরিচয় করিয়ে দিলেন গদগদ কণ্ঠে—অমূল্যবাবু কাহিনীকার—ইনি চিনতে নিশ্চয়ই পারছেন—আমাদের নায়িকা—অনীতা ব্যানার্জী।

অনীতার সঙ্গে সেই মুহূর্তে তাপসের চোখাচোখি হয়েছিল—

মুহূর্তের জন্য—পলকের জন্য—

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনীতা দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে অমূল্য ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে বলে, নমস্কার—

অমূল্য গুপ্তও বলে, নমস্কার—

বাস, ঐটুকু—তারপরই অমূল্য গুপ্ত অন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা শুরু করে—অনীতাও মণি বোসের দিকে তাকিয়ে শুধায়, আমি তাহলে মেক-আপে গিয়ে বসি—

মণি বোস তটস্থ হয়ে বলেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ, চলুন—চলুন।

তাপস তখনও চেয়ে আছে অপর্ণার গমনপথের দিকে।

অপর্ণা দাসী নয়—রাজেন্দ্রাণীর মতই যেন এক তরুণী হেঁটে চলে যাচ্ছে—চলার মধ্যেই কি ঠমক—গমক!

অপর্ণা চিনতে পারেনি তাপসকে আর সেদিন।

কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা।

॥ ১৮ ॥

বিষ্টু পাকড়াশীর চাকরিটাই নিয়েছিল তাপস।

এবং কথাবার্তার পরের দিনই দ্বিপ্রহরে—হাসপাতালে আসার ঝামেলাটা খানিকটা মিটলে সোজা চলে গিয়েছিল অজন্তা হোটেলে।

টাকাটা আগাম যখন নিয়েছে চাকরি তাকে অন্ততঃ একটা মাস করলেও তো করতে হবেই।

কথার খেলাপ সে করতে পারে না।

ঐটি আজ পর্যন্ত সে করেনি।

কথার খেলাপ সে কখনও করেনি কারও সঙ্গে।

একেবারে চৌরঙ্গীর উপর বিরাট হোটেল—অজন্তা হোটেল।

এককালে সাহেবদের সম্পত্তি ছিল, এখন দুজন সিন্ধি সেটা কিনে নিয়েছে।

বিষ্টু পাকড়াশী হোটেলের ম্যানেজার।

এনকোয়ারী কাউন্টারে গিয়ে একজন ছোকরা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকে সে বিষ্টু পাকড়াশীর সঙ্গে দেখা করতে চায় বলতেই—সে বলল—সোজা গিয়ে বাঁয়ের করিডোর ধরে এগিয়ে গেলেই ম্যানেজারের অফিস—সেখানে দারোয়ান আছে—তাকে বললেই দেখা করবার ব্যবস্থা হবে।

তাপস এগিয়ে গেল।

দারোয়ানকে দিয়ে ভেতরে নাম বলে পাঠাতেই ভিতর থেকে ডাক এল।

ছোট একটি সুন্দর করে সাজানো এয়ার-কনডিশন রুম—

দামী সুট-পরিহিত মুখে পাইপ ম্যানেজার বিষ্টু পাকড়াশী একটা ঘূর্ণায়মান চেয়ারে বসেছিল।

ওকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই তাকাল, এস তাপসবাবু—

নমস্কার—

বস—

তাপস সামনের একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ে।

তারপর কি খাবে বল—কফি, না চা?

সেদিন সত্যিই বুঝতে পারেনি তাপস ব্যাপারটা—

সামান্য একটা ড্রাইভারের চাকরি নিয়ে গিয়েছে, অথচ খাতিরের ঘটা এমন যেন কোন সম্মানিত অতিথি সে বিষ্টু পাকড়াশীর।

পরে অবিশ্যি সব কিছুই পরিষ্কার—স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

তাপস বলে, না—এখন কিছু খাব না—

ও ঠিক আছে—তাহলে কবে থেকে কাজ করতে চাও ?

কাল থেকেই করব—মানে বলেন তো করতে পারি—

Why not from to night—আজ রাত থেকে পার না—অসুবিধা আছে কিছু ?

আমি তো ঠিক প্রস্তুত হয়ে আসিনি—মানে—

আরে তাতে কিছু এসে যাবে না—কেবল একটু বেশ বদল—মানে জামাকাপড় বদলাতে চাও তো—গাড়িটা গ্যারেজ থেকে নিয়ে সোজা না হয় তোমার ডেরায় চলে যাও—চেঞ্জ করে এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে পারবে না ?

তা হয়তো পারব—

তবে যাও—আর দেরী করো না—বলেই টেবিলের সঙ্গে লাগানো পাশে ইলেকট্রিক বাজারের বোতামটা টিপতেই ঘরের দরজা খুলে একজন লোক এসে ঢুকল।

কুলকারনী—

ইয়েস স্যার—

এই ভদ্রলোককে নিয়ে যাও গ্যারেজে—আনোয়ারকে বলবে সাদা বুইক গাড়ির চাবিটা একে দিতে— এবার থেকে এই ঐ গাড়িটা চালাবে—

ঠিক আছে স্যার—

যাও তাপসবাবু—কুলকারনী—

আসুন—কুলকারনী তাপসকে আহ্বান জানায়।

তাপস উঠে দাঁড়ায়।

শোন—এখানে এসে গ্যারেজ থেকে আমার কনেকশন চেও—তখন কোথায় আজ যেতে হবে বলে দেব—

ঠিক আছে—

তাপস হ্যাঁ বা না কিছু বলে না—নিঃশব্দে কেবল ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

বিরাট ঝকঝকে লাকসারি বুইক গাড়িটা।

শুনে কিন্তু পাকড়াশীর কাছে তাপস সেদিন বলেছিল বটে সব রকমের গাড়িই চালাতে সে পারে কিন্তু—

ঐ গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বাইরে রাস্তায় বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারে—আজ পর্যন্ত যে সব গাড়ি সে চালিয়ে এসেছে—এ গাড়ি সে-সব গাড়ি নয়—অর্ধ লক্ষ টাকার কাছাকাছি অন্ততঃ এর দাম—

পথের উপর দিয়ে চার চাকায় নয় যেন শূন্যে ডানা মেলে উড়ে চলেছে—যেমন করে মরাল নিঃশব্দ গতিতে আকাশ-সরোবরে ভেসে চলে।

এতে চড়ে আনন্দ—চালিয়ে শুধু একটা কেবল যে আনন্দই তা নয় একটা উত্তেজনাও যেন রোমকূপে-কূপে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তাদের বাড়ির সরু রাস্তায় তো এ গাড়ি ঢুকবে না—

বড় রাস্তায় পার্ক করে রেখে যেতে হবে—

কোন অসুবিধে হবে না অবিশ্যি, সঙ্গে তার একজন ক্লিনার আনোয়ার দিয়ে

দিয়েছিল নাথু সিং—

নাথু সিংকে রেখে গাড়িতে সে পোশাক বদলে আসতে পারবে।

তাই করল তাপস।

বাড়ির সামনে না গিয়ে বড় রাস্তায় গাড়িটা পার্ক করে নাথু সিংকে বসিয়ে সে বাড়িতে চলে গেল।

কিন্তু বাড়িতে ঢুকে সে থমকে দাঁড়াল।

বড়বাবু—তপনের গলা না—

হ্যাঁ, বাবার ঘর থেকে বড়বাবুর গলাটাই শোনা যাচ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে বড়বাবু তপনের গলার স্বরটা কানে যেতেই ও থমকে দাঁড়ায়।

তাহলে তুমি এ টাকা নেবে না মা?

তপনের গলা।

উনি যদি নেন তো ওঁর হাতে দাও—

বাবা—

তাপস আর দাঁড়াল না—সোজা উপরে উঠে খোলা দরজাপথে বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

জীবানন্দবাবু শয্যার উপরে একটা ময়লা বালাপোশ গায়ে দিয়ে বসে আছেন—

অদূরে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ওদের মা আনন্দময়ী—

এবং তাদের সামনেই দাঁড়িয়ে তপন।

পরনে ঝকঝকে স্যুট, পায়ে চকচকে জুতো—গা থেকে দামী সিগারেটের গন্ধ বেরুচ্ছে—হাতের মুঠোয় ধরা খানকয়েক দশ টাকার নোট—

তাপসের পদশব্দে ঘরের মধ্যে সকলেই মুখ তুলে তাকায়।

জীবানন্দবাবু বোধ করি তপনের হাত থেকে টাকাগুলো নেবার জন্য হাত বাড়াচ্ছিলেন—মানুষের অর্থের অভাব মানুষকে যে কোথায় নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে ভাবতে গেলে বুঝি থই পাওয়া যায় না।

ঐ একটা জায়গায় মানুষ কোন কোন সময় বোধ করি সব বিচার বুদ্ধি বিবেচনাকে হারিয়ে ফেলে নচেৎ কেমন করে জীবানন্দবাবু তপনের টাকার দিকে হাত বাড়িয়ে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু বাড়ানো হল না শেষ পর্যন্ত—

মাঝপথেই হাতটা গুটিয়ে নিতে হল তাপসের ঘরের মধ্যে আকস্মিক আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সসংকোচে।

তাপস বলে ওঠে নির্মম কঠিন কণ্ঠে, বড়বাবু এতদিন পরে এলেন—চা-টা কিছু খেতে দিয়েছ মা—না—বুঝতে পারছি ভুলে গেছ—নাও—এই দশটা টাকা নাও—বলতে বলতে দশ টাকার একটা নোট পকেট থেকে বের করে তাপস মার হাতের মধ্যে গুঁজে দেয়।

আনন্দময়ী নির্বাক।

তাপস বলে, যাও মা, চট্ করে কাউকে দিয়ে ভাল খাবার আনিয়ে দাও—কথাটা মাকে বলে তাপস ফিরে তাকায় এবার তপনের দিকে। বললে, তা দাদা, একদিন বৌদিকে নিয়ে এস না—ক্ষুদকুঁড়ো যা পারি দুটো না হয় ক্ষমাঘেন্না করেই মুখে দিয়ে যেও—

তাপস—

সহসা যেন বোমার মতই ফেটে পড়ে এতক্ষণে তপন।

দেখ দাদা, চর্মচক্ষু বলে যে একটা বস্তু মানুষের আছে তোমার যে সেটুকুও নেই আজ বুঝতে পারলুম—

মুর্খ—অপদার্থ—চাপা আক্রোশ ও ঘৃণায় যেন দ্বিতীয়বার আবার ফেটে পড়ে তপন ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে।

লেখাপড়া শিখি নি যখন তখন তোমার মতে মুর্খ তো বটেই—আর অপদার্থ, সে তুমি আর কি বলবে বড়বাবু—দুনিয়াসুদ্ধ লোকই তো কথাটা বলবে কিন্তু তবু একটা কথা না বলে পারছি না—নির্লজ্জতারও বোধ হয় একটা সীমা আছে মানুষের, কিন্তু তুমি সেটাও বোধ করি অতিক্রম করে গেলে—

জীবানন্দবাবু পাথরের মতই বসে থাকেন।

কিন্তু আনন্দময়ী বাধা দিলেন, আঃ তপু—থাম্ না বাবা—

তাপস কিন্তু থামে না। বলে, থাকতে পারছি না মা—তোমার বড় ছেলে কেন আজ এসেছে ঐ নোট কটা হাতে করে জান মা—তোমাদের সাহায্য করতে নয়—কর্তব্য করতেও নয়—এসেছে দেখতে ওর দাক্ষিণ্যের হাতটা গুটিয়ে নিয়ে চলে যাওয়ার পর ধাপে ধাপে আমরা চরম অভাব আর উপবাসের কোন্খানে এসে দাঁড়িয়েছি। ভালই হল দেখে গেল নিজের চোখে আমাদের দুরবস্থাটা—

তাপসের কথাগুলো শেষ হবার আগেই তপন ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল—সে আর দাঁড়ায়নি এবং তপন ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর তাকাল তাপস তার বাবার মুখের দিকে।

বাবা—তাপস বলে জীবানন্দবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে, একটা কথা আজ তোমাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে রাখি—আমার সঙ্গে যদি সম্পর্ক রাখতে চাও তো তোমাদের বড় ছেলেকে ভুলতে হবে।

জীবানন্দবাবু কি যেন বলবার চেষ্টা করেন, আমি—

তাপস বলে, জানি আমার মত বড়বাবুও তোমার ছেলে—তার প্রতি স্নেহ দুর্বলতা তোমার থাকতে পারে—হয়তো আছেও কিন্তু অতবড় নীচতার সঙ্গে তোমরা আপোস করলেও আমি কিন্তু পারব না। যেদিন যে মুহূর্তে জানতে পারব ওর টাকায় এক কণা চালও এ বাড়িতে কেনা হয়েছে সেইদিনই সোজা এ বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাব।

কথাগুলো বলে তাপস আর দাঁড়ায় না। ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

আর জীবানন্দবাবু পাথরের মত বসে থাকেন আর পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকেন আনন্দময়ী।

॥ ১৯ ॥

তাপসের অনুমানটা যে খুব মিথ্যা তা নয়।

বাড়ি ছেড়ে যাবার পর প্রায় পাঁচটা মাস তপন বাড়ির দরজা মাড়ানো দূরে থাক—বোধ হয় একশত গজের মধ্যেও আসেনি।

আসবার ইচ্ছাও ছিল না, মনেও হয়নি এতদিন কথাটা।

বাড়ি ছেড়ে সেদিন চলে গিয়েছিল এক বস্ত্রে—কিছুই সঙ্গে করে এ-বাড়ি থেকে নিয়ে যায়নি।

তবে সে জানত না যে তার জিনিসপত্র তার ঘরে যেমন ছিল ঠিক তেমনি সেদিনও গোছানো সাজানো ছিল—কেউ এতটুকু স্পর্শ করেনি।

সে ঘরে তার যাবার পর থেকে এমন কি কেউ প্রবেশও করেনি।

আর সে যে সেদিন একেবারেই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে সেটাও বাড়ির লোকেরা সব বুঝতে পেরেছিল দুদিন পর্যন্ত সে বাড়িতে আর না ফেরায় আর আনন্দময়ীর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তাপস অফিসে ফোন করে জেনে।

ছেলেটা সেই যে গেল আর ফিরল না—ভাবনা হয় না মায়ের—

বাড়ি ছেড়ে যেদিন যায় তপন তার দুদিন আগেই তাদের বিবাহ হয়েছে।

রেজিস্ট্রি করেই বিয়ে হয়েছিল কারণ এক জাত নয় তারা।

সেদিন বাড়ির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এবং আর ফিরে আসবে না কোন-দিন স্থির করেই ট্যাক্সিতে চেপে একেবারে হালকা মনে যেন উড়ে গিয়ে বসেছিল অফিসের চেয়ারে।

তার নববধূ সুচিত্রা তখনও অফিসে এসে পৌঁছয়নি। হ্যাঁ, বিয়েটা ওদের দুদিন আগেই হয়ে গিয়েছিল কথাটা বলেনি বাড়িতে।

চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বেশ আরাম করে টানছে এমন সময় সুচিত্রা এসে ঢুকল অফিসে।

দুদিন আগে তপনই কয়েকটা দামী তাঁতের ও ঢাকাই শাড়ি সুচিত্রাকে নিয়ে মার্কেটে ঘুরে ঘুরে পছন্দ করে কিনে দিয়েছিল। তারই একটা হালকা রঙিন ঢাকাই শাড়ি পরনে।

হাতে তপনেরই কিনে দেওয়া একটা সৌখীন ব্যাগ—

তপন সুচিত্রাকে অফিসে ঢুকতে দেখতে পায়নি—সুচিত্রা পা টিপে টিপে নিঃশব্দে তপনের চেয়ারটার পিছনে এসে দাঁড়ায়।

অফিসের ঐ ঘরের অনেক কর্মচারীই তখনও এসে পৌঁছয়নি—একজন দুজন করে সবে আসতে শুরু করেছে মাত্র।

এই—

সুচিত্রা পিছন থেকে ডাকে—

তপন তাড়াতাড়ি ঘুরে তাকায়, তুমি—

হুঁ—

আশ্চর্য—দেখতেই পাইনি—

সে কি গো, এখনি দেখতে পাচ্ছ না—বিয়ে তো মাত্র দুদিন হয়েছে—সারা জীবনটাই যে এখনও সামনে পড়ে—

তপন সুচিত্রার সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলে, শোন—ওদিককার পাট সব চুকিয়ে দিয়ে এলাম—

সে কি! সুচিত্রা যেন চমকে ওঠে।

হ্যাঁ—যা আজ বাদে কাল করতেই হবে—চক্ষু লজ্জাটা সেখানে একটা মিথ্যে মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ছাড়া আর কি বল। তাছাড়া একদিক থেকে মনে হচ্ছে ভালই হল—

কি রকম? সুচিত্রা তপনের মুখের দিকে তাকায়।

আজই সোজা আমাদের বাসায় গিয়ে ওঠা যাবে—

সে কি—আজই?

হ্যাঁ আজই—

কিন্তু—সুচিত্রা কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারে না।

তপন শুধায়, আবার এর মধ্যে কিন্তু-র কি হল? অসুবিধে আছে নাকি কিছু?

না, তা নয়—

তবে—

কি তবে?

এখনও মা বাবাকে আমি কিছুই বলিনি—

সে কি—এখনও আমাদের বিয়ের কথাটা তাঁদের বলনি নাকি?

না।

সত্যি বলছ সুচি—আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা তোমার মা বাবাকে এখনও বলনি?

না। ভেবেছিলাম ধীরেসুস্থে বলব—

তার মানে?

দেখ একটা কথা তুমি জান না আর তোমাকে আমি বলিও নি, সংসারটা আজ আমারই এই যা মাইনে পাই অফিস থেকে সেই আয়ের ওপরই বলতে গেলে একপ্রকার দাঁড়িয়ে আছে—

বল কি! তাহলে—তোমার বাবা ভাই তারা কোন কাজই করে না নাকি?

কাজ না করার মতই—কারণ যা তারা করে—সামান্য কাজ। সামান্য মাইনে—

এ কথা এতদিন তুমি আমাকে বলনি কেন ?

পারিনি বলতে—

বলতে পারনি ? কেন ?

বলি বলি করেও পারিনি। লজ্জা করেছে।

লজ্জা করেছে ?

হ্যাঁ।

কেন ?

বলতে পারব না।

এ কি সমস্যায় তুমি আমাকে ফেললে সুচিত্রা ! তবে কি আমাদের নিজের বাড়িতে ওঠাই হবে না ?

তা কেন হবে না—

কেমন করে যে হবে আমি তো বুঝে উঠতে পারছি না।

আমার ছোট ভাই রতন বেহালায় যে বিস্কুটের কলটা আছে সেখানে সামান্য মাইনেয় চাকরি করে আর বাবাও—

তোমার বাবা –

একটা মুদির দোকানে হিসাব লিখে মাসে কিছু কিছু পান—

আর তোমার তিনটি বোন আছে ওরা—

তাদের মধ্যে সুমিত্রা বেশ ভাল থিয়েটার করতে পারে। অ্যামেচারে থিয়েটার করে মধ্যে মধ্যে মন্দ পায় না। বাকী দুজনও ছোট। দেখ বাড়ির কথা আমায় তুমি কখনও জিজ্ঞাসা করনি—আমিও বলিনি—

কথাটা কিন্তু তুমি সত্যি বললে না সুচিত্রা—

সত্যি বলিনি ! সুচিত্রা যেন একটু অবাক হয়েই তপনের মুখের দিকে তাকায়, মানে তুমি বলতে চাও—

হ্যাঁ—তিক্ত শোনালেও কথাটা—তোমার মনে নেই বা তুমি ভুলে গিয়েছো মনে হচ্ছে—আমাদের ঘনিষ্ঠতার পর একদিন রেস্টুরেন্টে বসে চা খেতে খেতে তুমি বলেছিলে—

কি বলেছিলাম ?

সংসারে তোমার মা-বাবা ও একটি ভাই ছাড়া আর কেউ নেই—এবং সে ভাই তোমার থেকে বড় এবং কোথায় নাকি ভাল চাকরিও করে একটা—

আমি—আমি তোমাকে এ-কথা বলেছিলাম ?

হ্যা, বলেছিলে। কিন্তু এখন থাক সে-সব কথা। অফিসের লোকজনেরা সব এসে গিয়েছে—তুমি তোমার সীটে যাও।

সুচিত্রা ঘরের অন্যপ্রান্তে তার জায়গায় যাচ্ছিল, তপন আবার ডাকে—শোন একটা কথা—

সুচিত্রা ফিরে দাঁড়ায়—

এ দু'দিন লক্ষ্য করিনি—কিন্তু আজ লক্ষ্য করলাম, তুমি তোমার সিঁথিতে সিঁদুর পর্যন্ত দাওনি, টিফিনের পর ছুটি নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে বেরুবে—যাও।

সুচিত্রা আর দাঁড়ায় না, চলে যায়।

সুচিত্রা তার সীটে এসে টাইপরাইটিং মেসিনটার সামনে বসে।

এতদিন সে মনে মনে ভেবেছে, তার সব কথা অকপটে তপনকে জানানো একান্ত প্রয়োজন—বিশেষ করে রেজিস্ট্রি করে বিয়েটা হয়ে যাবার পর থেকে গত দু'দিন ধরে কেবলই ঐ কথাটাই ভেবেছে আর চেপে রাখা উচিত হবে না কিন্তু ওর কাছ থেকে—ওর বাবা ভাই বিশেষ কিছু করে না—আরও তিনটি বোন আছে তার—

অথচ আশ্চর্য—সে যে কবে কখন সত্যটা গোপন করতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই খানিকটা মিথ্যাই বলেছে। মনেও নেই কিছু।

অথচ ভগবান জানেন—তা যদি করেও থাকে সে নেহাৎ একটা সুখের স্বপ্নে বিভোর হয়েই—স্বপ্নের ঘোরে করে বসেছে। প্রতারণা করবার জন্য নয় বা ইচ্ছে করে তপনকে সব না জানানো অনিচ্ছাকৃত হলেও—মানে তার সত্যিকারের অবস্থাটা না জানানোর জন্যও নয়—

আজ কিন্তু মনে হয় সুচিত্রার সত্যিই কি তাই, না, তপনকে পাবার লোভেই সে সেদিন রেস্টুরেন্টে বসে সত্যি কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারেনি হঠাৎ মিথ্যাটা মুখ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর—আর তাই হয়তো পরে মনেও ছিল না কথাটা সেদিন রেস্টুরেন্টে সে কি বলেছিল না বলেছিল—

কিন্তু এখন আর সে কথা ভেবে কি হবে—

হাতের তীর হাত থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

আজ আর কোন কিছু দিয়েই সেদিনকার সেই মিথ্যাটাকে চাপা দেওয়া যাবে না। হয়তো ইতিমধ্যে বিয়ের আগে কোন একদিন কৌশলে সমস্ত সত্যটুকু অকপটে প্রকাশ করে দিলে যার ক্ষমা মিললেও মিলতে পারত আজ আর তার আশা মাত্রও নেই—

কিন্তু আশ্চর্য—এতবড় কথাটা সে ভুলে ছিল কি করে—

তার চাইতেও বড় কথা, যখন দুজনে মিলে একটু একটু করে প্রত্যহ টালিগঞ্জের বাড়িটা সাজাচ্ছিল, তখন থেকেই কি তার বুকটা কাঁপতে শুরু করে নি—

কেবলই কি মনে হয়নি—সে বাড়ি থেকে চলে এলে সংসারটার অবস্থা কি হবে—

বাবা পান ত্রিশটা টাকা আর ভাই রতন পায় মাত্র পঁয়তাল্লিশটা টাকা, মাসে মাসে এই পঁচাত্তর টাকা দিয়ে আজকালকার দিনে ছটি প্রাণীর থাকা খাওয়া চলবে কি করে—

মাসিক পঁচিশ টাকা তো দেড়খানা ঘরেরই ভাড়া—

বাকী থাকবে মাত্র পঞ্চাশ—তাও পুরো মাইনেটা রতন কখনও সংসারে দেয় না—দেয় মাত্র ত্রিশটি টাকা—

তাহলে বাড়ি ভাড়া দিয়ে বাকী রইল মাত্র ঐ ত্রিশটি টাকাই—

সে পায় দুশো পাঁচ টাকা—সেই টাকাটাই যে সংসারের ভরসা সত্যিকারের সেটা কি সে জানে না!

তাছাড়া তার বাবা ভবানীবাবু—ক্রমশঃ চোখে ছানি পড়ছে—চোখে খুবই কম দেখছেন—তার উপর আছে নিত্য পেটের গোলমাল—

গাঁয়ে দেশে থাকতে ভবানীবাবু আগে নিত্য আফিং ও দুধ খেতেন, এখানে এই শহরে উদ্বাস্তু হয়ে এসে সে দুধটাই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পেটের রোগটা আর ছাড়ছেই না; যেন—দিন দিনই যেন ভবানীবাবু কাহিল হয়ে পড়ছেন।

দুদিন থেকেই সুচিত্রা ভাবছিল—বিয়েটা হয়ে গিয়েছে আর গোপনতা নয়, এবারে সব কথা অকপটে যত শীঘ্র সম্ভব তপনকে জানানো তার একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু বলি বলি করেও যেন বলতে পারছিল না।

কথা ছিল আগামী মাসের পয়লা রবিবার আছে, সেদিনই গিয়ে তারা তাদের নতুন বাড়িতে উঠবে—তার মধ্যে এখনও বারটা দিন আছে—একসময় সব কথা তপনকে বলবে—কিন্তু নির্মম সত্যটা যেন তারই মুখ দিয়ে কেমন করে বের হয়ে এল।

এখন আর ভেবে কি-ই বা হবে—যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে—

যা সত্য তা কখন আপনা হতেই প্রকাশ পেয়ে বসে আছে।

মাথাটার মধ্যে যেন কেমন ঝিম্ঝিম্ করতে থাকে—এদিকে টেবিলের উপরে একগাদা টাইপের কাজ পড়ে আছে।

ছোট সাহেব মিঃ সিংয়ের পার্সোন্যাল স্টেনো সে—তার হুকুমমত কাজ আজই শেষ করে দিতে হবে গতকাল যা শেষ করা হয়নি।

চিঠিগুলো অত্যন্ত জরুরী।

আর তপন।

তপনও যেন ঝিম মেরে বসেছিল চেয়ারটার উপরে।

সুচিত্রার পিছনে এত বড় একটা দারিদ্র্য ও অভাবের হাঁ যে মুখব্যাদান করে আছে তা তো সে কল্পনাও করতে পারেনি।

কোথায় ভেবেছিল তার ভাই যখন ভাল চাকরি একটা করে তখন সেই-ই সব কিছু ম্যানেজ করতে পারবে কিন্তু এখন এসব কি শুনছে!

ভাই রতন সামান্য মাইনের চাকরি করে বিস্কুট কলে—আরও তিনটি বোন আছে তার—তার স্পষ্ট অর্থ—সুচিত্রাই সংসারে তাদের একমাত্র ভরসা।

যে দারিদ্র্য থেকে সে সরে আসতে চেয়েছিল এবং যে দারিদ্র্যকে সে ভুলতে চেয়েছিল সেই দারিদ্র্যই তাহলে তার পশ্চাতে পশ্চাতে আবার রাক্ষসের মত হাঁ করে ছুটে আসছে!

সেই দারিদ্র্যের কুশ্রীতা—সেই অভাবের লজ্জা—সেই আপোসের দীনতা!

তা থেকে তপন তা হলে রেহাই পাবে না!

আর পাবেই বা কি করে—সুচিত্রাই যখন তাদের সংসারের একমাত্র সম্বল সাত্যি-কারের সহায় তখন তার সংসার কি তাকে রেহাই দেবে ?

তার প্রয়োজনের হাত বাড়িয়েই থাকবে ওদের দুজনের মাঝখানে।

অর্থাৎ ও যে ভেবেছিল অতঃপর দুজনের উপার্জনে একটা সুস্থ-সুন্দর প্রাচুর্যের না হলেও স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন গড়ে তুলবে সেটা তাহলে আকাশকুসুমই থেকে যাবে।

কিন্তু এখন আর ভেবেই বা কি হবে ?

বিয়ে যখন হয়ে গিয়েছে—বাড়ি ভাড়াও নেওয়া হয়ে গিয়েছে এবং বাড়ির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক সে যখন ছিন্ন করে চলেই এসেছে তখন আজ এগিয়ে তাকে যেতেই হবে।

ঐ টালীগঞ্জের ভাড়া বাড়িতেই গিয়ে তাকে উঠতে হবে এবং সব কিছুর সঙ্গে তাকে আপোসও করে নিতে হবে।

উপায় নেই—উপায় নেই।

কিছু আর যেন ভাল লাগে না তপনের।

সকালবেলা বাড়ি থেকে বের হয়ে যে আনন্দের সুরটা সমস্ত মন জুড়ে বেজে উঠে-ছিল সে সুরটা যেন হঠাৎ কেটে গিয়েছে।

বাঁধা সেতারের তার যেন অকস্মাৎ ছিঁড়ে গিয়েছে।

সুন্দর একটা স্বপ্ন যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে মিলিয়ে গিয়েছে শূন্যে।

এই দু মাস ধরে বাড়ি ভাড়া নেওয়ার পর থেকে একটু একটু করে বাড়িটা মনের মত করে প্রতি সন্ধ্যায় সাজাতে সাজাতে যে আনন্দ মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছিল —সে আনন্দ যেন অকস্মাৎ শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে।

এ কি হল—এ কি হল !

॥ ২০ ॥

টিফিনের সময়ই দুজনে বের হয়ে পড়ল অফিস থেকে।

প্রতিদিন টিফিনের সময় যে রেস্তোরাঁটায় গিয়ে ওরা বসত সেই রেস্তোরাঁয় গিয়েই ঢুকল আজও ওরা।

নির্জন একটা কিউবিক্যালে গিয়ে বসল।

খাওয়ার ইচ্ছা আজ দুজনের কারোরই ছিল না। তবু এক কাপ করে চায়ের অর্ডার ও টোস্টের অর্ডার দিল দুজনের জন্য তপন।

দুজনে মুখোমুখি বসে চুপচাপ।

কারও মুখে কোন কথা নেই।

একটু পরে বেয়ারা চা ও টোস্ট সামনে ওদের প্লেট নামিয়ে রেখে যায়।

কিন্তু ওরা দুজনের একজনও সে সব স্পর্শ করে না।

টোস্ট জুড়িয়ে যেতে থাকে আর চা ঠান্ডা জল হয়ে যেতে থাকে।

তপন একটা সিগারেট ধরায়।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলে, তাহলে এখন কি করবে ঠিক করলে ?

সুচিত্রা কোন জবাব দেয় না সে কথার—মাথা নীচু করে বসে থাকে।

দেখ সুচিত্রা—

তপনের গলার স্বরে হঠাৎ যেন চমকে ওঠে সুচিত্রা—মুখ তুলে তাকায় সঙ্গে সঙ্গে সুচিত্রা তপনের দিকে।

তপন বলে, আমি সোজা স্পষ্ট কথার মানুষ—চক্ষুলজ্জা ব্যাপারটা আমার কাছে একটা দুর্বলতা ছাড়া কিছুই নয়—কাজেই স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবেই আমার মনে হয় এর-পর এখন আমাদের পরস্পরের কাছে যা বলবার আছে পরস্পরের বলে নেওয়াই উচিত।

তপন—আমি অন্যায় করেছি আমার সত্যিকারের অবস্থাটা এতদিন গোপন রেখে —বিশ্বাস করবে কিনা জানি না আজ—তবে বিশ্বাস কর—বলবার আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি—বলতে বলতে গলার স্বরটা কান্নায় যেন জড়িয়ে আসে সুচিত্রার।

চোখের কোল দুটো ছলছল করে ওঠে।

তপন চুপ করে তাকিয়ে থাকে সুচিত্রার মুখের দিকে।

মুখটা তার গম্ভীর কঠিন।

সুচিত্রা বলে, বিশ্বাস কর ইচ্ছে করে কোন মিথ্যার বা প্রতারণার আশ্রয় তোমার কাছে আমি নিইনি—যা ঘটে গিয়েছে তা সত্যিই আমি ভুলে গিয়েছিলাম কবে কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে তোমাকে কি বলেছি না বলেছি—

বললাম তো ওসব কথা থাক সুচিত্রা—let us come to practical points—এখন আমি বুঝতে পারছি—তোমাদের পরিবারের অনেকগুলো লোক তোমার রোজ-গারের দিকেই মুখ চেয়ে আছে—আগে ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলে কি হত বলতে পারি না তবে এখন বিয়ে যখন হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই তোমাকে জান আমি অস্বীকার করব না—করতে পারব না ইচ্ছে থাকলেও—

তপন—একটা অস্ফুট আর্ত চিৎকার যেন বের হয়ে আসে সুচিত্রার কণ্ঠ থেকে।

তপন বলে, আমার চরিত্রে যত দোষই থাক না কেন—অতখানি নীচতার আশ্রয় নিশ্চয়ই আমি নেব না আর নিতেও পারব না কোন দিন—তবে এও ঠিক—যেজন্য আজ আমি আমার বাড়ি ঘরদোর সব ছেড়ে এলাম সেই দারিদ্র্য ও অভাবের কুশ্রীতাকেও আমি আমার ঘরে ছায়া ফেলতে দেব না!

তপন—

হ্যাঁ সুচিত্রা—আমি স্পষ্ট করেই বলছি—আমাকে নিয়ে যদি তুমি শান্তিতে ঘর করতে চাও তোমার পিছনের সংসার ও সব কিছু তোমাকে ছাড়তে হবে, ভুলতে হবে —দারিদ্র্য আর অভাব—অসাচ্ছল্যকে আমি ঘৃণা করি—জীবনের একটা কুৎসিত ঘা বলে মানুষের মনে করি—তাই চিরদিন আমি আমার আয় যদি সামান্যও হয় সেই আয়েই সুন্দর—স্বচ্ছলভাবে—নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করতে চেয়েছি।

সুচিত্রা পাথরের মতই যেন বসে থাকে।

বোবা একেবারে।

তপন বলতে থাকে, ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়ে সেই জীবনই গড়ে তুলব—দুজনে আমরা যা ইনকাম করব আমাদের দুজনের পক্ষে সেটা এতটুকু অপ্রতুল হবে না—কিন্তু—

তপন—আত্মীয়স্বজনকে বাদ দিয়ে যে জীবন!

বললাম তো—তোমাদের ফিলসফির সঙ্গে আমার জীবনের ফিলসফি মিলবে না—এখন তুমি কি করবে বল—আমি আজই যাব টালীগঞ্জের বাড়িতে। তুমি যাবে, না যাবে না?

যাব—আমি কি বলেছি যাব না।

যাব নয়—আমি জানতে চাই কখন যাবে—আজ কাল না পরশু?

আজই যাব।

কিন্তু তোমার মা বাবা!

তাদের আজই সব জানাব।

তবে তাই কর—আমি অফিস থেকে আজ ছুটি নিয়েই এসেছি। আমি আজ আর ফিরে যাব না। এখুনি চল আমার সঙ্গে তোমাদের বাড়িতে।

এখুনি।

হাঁ—আর দেরি নয়—এখুনি সব কিছুর মীমাংসা আমি করে নিতে চাই। যদি তোমার কথাটা বলবার বা জানাবার অসুবিধা থাকে—আমিই তোমার মা বাবাকে বলব—সুচিত্রাকে আমি বিয়ে করেছি—আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমি চললাম আমার ঘরে।

না, না,—যা বলবার আমিই বলব—তোমাকে কিছু বলতে হবে না—

বেশ—তুমি যদি পার তো—তুমিই বলো—আমি না হয় বাইরে ট্যাক্সিতে বসে বসে অপেক্ষা করব। তাহলে আর দেরি কেন—চল—ওঠ।

তপন বেল বাজায়—রেস্তোরাঁর বেয়ারা এসে কিউবিক্যালটার মধ্যে ঢোকে।

তাকে বিল আনতে বলে তপন।

বেয়ারা বিল নিয়ে এলে—বিল মিটিয়ে দিয়ে তপন উঠে দাঁড়ায়।

বাইরে বের হয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি হাত-ইশারায় দাঁড় করিয়ে তাতে উঠে বসে বলে, বল কোন্ দিকে যেতে হবে।

বেহালায়।

মৃদু কণ্ঠে সুচিত্রা জবাব দেয়।

তপন ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বেহালার দিকে গাড়ি চালাতে নির্দেশ দেয়।

শীতের ছোট বেলা—বেলা সোয়া তিনটে কি সাড়ে তিনটে তখন—ইতিমধ্যে সূর্য অনেকটা পশ্চিমে হেলে পড়ায় সূর্যের আলোও কমে এসেছিল।

দুজনে চুপচাপ ট্যাক্সির মধ্যে পাশাপাশি বসে থাকে।

মাঝেরহাটের ব্রিজটা ক্রস্ করবার পর তপন শুধায়, কোন্ দিকে যেতে হবে?

আরও – অনেকটা।

সত্যিই অনেকটা পথ—একেবারে ভিতরের দিকে—পাড়াগাঁয়ের মত জায়গাটা।

ট্যাক্সি সেখানে যাবে না—সুচিত্রা তপনকে ট্যাক্সিতে বসতে বলে নেমে গেল।

তপন একটা সিগারেট ধরায়।

বেশী দেরি করে না সুচিত্রা—আধঘন্টা বাদেই ফিরে আসে হাতে একটা ছোট সুটকেস ঝুলিয়ে—গাড়িতে উঠে বসে নিঃশব্দে।

তপন ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে এবারে টালীগঞ্জের দিকে ট্যাক্সি চালাতে বলে।

বলে এসেছ তো?

হ্যাঁ—মৃদুকণ্ঠে সুচিত্রা বলে।

তোমার বাবা বাড়িতে ছিলেন?

না—এখনও ফেরেননি—ফিরতে তাঁর আটটা-নটা হয়ে যায়—

তবে কাকে বলে এলে?

মাকে।

আর কেউ সেখানে ছিল?

না।

কেন তোমার বোনেরা—তোমার ভাই?

কেউ বাড়িতে নেই।

তোমার নিজের জিনিসপত্র যা ছিল সেখানে নিশ্চয়ই সব নিয়ে এসেছ? কথাটা বলে পার্শ্বে উপবিষ্ট সুচিত্রার দিকে তাকাল তপন।

সুচিত্রা কোন জবাব দেয় না।

তপন বলে, অবিশ্যি তোমার জামাকাপড়ের কথা আমি বলছি না—ওখানকার জামাকাপড় কিছুই তোমার প্রয়োজন হবে না—যা কিনে আমাদের নতুন বাসার আলমারীতে তুমি সাজিয়ে রেখেছ তাতে যদি না হয় তো আরও না হয় কেনা যাবে। আমিও বাড়ির জিনিস কিছু আনিনি সঙ্গে। পিছনের দিকে আর আমি ফিরে তাকাইনি। তুমিও তাকাবে না এই আমার ইচ্ছে—সম্পূর্ণ নতুন করেই আমাদের জীবন আরম্ভ হোক এই আমি চাই।

সুচিত্রা যেমন চুপ করে ছিল তেমনই পূর্ববৎ চুপ করে থাকে।

সম্পূর্ণ মিথ্যে বলেছে সে তপনের কাছে!

মা বাবা ও দুই বোন বাড়িতেই ছিল।

বাবার শরীরটা কটা দিন থেকে খারাপ যাচ্ছে বলে কাজে বেরুতে পারেননি।

মা বাবাকে সে বলে এসেছে অফিসের বিশেষ একটা কাজে দিন কয়েকের জন্য কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে।

ভবানীবাবু ঘরের এক কোণে একটা ছেঁড়া ময়লা বহুদিনকার পুরোনো আলো-

ম্লান গায়ে জড়িয়ে বসেছিলেন—শুধান, সে কি রে, কলকাতার বাইরে কেন আবার !

সুচিত্রা বলে, অফিসের একটা নতুন ব্রাঞ্চ আসানসোলের ওদিকে খোলা হবে—সেই ব্রাঞ্চে কদিন গিয়ে কাজ করে আসতে হবে—আর এখন থেকে হয়ত মধ্যে মধ্যে যেতেও হবে।

মধ্যে মধ্যে যেতে হবে ?

হ্যাঁ—সাহেব তো তাই বলছিল—মৃদুকণ্ঠে সুচিত্রা বলে।

কবে ফিরবি মা ? মা অন্নপূর্ণা শুধান।

ঠিক করে বলতে পারছি না মা। জবাব দেয় সুচিত্রা—একটু থেমে ইতস্ততঃ করে।

ছোট বোন মালতীও জিজ্ঞাসা করছিল, কবে ফিরবি দিদি ?

শীঘ্রই ফিরব ভাই।

ঐ ছোট বোনটি বরাবর সুচিত্রার নেওটা—ও জন্মাবার পর থেকেই অন্নপূর্ণার শরীরটা খারাপ। কাজেই সুচিত্রাকেই ওর লালন-পালনের ভারটা একপ্রকার নিজের কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল।

যতক্ষণ সুচিত্রা বাড়িতে থাকে ততক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

একমুহূর্ত কাছছাড়া হয় না—হতে চায় না।

রাত্রে সুচিত্রার সঙ্গে শুয়ে তাকে বাদুড়ের মত দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে না পারলে এখনও মালতীর ঘুম হয় না।

কেবল মালতীই বা কেন—সুচিত্রারই কি ওকে নিয়ে বুকের মধ্যে আঁকড়ে না শুলে ঘুম আসে ! ও ঘুমোতে পারে ?

যতক্ষণ দেখা যায় মালতী দরজাটার সামনে দাঁড়িয়েছিল পথের দিকে চেয়ে।

শেষে পুকুরপাড়ের সেই ভাঙা শিবমন্দিরটার কাছে বাঁক নেওয়ার পর আর দেখা যায়নি।

ফাঁকি দিয়ে এসেছে সকলকে—মিথ্যে বলে এসেছে সকলকে।

বিয়ের কথাটা কিছুতেই বলতে পারল না সুচিত্রা তার মা-বাবাকে।

কোনমতেই যেন মুখ থেকে ওর কথাটা বেরুল না।

কিন্তু তা তো তপন শুনবে না !

বুঝতেও হয়তো চাইবে না। এবং তপনের কথা মনে হতেই তাড়াতাড়ি ভাঙা শিবমন্দিরের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়।

হাতের সুটকেস থেকে সিঁদুর কৌটাটা বের করে নিজে নিজেই সিঁথিতে সিঁদুর এঁকে দিয়ে মনে মনে বলে, অপরাধ নিও না দেবতা—স্বামীর মঙ্গলের জন্য এবং আমার যারা আপনার জন তাদের সবাকার মঙ্গলের জন্য এই গোপনতা—এই মিথ্যাটুকুর আশ্রয় নেওয়া ছাড়া যে আমার আর অন্য কোন উপায় ছিল না, অন্তর্যামী তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে।

সিঁদুর পরে মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে সুটকেসটা হাতে হনহন করে এগিয়ে যায় বড় রাস্তার দিকে।

তপন ট্যাক্সিতে বসে তারই অপেক্ষা করছে।

॥ ২১ ॥

কিন্তু মিথ্যাকে যে দীর্ঘদিন চাপা দিয়ে রাখা যায় না, কথাটা যেমন সুচিত্রা জানত না তেমনি জানত না তপনের আসল চরিত্রটা।

তপনের চরিত্রের যে সব চাইতে বড় দোষ ছিল সেটা হচ্ছে তার স্বার্থপরতা।

সংসারে যে নিজেকে ছাড়া যেমন কিছুই জানত না বা বুঝতে চাইত না, তেমনি সেই স্বার্থে এতটুকু আঘাত লাগলেও সে যেন একেবারে ক্ষেপে উঠত।

এবং সেখানে সে কাউকে ক্ষমা করতে পারত না।

জীবনে কখনও আজ পর্যন্ত সে কাউকে সেখানে ক্ষমা করেওনি।

সুচিত্রা তপনকে ভাল বেসেছিল সত্যি এবং ভেবেছিল সংসারের আর দশজন ভাল মন্দ দোষ ত্রুটি নিয়ে যেমন মানুষ তপনও তাদেরই একজন।

তাছাড়া স্বামী পুত্র নিয়ে নিজের একটি সংসার পাতবার কল্পনা সংসারের আর দশটি মেয়ের মতই তারও ছিল।

অথচ দেখতে সে কুৎসিত, সুন্দর নয়—উদ্বাস্তু দরিদ্রঘরের মেয়ে, কাজেই শেষোক্ত ঐ সাধটি যে কোনদিন তার পূরণ হবে বা হতে পারে এ বুঝি সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

কিন্তু অকস্মাৎ তপন এল তার জীবনে একদিন।

বসন্তের মৃদু বায়ুহিল্লোল যেন তার কিশলয়ের বার্তাটি পৌঁছে দিয়ে গেল মনের গভীরে, মনে হল সেও তো একটি মেয়ে!

সেও মনে মনে কোন একটি পুরুষের ভালবাসা চায়—স্বামী চায়—সংসার চায়—পুত্র-পরিজন চায়।

সুখের—আনন্দের একটি নীড়।

আর তপন! তখন তার ভরা যৌবন!

কোনদিন সে ইতিপূর্বে কোন বয়সের মেয়ের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পায়নি।

একটি বয়সের ছেলে ও মেয়ের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও নিকট সাহচর্যের মধ্যে যে একটা মাদকতা আছে—কামের একটা রোমাঞ্চ আছে সেটা সুচিত্রার সঙ্গে মেশবার পূর্বে কোনদিন তখন জানতে পারেনি বা জানবার সুযোগও তার হয়নি।

তাই সুচিত্রা যখন ক্রমশঃ তার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে, তখন সুচিত্রার বাইরের রূপের চাইতে সেটা তার হয়তো কিছুই ছিল না—তার বয়সের দেহভরা নিটোল যৌবনের আকর্ষণটাই তাকে যেন কি এক অন্ধ আবেগে বিহ্বল করে তুলেছে।

সুচিত্রার রং কালো, মুখে বসন্তের দাগ সত্যি কিন্তু দেহের গঠনে একটা সুষমা

—একটা লাবণ্য ছিল।

তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ থেকে যেন লাবণ্যের একটা আভা বিচ্ছুরিত হত। তার বসায় চলায়—দাঁড়ানোয়—কথায়বার্তায়—হাসিতে।

সংসারে এক-একটি মেয়ে আছে, দেখতে মুখখানা কালো-কুৎসিত হলেও অঙ্গে অঙ্গে আলগা আলগা একটা লাবণ্য ও সুষমা যেন প্রতি মুহূর্তে ছলকে ছলকে ওঠে। এবং সে লাবণ্য—সে সুষমা পুরুষের চোখে আনে অস্থির বিহ্বলতা একটা।

এবং সেক্ষেত্রে বাইরের রূপটা যেন গৌণ হয়ে যায়।

সুচিত্রা ছিল সেই শ্রেণীর মেয়ে।

তাছাড়া তার মধ্যে ছিল মুহূর্তে মানুষকে আপন করে নেওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা।

তপন তাই খুব অল্পেতেই মুগ্ধ হয়েছিল সুচিত্রার প্রতি অল্পদিনেই এবং ঘনিষ্ঠতাটাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে দুজনের মধ্যে।

ঘনিষ্ঠতার পরেই তাদের জীবনে স্বাভাবিক যে প্রশ্নটা—সেই বিবাহের কথাটা ওঠে —সানন্দে তারা পরস্পর পরস্পরকে কাছে টেনে নেয়।

মনে মনে একে অন্যকে গ্রহণ করে।

কিন্তু প্রথম দিকে যখন সুচিত্রা সবে বুঝতে পেরেছে তপন আকৃষ্ট হয়েছে তার প্রতি—তখন তো সে তপনকে ঠিক চিনতে পারেনি।

খণ্ডাংশের পরিচয়ই মাত্র পেয়েছে সে তখন—পূর্ণ মানুষটাকে তখনও চিনতে পারেনি। সেদিন প্রথম বুঝতে পারল তপন একদিক দিয়ে কি প্রচণ্ড স্বার্থপর এবং সেই স্বার্থের জন্য আপনতম জনকেও বর্জন করতে তার এতটুকু কুণ্ঠা নেই।

সুচিত্রা হঠাৎ যেন কেমন ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে যায়।

কিন্তু ফেরবার তখন তার কোন উপায় নেই।

তপনকে তখন আর সে ছাড়তে পারে না।

তপন তখন তার জীবনে অপরিহার্য।

তা সত্ত্বেও সে মনে মনে ভেবেছে—মানুষ কি আপোস করে না—যত বড় স্বার্থপরই হোক না কেন আপোস তাকে করতেই হয়।

করেও!

কিন্তু আজ অফিসে আসবার পর তপনের স্পষ্ট কথাবার্তাগুলো শোনা অবধি সুচিত্রার বুকের ভিতরটা যেন কি এক অজ্ঞাত ভয়ে হিম হয়ে যায়।

এ তো সে মানুষ নয়!

এ স্বার্থপরতার তো কোন দ্বিতীয় উদাহরণ নেই!

আর যেই আপোস করুক না কেন, তপন করবে না কথাটা যেন নিঃসন্দেহেই বুঝতে পারে সুচিত্রা।

তপনের ঐ হিংস্র কঠিন স্বার্থপর রূপটা যেন সুচিত্রার সমস্ত আনন্দ ও ভরসাকে চুরমার করে দিয়ে তাকে একটা গভীর অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিক্ষেপ করে।

দুজনে এসে তাদেরই নিজের হাতে সাজানো-গোছানো টালীগঞ্জের ছোট্ট বাসাটিতে যখন ট্যাক্সি থেকে নেমে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে প্রবেশ করল, শীতের শেষ রৌদ্রের ম্লান আভাটুকু তখন ধরণীর বুক থেকে মুছে যেতে চলেছে প্রায়।

সব গোছানো—সব সাজানো ছিল।

শুধু ঘরে প্রবেশ করে বাস করা।

প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহারের জামাকাপড় পর্যন্ত সব আলনায় আলমারীতে গোছানো—সাজানো।

তপন অফিসের পোশাকটা খুলে একটা পায়জামা ও সার্ট পরে একটা ইজিচেয়ারের উপর গা এলিয়ে দিয়ে বলে—একটু চা তৈরী কর তো সু।

সু।

অনেকক্ষণ পরে আদরের ডাকটি ডাকে তপন।

এতক্ষণ সে সুচিত্রা বলেই কথা বলছিল—এই প্রথম আজ আবার 'সু' বলে ডাকল।

বিবাহের পরে সেইদিনই তাদের প্রথম মিলনরাত্রি।

নারী-পুরুষের জীবনে সে রাতটির একটা মাদকতা আছে—পরবর্তীকালে সারা জীবনের চিহ্নিত ঐ রাতটি যেন বুকের মধ্যে অক্ষর হয়ে থাকে।

পুরুষ ও নারী ঐ রাত্রে নির্লজ্জ—উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

তপনের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হল না—কিন্তু সুচিত্রা যেন স্বামীর সব কিছুতে সাড়া দিয়ে গেল মাত্র।

স্বামীর মত উচ্ছ্বসিত হতে পারল না।

প্রাণহীন একটা কলের সাজানো পুতুলের মত সে নড়ল-চড়ল, কথা বলল, হাসল, আলিঙ্গন করল—এমন কি তপনকে চুমো খেল পর্যন্ত।

অথচ তপন কিছুই তার বুঝতে পারল না।

বুঝতে পারল না সে রাত্রে আলিঙ্গনাবদ্ধ ঐ নারীর দেহটাই তাকে শুধু তুলে দিয়েছে, মন তার এক অন্ধকার বিবরে আত্মগোপন করেছে।

ক্লান্ত অবসন্ন তপন একসময় ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু সুচিত্রার চোখে ঘুম এল না।

অন্ধকারে সে একই শয্যায় স্বামীর পাশে চোখ বুজে পড়ে রইল।

আর তার চোখের উপর ভেসে বেড়াতে লাগল মা বাবার অসহায় দুটো মুখ!

ভবানীবাবু ও অন্নপূর্ণা দেবীর মুখ দুটো।

একমাত্র ছেলে তার ঠিক পরেরই ভাই রতন লেখাপড়া শিখল না—তারপর এল তারা দেশ বিভাগের ফলে বাস্তুহারা হয়ে ভাসতে ভাসতে বিরাট এই কলকাতা শহরে।

ভাগ্যে সুচিত্রা ইণ্টারমিডিয়েটটা পাশ করে টাইপরাইটিং শর্টহ্যান্ডটা শিখে নিয়েছিল—একটা চাকরি পেয়ে গেল অফিসে মাসচারেক ঘোরাঘুরি করবার পর!

চাকরিটা পাওয়ার আগে তিন-তিনটে বছর কি দুঃসহ ক্লেশে ও অভাবের মধ্যে দিয়েই না ওদের গিয়েছে।

সুচিত্রার চাকরি পাওয়ার সংবাদে ভবানীবাবু কেঁদে ফেলেছিলেন।

স্ত্রীকে বলেছিলেন, ঐ আমাদের ছেলে রতনের মা—আর আমাদের উপোস করে মরতে হবে না।

সেই বাবাকে সে মিথ্যা কথা বলে এসেছে।

সত্যটা বলতে পারেনি—কারণ সে কি জানে না বিয়ে করে সে আজ বাড়ি থেকে চলে এলে আবার সেই দুর্যোগ মাথার উপর ঘনিয়ে আসবে ঐ পরিবারের!

রতন এতদিন বসেছিল, এই তো মাত্র মাস পাঁচেক হল বিস্কুটের কলে সামান্য চাকরিটা পেয়েছে।

আর ভবানীবাবু রাত্রে মুদির দোকানে খাতা লেখেন বটে, কিন্তু নিয়মিত কিছুই পান না—যা সামান্য পান তাও এক টাকা দু টাকা করে করে।

বাবাকে কতদিন ও বলেছে, ছেড়ে দাও বাবা চাকরি—কেন কষ্ট করছ ঐ সামান্য কটা টাকার জন্য!

কিন্তু ভবানীবাবু বলেছেন, না রে—এক দু'টাকা করে মধ্যে মধ্যে দিলেও তো কিছু দেয়, তুই একা আর কত করবি—সাধ-আহ্লাদ তো তোর কিছুই পুরলো না—যেমন বরাত করে এসেছিলি এই হতভাগ্যের ঘরে! কোথায় তোর বিয়ে-থা দেব, না একান্ত স্বার্থপরের মত তোরই রোজগারের টাকায় দু'বেলা জানোয়ারের মত পেট ভরাচ্ছি।

নাই বা বিয়ে হল বাবা—সুচিত্রা বলেছে, তাছাড়া বিয়ে করার আমার ইচ্ছেও নেই।

না রে মা, না—মেয়েদের বিয়ে না করলে এমন একটা বয়স আসে যখন তাদের দিকে কেউ তাকাবার থাকে না। সত্যিকারের আশ্বাস—আশ্রয় তারা কোথাও পায় না।

শুধু তাই নয়—

এমন কথাও ভবানীবাবু একদিন সুচিত্রাকে রাত্রে নিজের পাশে ডেকে বসিয়ে বলেছেন—

একটা কথা বলে রাখি মা।

কী বাবা!

আমার দ্বারা তো হল না—আর হবেও না কোনদিন—কিন্তু যদি কখনো এমন হয়—এমন তো শুনিও আজকাল আকছারই হয়—হচ্ছে—কোন ছেলের সঙ্গে তোর ভাবসাব হয়ে যায়—কোথায়ও—মানে বলছিলাম অফিসে তো অনেক ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে কাজ করিস।

বাবা!

অবাক বিস্ময়ে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে সুচিত্রা বাপের মুখের দিকে

তাকিয়েছিল—

ভবানীবাবু বলেছিলেন, হ্যাঁ মা, তোকে আমার বলা রইল—ভগবান যদি তেমন সুযোগ কোনদিন তোর জীবনে এনে দেন তো—সে সুযোগ হেলায় হারাস না, আমাকে অকপটে জানাস, আমি তোদের বিয়ে দিয়ে দেবো।

বাবা!

হ্যাঁ মা—আমার অভিশপ্ত সংসারে দাসখত লিখে দিয়ে তোকেও অভিশাপের বোঝা টেনে বেড়াতে দেব না, আমি চাই তুই সুখী হ মা—স্ত্রী হয়ে, পুত্রকন্যার জননী হয়ে একটি সুখের আনন্দের সংসার গড়ে তোল্।

সংস্কারে অন্ধ সেকেলে পণ্ডিত মানুষ তার বাপের মুখ থেকে যে অমন কথা কোনদিন উচ্চারিত হতে পারে এ যেন স্বপ্নেরও অতীত ছিল সুচিত্রার।

তখনও অবিশ্যি তপনের সঙ্গে তার আলাপও হয়নি।

তপনদের অফিসে তখনও সে কাজ করে না।

তার মাস আষ্টেক বাদে তপনদের অফিসে ভাল মাহিমা পেয়ে গিয়ে সে ঢোকে।

॥ ২২ ॥

তাপস সে রাত্রে সোজা বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসেছিল।

জামাকাপড় বদলাবার জন্য গিয়েছিল, তাও বদলানো হয়নি তার।

গাড়ি চালিয়ে সোজা হোটেলে ফিরে যায়।

বিষ্টু পাকড়াশীকে সে জানায়, সে প্রস্তুত।

বিষ্টু পাকড়াশী বলে অপেক্ষা করতে—রাত সাড়ে দশটার পর তাকে গাড়ি নিয়ে বেরুতে হবে।

হাতে ঘড়ি ছিল তাপসের।

দেখে তখনও সাড়ে দশটা বাজতে পাক্কা দু'ঘণ্টা দেরি।

হোটেলের পিছনে বিরাট কোর্টইয়ার্ড চত্বর—একপাশে হোটেলের চাকর ওয়েটার কুক্ ইত্যাদির থাকবার ব্যবস্থা—অন্যদিকে গ্যারেজের সেডের সঙ্গে লাগোয়া ড্রাইভারদের থাকবার ব্যবস্থা।

আনোয়ার তাপসকে একটা ঘর দেখিয়ে দিয়েছিল।

একটা নেয়ারের খাট আছে—তাতে বিছানাও পাতা—একটি টেবিল একটা টিনের চেয়ার ও মাঝারি সাইজের কাঠের আলমারী একটা।

ঘরের চাবিটা আনোয়ার তাপসকে দিয়ে দিয়েছিল।

বলেছিল, ঘরটা একা তোমারই ব্যবহারের জন্য, চাবি তোমার কাছেই রাখ।

সেই ঘরের মধ্যেই শয্যাটার উপর গা ঢেলে শুয়েছিল তাপস আলোটা নিভিয়ে।

রাত সাড়ে দশটা নয়, ডাক এল এগারটায়।

একজনকে শ্যামবাজার পৌঁছে দিতে হবে।

সে বিষ্টু পাকড়াশীর অনুচর পিয়ারীলালই সংবাদটা দিতে এসেছিল। সে বের হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ কে একজন যেন ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ে।

এবং আগন্তুক ঘরের মধ্যে ঢুকেই ঘরের দরজায় ভিতর থেকে খিল তুলে বন্ধ করে দেয়।

আগন্তুক জানত না এবং সন্দেহও করেনি ঘরের মধ্যে কেউ আছে।

ঘরের আলোয় তাপস শুধু দেখতে পায় এক তরুণী।

পায়জামা ও শালোয়ার পরিধানে—মাথায় একটা পাতলা ওড়না—তার উপরে একটা কালো শাল।

কে?

তাপসের গলার স্বরে চমকে তরুণী ফিরে তাকায়।

এবং পরক্ষণেই দুজনেই পরস্পর পরস্পরের দিকে যুগপৎ দৃষ্টিপাত করার সঙ্গে সঙ্গে যেন বোবা হয়ে যায়।

তরুণী বলে অস্ফুট কণ্ঠে, আ-আপনি!

চুমকী!

বাবুজী—আপনি?

জার্নাল সিংয়ের মেয়ে চুমকী।

কিন্তু সে এত রাত্রে এখানে কেন এই হোটেলে?

চুমকীর সারাটা শরীর তখনও কাঁপছে। চোখেমুখে একটা ভয়ের অস্ফুট ছাপ।

তুমি এখানে চুমকী? তাপস প্রশ্ন করে।

আমাকে—আমাকে বাপুজী জোর করে ধরে এখানে নিয়ে এসেছে—বলতে বলতে কেঁদে ফেলে চুমকী।

তাপসের বিস্ময়ের যেন শেষ নেই।

বলে, কে—সিংজী?

হ্যাঁ—আমার বাপুজীই।

চুমকীর কথাটা শেষ হয় না, বাইরে বন্ধ দরজার গায়ে করাঘাত পড়ে, পিয়ারীলালের কণ্ঠস্বর।

পিয়ারীলালের গলা শোনা যায়।

তাপোসবাবু—তাপোসবাবু।

মুহূর্তে তাপস অবস্থাটা বিবেচনা করে নেয়। লোকটা যে চুমকীর খোঁজেই ছুটে এসেছে তার ঘরে, বুঝতে দেরী লাগে না তাপসের।

তাপস তাড়াতাড়ি চুমকীকে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে এসে দরজাটা খুলে দেয়।

কে?

আমি পিয়ারীলাল।

কী ব্যাপার?

ম্যানেজারবাবু বলে দিলেন—আজ আর তোমায় শ্যামবাজারে বেরুতে হবে না, তুমি যেতে পার বাড়ি।

চলে যাব ?

হ্যাঁ। তবে বেলা দশটায় আসতে বলে দিয়েছে—ঠিক দশটায়।

কথাগুলো বলে পিয়ারীলাল আর দাঁড়াল না।

ফিরে গেল।

তাপস এতক্ষণ দুরু দুরু বক্ষে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল পিয়ারীলালের সঙ্গে।

পিয়ারীলাল চলে যেতে যেন ও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

যাক্—তাহলে চুমকীর খোঁজে পিয়ারীলাল আসেনি !

তাহলেও নিশ্চিন্ত হতে পারে না তাপস।

পুনরায় ঘরের দরজাটা বন্ধ করে মৃদুকণ্ঠে ডাকে, চুমকী ?

চুমকীর কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

চুমকী, বের হয়ে এস, কোন ভয় নেই—লোকটা চলে গিয়েছে।

হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এবারে চুমকী খাটের তলা থেকে বের হয়ে আসে।

চোখে মুখে ও চুলে ধুলো ও ঝুল লেগে রয়েছে।

সমস্ত মুখে একটা আতঙ্কের গভীর ছাপ।

চালা গিয়া বাবুজী !

হ্যাঁ।

কিন্তু আবার ওরা আসবে আমি জানি—নিশ্চয়ই জেনে ফেলেছে এতক্ষণে ওরা যে আমি পালিয়ে এসেছি—খুঁজতেও শুরু করেছে নিশ্চয়।

ভীরু কণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারণ করে চুমকী।

অসম্ভব কিছু নয়, চল তোমাকে আমি বাড়িতে পেঁছে দিয়ে আসি।

কিন্তু—

চুমকী যেন কেমন একটু ইতস্ততঃ করতে থাকে।

তাপস বলে, বাড়িতে তুমি যাবে না ?

তাছাড়া আর কোথায় যাব—তাই চলুন বাবুজী—একটা যেন চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কথাগুলো উচ্চারণ করে চুমকী।

চল।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে তাপস চুমকীকে নিয়ে তার ঘর থেকে বের হয়ে আসে।

অন্ধকার চত্বরটা।

চত্বরটা অতিক্রম করে পিছনের দরজা দিয়ে রাস্তায় এসে পড়ে।

কলকাতা শহরে রাত এগারটা রাতই নয়।

আলোকোজ্জ্বল নগরী তখন যেন মনে হয় সবে রূপের পসরা খুলে বসেছে।

চুমকীকে নিয়ে হোটেল থেকে কিছু দূরে এসে তাপস একটা ট্যাক্সি থামায়—তার-

পর চুমকীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, ওঠ।

চুমকী প্রথমে ওঠে—তার পিছনে উঠে বসে তাপস।

ড্রাইভার শুধায়, কোন্ দিকে যেতে হবে?

তাপস বলে, উল্টোডাঙা।

বাড়ির দরজা পর্যন্ত ট্যাক্সি যাবে না।

বড় রাস্তাতেই ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তাপস চুমকীকে নিয়ে বস্তির মধ্যে এসে ঢুকল।

বস্তির দু-একটা ঘরে তখনও আলো জ্বলছিল বটে, বেশীর ভাগই অন্ধকার।

বিশ্রী একটা ধোঁয়া সমস্ত বস্তিটার উপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

এতটুকু হাওয়া নেই—নিঃশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হয়।

ট্যাক্সিতে বসে বা ঘরের দরজায় পৌঁছনো পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে কোন কথা হয় নি। দুজনেই চুপ করে ছিল।

ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল—চুমকী তার কোমর থেকে চাবি বের করে দরজার তালা খুলল।

বসবার ঘরে ঢুকে চুমকী সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালাল।

সেদিনকার সেই ছিমছাম সাজানো বাইরের ঘরটা জার্নালি সিংয়ের।

সিংজী বুঝি কাজে গেছে? তাপস শুধায়।

জানি না বাপুজী কোথায় গিয়েছে—বলে চুপ করে থাকে চুমকী।

তাপসের একবার ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করে, অজন্তা হোটেলে কেন সে গিয়েছিল—কিন্তু আবার মনে হয় কাজ কি তার সে কথায়!

তাপস আরও ভাবে—সিংজী বাড়ীতে নেই, একা চুমকী—এ অবস্থায় এখানে আর না থাকাটাই এত রাত্রে ভাল।

তাপস বলে, আমি তাহলে যাই—

চুমকী তাপসের মুখের দিকে চেয়ে থাকে—কোন জবাব দেয় না।

তাপসের মনে হয় বুঝি চুমকী কিছু তাকে বলতে চায়, কিন্তু চুমকী মুখ খোলে না দেখে এবারে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

ঘুরে দাঁড়ায় তাপস।

দরজা বরাবর যেতেই পিছন থেকে চুমকীর ডাক আসে।

বাবুজী!

ফিরে দাঁড়ায় তাপস—

ওর মুখের দিকে তাকায়।

বাবুজী!

কিছু বলছিলে?

চলে যাচ্ছ বাবুজী?

হ্যাঁ। রাত হল, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

কিন্তু বাবুজী, তুমি তো কই জিজ্ঞাসা করলে না এত রাত্রে হোটেলে আমি কেন গিয়েছিলাম—কথাগুলো বলতে বলতে তাপসের মনে হয় যেন গলার স্বরটা ওর কান্নায় জড়িয়ে আসছে।

তাপস চুমকীর মুখের দিকে তাকাল।

॥ ২৩ ॥

তুমি নিশ্চয়ই একটা কিছু আন্দাজ করে নিয়েছ আমার সম্পর্কে বাবুজী—সেটা কি আমি বুঝতে পারছি না, পারছি।

পূর্ববৎ কান্নাঝরা সুরে কথাগুলো বলে চুমকী।

তাপস ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে, কি আন্দাজ করেছি ?

কেন—আমি কি চরিত্রের মেয়ে—বলতে বলতে হঠাৎ যেন ভেঙে পড়ে চুমকী দণ্ডায়মান তাপসের পায়ের কাছে।

ভেঙে পড়ে কান্নাজড়ানো কণ্ঠে বলে, আমাকে তুমি বাঁচাতে পার না বাবুজী। এই নরকের যন্ত্রণা থেকে পার না তুমি আমাকে বাঁচাতে !

তাপসের পায়ের সামনে বসে ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে আছে চুমকী, তার দু'চোখের কোল বেয়ে অজস্র ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে।

তাপস হঠাৎ যেন কেমন বিহ্বল বিব্রত বোধ করে নিজেকে।

কি করবে—কি বলবে চুমকীকে বুঝে উঠতে পারে না।

চুমকী আবার বলে, তুমি কি বিশ্বাস করতে পারবে বাবুজী—আমার নিজের বাপ টাকার জন্য আমাকে—তার নিজের বেটিকে এমনি করে।

তাপস যেন চমকে ওঠে।

বলে. কি বলছ তুমি !

যা বলছি তার একবর্ণও মিথ্যা নয় বাবুজী। মাঝরাতে আমার ঘরেই লোক নিয়ে এসে ঢুকিয়ে দেয়—তারপর নিজে দরজায় পাহারায় বসে থাকে একটা চামড়ার চাবুক হাতে নিয়ে।

বল কি !

হ্যাঁ—প্রথম প্রথম আমি বিদ্রোহ করেছি—কিন্তু দেখবে বাবুজী—দেখবে নিজের বাপ তার বেটিকে কিভাবে প্রহার করেছে—বলতে বলতে উপরের কামিজের বোতামগুলো পটপট করে ছিঁড়ে ফেলে—দেহের সমস্ত ঊর্ধ্বাংশটা প্রায় তাপসের চোখের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়।

লম্বা লম্বা কালসিটের দাগ—প্রহারের ফলে রক্ত জমে বুকে পিঠে কালো হয়ে আছে ; চুমকীর নিটোল পরিপুষ্ট দেহটায় যেন কোন হিংস্র সরীসৃপ বিষাক্ত জিহ্বায় নির্মমভাবে চেটে কালো কালো দাগ ফেলেছে।

চুমকী বলতে থাকে, প্রতিবাদ করেছি, তার জন্য চাবুক মেরে মেরে আমায় অজ্ঞান করে দিয়েছে, তারপর পশুগুলোকে আমার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে আমার ঘরের বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়েছে।

তাপস যেন পাথর। এমন একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার যে ঘটতে পারে এ যে তার কল্পনারও অতীত।

কোন শব্দ পর্যন্ত তার মুখ থেকে বের হয় না।

চুমকী বলে, তারপর আর প্রতিবাদ করিনি। আর বিদ্রোহ করিনি। অসহায়ের মত পশুগুলোর হাতে রাতের পর রাত নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি। হয়তো তুমি বলবে বাবুজী একজন মেয়েমানুষ হয়ে এতবড় লজ্জা আর অপমান রাতের পর রাত কেমন করে সহ্য করেছি—কেনই বা করেছি, আত্মহত্যা করেও তো এ থেকে মুক্তি পেতে পারতাম—কিন্তু বাবুজী, মরতে আমার ভীষণ ভয়—নিজে থেকে একটা মানুষ কি করে নিজেকে শেষ করে দেয় ভাবতে পারিনি কোনদিন—তবু—তবু আমি চেষ্টা করেছি।

সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

বোবা পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাপস আর তার সামনে মেঝেতে বসে চুমকী, পরনে কেবল পায়জামা ও বুকের কাঁচুলীটা ছাড়া পরিধেয় কামিজটা দু টুকরো হয়ে দু'পাশে ঝুলছে।

যৌবনপুষ্ট দেহটা প্রায় উলঙ্গও বললে চলে। উর্ধ্বাংশটা।

একবার গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দড়ি ছিঁড়ে পড়ে গিয়ে হাঁটুতে ও মাথায় ব্যথা পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাই—বেকায়দায় এমন মাথায় লেগেছিল এখনও মাঝে মাঝে মাথাটা টনটন করে। আর একবার আফিং নিয়ে এসে খেয়েছিলাম, সেবারেও বাপুজী আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে তোলে। দু-দুবার চেষ্টা করেও যখন মরতে পারলাম না—উপরন্তু লাঞ্ছিত হলাম চরমভাবে, বুঝলাম একলিঙ্গজী আমার কপালে মৃত্যু এত সহজে লেখেননি—এমনি অপমান আর লজ্জার বোঝাই আমাকে যতদিন বেঁচে থাকব টেনে বেড়াতে হবে। তাছাড়া বাবুজী—আমি মরলে বাপুজীর কথা সব প্রকাশ হয়ে পড়বে।

বাপুজী—সিংজির কথা !

হ্যাঁ—নাদোয়ারা থেকে আমরা যে পালিয়ে এসেছি—

পালিয়ে এসেছ !

হ্যাঁ। আমার মাকে এক রাত্রে খুন করে বাপুজী দশ বছরের আমাকে নিয়ে এই বাংলা মুলুকে পালিয়ে আসে।

জার্নাল সিং !

ওর আসল নাম জার্নাল সিং নয়—

তবে কি ওর নাম ?

মাহীন্দর সিং—

কিন্তু ও যে বলে গিহেল্লাট বংশে ওর জন্ম—

মিথ্যে কথা। ওর কুমপাবৎ—প্রথমে ছিল যোধপুরে—তারপর নাদোয়াতে গিয়ে বসবাস করে, সেখানেই আমার মায়ের সঙ্গে ওর পরিচয়—আমার মা ছিল শিশোদীয় বংশের মেয়ে। একজন সব জানে—ওর কথা সব জানে—

কে?

অভয় সিং—সে তাই মধ্যে মধ্যে আসে বাপুজীর কাছে টাকার জন্যে—

টাকার জন্যে?

হ্যাঁ, টাকা না দিলে নাকি সে সব সত্যি কথা পুলিশকে জানিয়ে দিয়ে বাপুজীকে পুলিসের হাওয়ালা করে দেবে—আর যখন আসে এতএত নোট বাপুজীকে তাকে গুনে গুনে দিতে হয়—

অভয় সিং কে?

আমার মামাজী—

তার মানে তোমার মার ভাই!

হ্যাঁ—ভাই লাগে—আপনা নয়, সতালো ভাই লাগে—তারপর একটু থেমে আবার বলতে থাকে—মামাজী হলে কি হবে, লোকটাও একের নম্বরের শয়তান—খুনে বদমাস। বাপুজী গাড়ি চালিয়ে যা রোজগার করে তাতেও অভয় সিংকে সন্তুষ্ট করা যাবে না— তাই আমাকে দিয়ে মুঠো মুঠো টাকা বাপুজী রোজকার করে। ঐ যে হোটেলের ম্যানেজার বিষ্টু পাকড়াশী, ঐ তো বাপুজীকে ঐ পথ বাতলে দিয়েছে—নচেৎ বাপুজী একদিন সত্যিই আমায় ভালবাসত, আমার জন্য জান পর্যন্ত দিতে পারত—কিন্তু আজ—সে আর মানুষ নেই, একটা পিশাচ হয়ে উঠেছে—

কি হয়েছে আজ?

আজ বাপুজী আমাকে হোটেলে নিয়ে যায়—সেখানে একজন পাঞ্জাবী, বহুৎ টাকাওয়ালা সিনেমার লোক, তার ঘরে আমাকে নিয়ে গিয়ে তোলে—লোকটা তখন প্রচুর মদ খেয়েছে এবং শুধু সে নয় বাপুজীও তার সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে মাতলামি শুরু করে, আর তখন বাপুজীর সামনেই লোকটা আমাকে—বাপুজীরই ইশারা পেয়ে—

আর বলতে পারে না চুমকী—দু'হাতে মুখ ঢাকে।

এবং মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে বলে, তখন আমি ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে আসি—বাপুজীর সামনে সে আমায় ধরবে তাই লোকটা টলতে টলতে আমাকে ধরবার জন্য আমার পিছনে পিছনে আসতে থাকে—আমি রাস্তা জানি না, সিঁড়ি কোথায় জানি না, এদিক ওদিক ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একটা সিঁড়ি পেয়ে নীচে গিয়ে তোমার ঘরে আলো জ্বলছে দেখে ছুটে ঢুকে পড়ি ঘরের মধ্যে—

আরও হয়তো কিছু বলবার ছিল চুমকীর, কিন্তু আর কোন কথাই মুখ দিয়ে সরে না!

সে বেদনায় লজ্জায় অপমানে যেন ভেঙে পড়ে।

হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে।

চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে তাপস।

কি বলবে সে—কি বলতে পারে সে—কি সান্ত্বনাই বা তার দেবার আছে ঐ মেয়েটাকে!

চুমকী কাঁদছে।

ফুলে ফুলে কাঁদছে।

আহা কাঁদুক—কেঁদে যদি ও একটু সান্ত্বনা পায় তাই না হয় পাক—

সত্যিই মেয়েটা হতভাগিনী।

আর এমন মর্মান্তিক কাহিনীও বোধ হয় শোনেনি কখনও ইতিপূর্বে তাপস—এ নিষ্ঠুরতার, এ নীচতার যেন কোন সীমা-পরিসীমা নেই—

আর সিংজী নিজের মেয়েকে বাপ হয়েই যখন ঐ চরম লজ্জার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে তখন সে একজন বাইরের লোক কি করতে পারে?

কতটুকু শক্তি তার?

চুমকী ওঠ, কেঁদো না। যাও, পাশের ঘরে গিয়ে জামাকাপড় বদলে এস—

বাবুজী—

যাও, ওঠ।

সে কণ্ঠস্বরের মধ্যে কি ছিল কে জানে! চুমকী অবহেলা করতে পারে না। উঠে দাঁড়ায়।

আস্তে গায়ের জামাটা কোনমতে টেনে ওড়নাটা দিয়ে ঢেকে ঘর থেকে বেরুবার জন্যে পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়ায়।

বাবুজী!

বল।

তুমি চলে যাচ্ছ।

না, তুমি কাপড় বদলে এস, তারপর যাব।

প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে চুমকী ফিরে এল।

চোখে মুখে জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়েছে বলেই মনে হয়। তাহলেও অনেক কান্নার জন্য চোখের পাতা দুটো ফোলা ফোলা।

ভারী-ভারী মুখ।

পরনে বাঙালী মেয়েদের মত একটা রঙিন তাঁতের শাড়ি। হাতে এক কাপ ধূমায়িত চা।

তাপস চুপটি করে একটা চেয়ারের উপর বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানছিল।

এই পৃথিবীতে কত বিচিত্র মানুষই না থাকে!

কত বিচিত্রই না তাদের ব্যবহার!

তার দাদা তপন—বড়বাবু—তার বাবা—গ্যারেজের মালিক গৌরবাবু—চুনী—চুনীর বাবা—সতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ঐ সিংজী—চুমকীর বাবা—এদের কারও সঙ্গে

যেমন কারও মেলে না, তেমনি মেলে না তার মা আনন্দময়ী, তার বোন কৃষ্ণা, তার পিসিমা—রাধা দেবী, তার মেয়ে লাবণ্য, নটী বিমলা. তার দুই মেয়ে মাধুরী ও অপর্ণা—আর ঐ স্বল্পপরিচিত মাত্র আজকের রাত্রে, সিংজীর মেয়ে চুমকী—এদের যেন কারো কারো সঙ্গে এতটুকু মিল নেই।

কোন এক দক্ষ শিল্পী যেন ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে ভিন্ন ভিন্ন মানুষগুলোকে গড়েছে।

কেন সে নিজে—তাপসচন্দ্র!

তারই কি কারও সঙ্গে এ দুনিয়ায় মিল খুঁজে সে আজ পর্যন্ত পেয়েছে?

নিজের চিন্তার মধ্যে যেন তলিয়ে ছিল তাপস।

চুমকীর পায়ের শব্দে চমকে মুখ তুলে তাকায়!

একটু আগের চুমকী নয়, এবং প্রথম দিনের দেখা চুমকীও নয়—এ যেন অন্য এক চুমকী।

বাবুজী!

চুমকী, কিন্তু এ কি—

আপনার জন্য একটু চা করে আনলাম বাবুজী।

কিছু দরকার ছিল না এত রাত্রে।

মুখে বললে বটে কথাটা, কিন্তু হাত বাড়িয়ে চুমকীর হাত থেকে চায়ের কাপটা নিল তাপস এবং নিঃশব্দে অতঃপর চুমুক দিয়ে শেষও করে একসময় চা-টা।

চুমকী চুপটি করে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

সিংজী হয়তো তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়বে, আমি এবার যাই—তাপস উঠে দাঁড়ায়।

বাবুজী!

বল।

আমার মরতে বড় ভয় করে, কিন্তু এখানে আর একমুহূর্তও টিকতে পারছি না। আপনি আমাকে কোথাও একটা কাজের যোগাড় করে যদি দিতে পারেন।

কাজ?

হ্যাঁ। যে কোন কাজ। আমি একটু একটু লেখাপড়া জানি, রাঁধতেও পারি। একান্ত যদি অন্য কোন কাজ না হয় বাচ্চা রাখার কাজও আমি পারব। কত বড় বড় লোকের বাড়িতে তো বাচ্চা রাখার জন্য আয়া রাখে।

তুমি কাজ করবে?

হ্যাঁ বাবুজী, যে কোন কাজ পেলে করব।

কিন্তু তোমার বাপুজী, তাকে ছেড়ে—

চলে যাব এবারে।

কথাটা বলতে বলতে চোখের কোল দুটো চুমকীর জলে ভরে ওঠে।

গলাটা বুজে আসে।

॥ ২৪ ॥

তাপস যে তাপসের চোখে কখনও কোনদিন জল আসে না—তারই আজ চুমকীর মুখ থেকে তার কাহিনী শুনতে শুনতে কখন অজ্ঞাতে যেন দুই চোখের কোল ছাপিয়ে অবাধ্য অশ্রু নেমে আসে।

টপ্ টপ্ করে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে থাকে।

ভুলে যায় তাপস যেন চোখের জলটাও মুছতে।

কেবল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, চুমকী, এবার আমি যাই—

বাবুজী!

বল।

আমার সব সত্য কথা জানবার পর আমার ওপরে আপনার খুব ঘৃণা হচ্ছে না?

ঘৃণা!

হ্যাঁ বাবুজী—বাজারের একটা বেশ্যা ছাড়া তো আমাকে আর কিছুই মনে হতে পারে না আপনার—আর সেটাই তো সকলের মনে হওয়া স্বাভাবিক!

আমি যাই চুমকী—

চুমকীর কথার কোন জবাব না দিয়ে অন্য কথা বলে তাপস।

আর আপনি কখনও এখানে আসবেন না বাবুজী?

আমি এলে কি তুমি খুশি হবে চুমকী?

খুশির কথা থাক বাবুজী—তবে আপনি যদি মধ্যে মধ্যে এখানে আসেন তো অন্ততঃ জানব—

কি চুমকী?

জানব যে এই দুনিয়ায় অন্ততঃ একজনও আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আছে, আর—

আর?

আর জানব এখানে কেবল জন্তু-জানোয়াররাই আসে না—মানুষও আসে—

কিন্তু একটা কথা চুমকী—

ইতস্ততঃ করে বলতে গিয়েও থেমে যায় তাপস।

বলল বাবুজী, থামলেন কেন?

আমার এখানে আসাটা সিংজী জানতে পারলে—মানে তোমার বাপুজী—

জানি বাপুজী ভালভাবে মেনে নেবে না!

তবে?

দুপুরের দিকে বাপুজী কখনও ঘরে থাকে না—সে সময় তো আসতে পারেন!

কিন্তু সেটা কি ভাল হবে চুমকী?

কেন ভাল হবে না?

তোমার বাপুজীর অজান্তে এখানে আসা—ধর হঠাৎ যদি কখনও সে জানতে পারে—সে আমাকে স্নেহ করে, ভালবাসে—মনে হয়তো দুঃখ পাবে।

চুমকী অতঃপর কি জবাব দেবে বুঝতে পারে না।

মাথা নীচু করে থাকে।

আচ্ছা, আমি যদি সিংজী যখন থাকবে তখন আসি?

করুণ হাসি হেসে বলে চুমকী—তাতে আর কি হবে বলুন—আপনার সামনে তো আমি আসতে পারব না—একটা কথাও এসে বলতে পারব না সে সময়!

তবে?

থাক—আপনার অসুবিধা হলে আসবেন না বাবুজী।

না, না—তা নয়—আসব আমি—

চুমকী আর কোন কথা বলে না, নিঃশব্দে কেবল মুখটা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

তাপস ঘর থেকে বের হয়ে আসে।

রাস্তায় নেমে ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে হাঁটতে থাকে তাপস গৃহাভিমুখে।

রাত অনেক হয়েছে।

অন্ততঃ রাত দেড়টা তো হবেই।

কলকাতা মহানগরী গভীর নিদ্রামগ্ন।

যেন ঘুমের নিঃশব্দতায় হারিয়ে গিয়েছে; দিনের কলরব-মুখরিত মহানগরীর অস্তিত্ব যেন হারিয়ে গিয়েছে।

কোন সাড়া নেই শব্দ নেই স্পন্দন নেই।

দীর্ঘ সার্কুলার রোডটা যতদূর দৃষ্টি চলে এদিক থেকে ওদিক আলোকিত—কিন্তু সে আলোর মধ্যেও কেমন যেন একটা ঘুমের ক্লান্তি, একক নিঃস্বতা।

পথের দুপাশে বাড়িগুলো নানা ধরনের, দিনের বেলায় যা একরকম দেখায়—এই মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতায় যেন ঠিক তা মনে হয় না।

মনে হয় যেন সব নিঃশঙ্ক হানাবাড়ি।

রাস্তার মাঝখান দিয়ে ইস্পাতের জোড়া ট্রাম লাইন চলে গিয়েছে—যেন কালো দু-জোড়া ফিতের মত মনে হয়।

কালো ফিতে দিয়ে পথটাকে কঠিন বাঁধনে বেঁধেছে যেন।

পথ ধরে ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে তাপসের মনের মধ্যে যেন সেই বিচিত্র অনুভূতিটা জাগে।

বিরাট চওড়া অ্যাসফল্টের তৈরী আজকের সার্কুলার রোডটা যেন রাত্রির নিস্তব্ধতায় ঘুম ভেঙে এখন জেগে উঠেছে।

প্রায়ই সারানো হয় রাস্তাটা তবু—

অনেক ক্ষতচিহ্ন এখানে ওখানে, ভারী ভারী লরী, ট্রাক, মোটর, বাস, ট্রাম, ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি ঠেলা গাড়ির নির্মম আঘাতে সারাটা দিন ধরে এবং মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সেই ক্ষতচিহ্ন যেন বেড়েই চলেছে।

মেরামতকারীরা এসে মেরামতও করে দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বেদনাটা তো যাচ্ছে না!

যায়ও না।

বেদনায় এখন যেন তাই ককিয়ে ককিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে।

তাপস যেন রাস্তার সেই কান্না শুনতে পায়।

শুধু কান্না নয়।

এ যেন স্মৃতির বেদনামন্থন।

আজকের তো নয়—কতদিনকার ঐ রাস্তা!

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কত রূপই না নিয়েছে—দুশো বছর আগে এখানে কি কোন রাস্তা ছিল?

ছিল একটা খাল, ডিচ্।

মারহাটা দস্যুদের আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য ইংরেজরা একটা বিরাট ডিঙ্ খুঁড়েছিল সেদিনকার সুতানুটি গোবিন্দপুর শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত।

ইতিহাস বলে সে নাকি আলীবর্দীর আমল—বর্গীদের আক্রমণে কলকাতাবাসী ইংরেজরা তখন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

মাত্র কিছুকাল আগে ১৭৩৭ সালের প্রচণ্ড ঝড়ে, বজ্রাঘাত ঘূর্ণির ঘায়ে শহরের নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। তারপর তাকে অনেক কষ্ট অনেক দান-খয়রাত করে নতুন করে আবার বাসোপযোগী করে নিতে হয়েছে—

এখন যদি ঐ বর্গী মারাঠা দস্যুদের আক্রমণে আবার সব ভেঙে তছনছ হয়ে যায়, এই ভয়ে শহরবাসী ইংরেজরা শংকিত হয়ে ওঠে।

প্ল্যান হল—

একটা খাদ খোঁড়া হোক—ডিচ্, তাহলে আর শত্রুরা চট্ করে শহরে এসে ঢুঁ মারতে পারবে না!

সেই সঙ্গে বসল জায়গায় জায়গায় নাকি কামানের ঘাঁটি।

খাদ—ডিচ্ খোঁড়া শুরু হয়ে গেল একদিন। লম্বায় হবে সাত মাইল আর চওড়ায় একশো। এলাহী কাণ্ড!

টাকা লাগবে ঐ খাদ খুঁড়তে কমপক্ষেও হাজার পঁচিশ টাকা।

এখনকার দিনের টাকা নয়, তখনকার কালের সত্যিকারের মূল্যবান রূপার সিক্কা টাকা।

টাকা তো লাগবে, কিন্তু টাকাটা আসবে কোথা থেকে?

ইংরাজের দল গলা উঁচিয়ে বলে, কেন, এদেশের কালা দেশী আদমীদের ট্যাঁক থেকে!

আপাততঃ অবিশ্যি কাউন্সিল ঐ টাকা দেবে, পরে ওদের কান মলে আদায় করে নিতে হবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, খাদ খোঁড়ার কাজ বেশীদূর নয়, মাত্র আধাআধি হয়েছে—এমন সময় শোনা গেল বৃদ্ধ আলিবর্দীর দাপটে মারাঠাদের দাপাদাপি খানিকটা কমে

গিয়েছে।

পরিকল্পনাটা ছিল খাদের পরিধি বিস্তৃত হবে—তখনকার দিনের উত্তরে বাগ-বাজার থেকে দক্ষিণে হেস্টিংস স্ট্রীট, তখনকার কুলীর বাজার পর্যন্ত।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাত্র তিন মাইল খোঁড়া হবার পরই খাদ কাটা কাজ বন্ধ হয়ে গেল এণ্টালির কাছবরাবর গিয়ে।

ঐ খাদেরই সেদিনকার নাম মারহাটা ডিচ্!

ঐ ডিচ্‌কে কেন্দ্র করেই সেদিনের কলকাতার সীমানা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল—পূবে মফঃস্বল, পশ্চিমে শহর।

তিন মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত খাদটা শহরের বুকে একটা কলঙ্কের মত দাগ কেটে বসে রইল এবং শহরের যত ময়লা আবর্জনা তার মধ্যে দিনের পর দিন জমা হতে লাগল।

দুর্গন্ধে বাতাস শ্বাসরোধকারী হয়ে উঠতে লাগল।

অবশেষে বহুকাল পরে লর্ড ওয়েলেসলীর সময় নাকি ঐ বহুদিনের ময়লা আবর্জনা জমা খাদ বুজিয়ে দেওয়া হয়।

মাটি ফেলে ফেলে ভরাট করে দেওয়া হয় বিখ্যাত মারহাট্টা ডিচ্।

বাঃ চমৎকার, এক একুশ হাত চওড়া সড়ক তৈরী হয়ে গেল!

আর তারই নাম হল সেদিন সার্কুলার রোড।

আপার—লোয়ার।

আর আজ ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কল্যাণে আর দাক্ষিণ্যে সে আরও বিস্তৃত হয়েছে।

দু'ধারের বস্তিগুলো ভেঙে বড় বড় বাড়ি।

ট্রামের লাইন পড়েছে।

চক্‌চকে ইস্পাতের লাইন।

ঘড়ঘড় শব্দে ট্রাম চলছে।

ট্রাক, লরী, বাস, মোটর, ঘোড়া গরু-মহিষের গাড়ি।

আর মানুষজনের তো কথাই নেই!

চলেছে তো চলেছেই!

সেই ইতিহাসেরই যেন পাতাগুলো একের পর এক চোখের উপর ভেসে ভেসে উঠতে থাকে তাপসের মধ্যরাত্রির ঐ নির্জনতায় ঐ সার্কুলার রোডটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে; শুনতে পায় যেন ফিসফিস করে সেই ইতিহাসের কথা বলছে ঐ সড়কটা।

কিছুদিন আগে ঐ রাস্তার ধারে আবর্জনাবাহী রেলগাড়ির লাইনও ছিল।

সেটা অবিশ্যি আজ উঠে গিয়েছে।

শিয়ালদহ পর্যন্ত আসে—তারপর আর আসে না, আজকাল সেদিকটাও উঠবে উঠবে করছে।

বিচিত্র একটা অনুভূতিতে যেন মনের মধ্যে রোমাঞ্চ জাগায় তাপসের।

রাস্তা আর রাস্তার ইতিহাস, তার নিজস্ব ইতিহাস—কাহিনী—

রাস্তা আর তার বিচিত্র অনুভূতি—যেটা এই শহরের অনুভূতি ও কাহিনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে।

এই শহর কলকাতার কাহিনী !

কত লোক আজ পর্যন্ত ঐ সার্কুলার রোডটা ধরে গিয়েছে এসেছে !

কতজন হয়তো ঐ রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে বা অন্য দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। তাদের শেষ নিঃশ্বাস হয়তো এখনও রাস্তার ওপর ভাসমান বায়ুস্তরে-স্তরে জমাট বেঁধে আছে।

তাদের বুকের রক্ত হয়তো এখনও ঐ রাস্তার কোন ধূলিকণায় সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

ধূলোও নয়।

এক একটি টুকরো টুকরো কাহিনী যা ওর জন্ম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ঐ রাস্তার বুকেই লেখা হয়ে আছে।

আজ সে এই রাত্রে হেঁটে চলেছে, কিন্তু একদিন আর এ রাস্তায় তার পায়ের ছাপ পড়বে না।

সবাই ভুলে যাবে, কিন্তু রাস্তা ভুলবে না।

আর দুপাশের ঐ বাড়িগুলো !

ওরও কি ইতিহাস নেই ?

আছে, রাস্তার মত তারও ইতিহাস আছে—কথা আছে, সেই তো এই শহরের কাহিনীর খণ্ড এক অংশ।

অনেক কথার একটু কথা।

অনেক হাসির একটু হাসি।

অনেক কান্নার একটু কান্না।

॥ ২৫ ॥

তপনের কাছ থেকে বেশিদিন গোপন করে রাখতে পারেনি সুচিত্রা সত্যি কথাটা !

প্রকাশ হতে সত্যি কথাটা খুব বেশী দেরি হয়নি !

আর তাই কি রাখা যায়, না তাই কিছু সম্ভব ?

এবং তাই যেদিন সত্যি কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ল—সুচিত্রা যেন একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

লজ্জা ও শালীনতার শেষ পর্দাটুকু পর্যন্ত মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে তপন যেন একটা নিষ্ঠুর জ্বালায় সুচিত্রার মুখোমুখি দাঁড়ায়।

তুমি তাহলে আমার কাছে মিথ্যা বলেছিলে ?

মিথ্যা !

হ্যাঁ—হ্যাঁ, মিথ্যা ছাড়া কি—বলেছিলে সেদিন বাবা মাকে সব জানিয়ে চলে এসেছ !

সুচিত্রা কি বলবে অতঃপর ভেবে পায় না।

কি, জবাব দিচ্ছ না কেন ?

সুচিত্রা চেয়ে আছে তপনের মুখের দিকে, আর তপন বলে চলেছে—

আজ অফিসে মাইনে পাবার পর আমাকে তাহলে মিথ্যে বলেছিলে যে তোমার এক বন্ধু অসুস্থ—তাকে হাসপাতালে দেখতে যাবে, অথচ দুপুরেই ছুটি নিয়ে তোমার বাবার সঙ্গে কলোনীতে দেখা করতে গিয়েছিলে !

অভিযোগটা এত সত্য—এত স্পষ্ট—এত নিষ্ঠুর যে সুচিত্রার মুখ দিয়ে কোন শব্দ পর্যন্ত বের হয় না।

অভিযোগ সত্য হলেও—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দূরে থাক, কোন পুরুষ কোন মেয়েমানুষের কাছে এমনি নিষ্ঠুর এবং কুৎসিত ভাবে সে অভিযোগের জবাব চাইতে পারে এ যেন সুচিত্রার স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

কয়েকটা মুহূর্ত সত্যিই তাই বোবা দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে সুচিত্রা তপনের মুখের দিকে।

কি জবাব দিচ্ছ না যে ? না, ভেবেছিলে দিনের পর দিন আসল মিথ্যাটাকে নতুন নতুন মিথ্যা রচনা করে চাপা দিয়ে রাখবে ?

আমি—

খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছ না সুচিত্রা, এমন ভাবে মিথ্যাটা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে ভাবতে পারনি, তাই না ?

তুমি তাহলে অফিস থেকে বেরুবার পর আমায় ফলো করেছিলে তপন !

কথাগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে সুচিত্রার গলাটা যেন কান্নায় বুজে আসে।

হ্যাঁ করেছিলাম।

তপন, তুমি এত—

কী, থামলে কেন, বল ? বল—বলে ফেল ?

এত নীচ—এত ছোট—

ছোট—নীচ, আমি না তুমি সুচিত্রা ? যে মেয়েমানুষ স্বামীর সঙ্গে পর্যন্ত জঘন্য মিথ্যে—

মিথ্যে !

হ্যাঁ মিথ্যে—যে প্রতারণা করে তাকে বুঝি মহৎ—বিরাট বলে তোমাদের ভাষায় ?

না—তা বলে না—

তবে ?

না, থাক তপন—এ ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতেও আমার ঘৃণায় লজ্জায় গলা বুজে আসছে !

কথাগুলো বলে সুচিত্রা আর দাঁড়ায়নি তপনের সামনে।

ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এ সে কি করল?

একে কলোনী থেকে কান্নায় ভারী মন নিয়ে তাকে ফিরতে হয়েছে, তারপর এখানে এসে এই ব্যবহার—তার স্বামীর কাছ থেকে!

এ কাকে সে স্বামী বলে গ্রহণ করল?

এর চাইতে জন্ম-জন্ম কুমারী থাকলেই বা কি এমন এসে যেত?

এমনি একজন মানুষকে নিয়েই কি সে কল্পনায় সুখের নীড় বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছিল মনের মধ্যে?

এমনি এক পুরুষের দু'বাহুর আশ্রয়েই কি সে নিজেকে নিঃস্ব করে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিল?

এখন দিনের পর দিন এই মানুষটার সঙ্গেই কি একই ছাদের তলায় একই ঘরের মধ্যে সংসার ও রাত্রিযাপন করতে হবে?

অবিমিশ্র একটা ঘৃণায় সমস্ত দেহটা যেন বার বার কুঞ্চিত হতে থাকে।

হ্যাঁ—গিয়েছিল সে আজ, মাইনেটা পাবার পরই—ছুটে তার বাবার কাছে।

সেই যে পনের দিন আগে চলে এসেছে, আর যায়নি।

কে জানে কি ভাবে ওদের দিন যাচ্ছে।

আসার সময় মার হাতে অবিশ্যি সামান্য তার ব্যাগে যা ছিল তা থেকে গোটা পনের টাকা দিয়ে এসেছিল—কিন্তু তাতে অতগুলো প্রাণীর কি হবে।

র‍্যাশন আনতেই তো ছটা টাকা তা থেকে বের হয়ে যাবে—থাকবে মাত্র নটি টাকা।

তার মধ্যে বাবার হপ্তায় আফিং দু'টাকা।

বাকী রইল সাতটি মাত্র টাকা।

তাছাড়া যে ব্যাপারটা অনুক্ষণ মনের মধ্যে সুচিত্রাকে পীড়ন করছিল—সে মা বাবার কাছে মিথ্যা কথা বলে এসেছিল!

আজ পর্যন্ত জ্ঞান হওয়া অবধি যে মা-বাবার কাছে কখনও মিথ্যা বলে নি—

বলবার প্রয়োজনই হয়নি, সেই মা-বাবার কাছে সে মিথ্যা বলে এল!

খুলে যদি বলে আসত সত্যি কথাটা?

হয়তো তাঁরা মনে মনে আঘাত পেতেন, কিন্তু তাই বলে কি আশীর্বাদ করতেন না! করতেন—নিঃসন্দেহে করতেন।

আর ভবানীবাবু তো তাকে সে-কথা বলেই রেখেছিলেন!

তবু পারেনি সুচিত্রা বাবা ভবানীবাবুকে কথাটা বলতে।

কোথায় যেন তার মনে হয়েছে—অন্যায় করবে সে কথাটা বললে—অপরাধ করবে সে, এ তার একান্ত স্বার্থপরতা।

যে মা-বাপ তাকে এত কষ্টে মানুষ করল, আজ নিজের সুখের জন্য তাদের এমনি এক অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে সে চ'লে যাচ্ছে, কেমন করে বলত—পারত না !

কিছুতেই পারত না।

কিছু আবার এও মনে হয়েছে গত কদিনে স্বামীর কাছে এসে, করে ফেলেছি যখন সে-কাজটা তখন আর চাপা দিয়ে রেখে কোন লাভ নেই !

তাতে করে হয়ত শুধু স্বামীর সঙ্গেই নয়—ম-বাবার সঙ্গেও একটা ভুল বোঝা-বুঝির সৃষ্টি করবে।

কে বলতে পারে, তপন যে প্রকৃতির মানুষ, যদি সেই ভুল বোঝাবুঝি তার মনে আরও সন্দেহ জাগায়। ব্যাপারটাকে সে আদৌ ক্ষমার চোখে না দেখতে পারে !

তাই আজ মাইনেটা পেয়ে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে স্বামী তপনের কাছে মিথ্যে বলেই সে কলোনীর উদ্দেশে বের হয়ে পড়েছিল—এক বন্ধুকে হাস-পাতালে দেখতে যাবে বলে।

মনে মনে স্থির করেছিল—মা বাবাকে গিয়ে সব খুলে বলবে। বলবে—এই পরিস্থিতি।

তোমরা আমায় ক্ষমা কর—তবে মাসে মাসে তোমাদের আমি একশো টাকা করে মাইনে পেলেই দিয়ে যাব।

কথাটা অবিশ্যি বলতে হয়নি।

নিষ্ঠুর সত্য আপনা থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

মাথায় কপালে ও সিঁথিতে যে এয়োতির সিঁদুর রয়েছে—মা-বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার আগে কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল সুচিত্রা !

একটিবারও কথাটা তার মনে হয়নি।

মনে হয়নি তার যে তাকে নিজের থেকে কিছুই বলতে হবে না—কোন স্বীকৃতিই দিতে হবে না, সে নিজেই কপালে ও সিঁথিতে সে সংবাদ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তাদের সামনে।

দুপুরে আহারাদির পর স্বামী-স্ত্রী—ভবানীবাবু ও অন্নপূর্ণা দুজনে দাওয়ায় বসে সুচিত্রার কথাই বলাবলি করছিলেন।

মেয়েটা গেল, পনের দিন হয়ে গেল—একটা খবরও নেই কিছু—অন্নপূর্ণাই কথাটা বলেছিলেন।

স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেন ভবানীবাবু, ভাবছ কেন রতনের মা—অফিসের কাজে কল-কাতার বাইরে গিয়েছে। ভালই আছে হয়তো, কাজে খুব ব্যস্ত—

অন্নপূর্ণা বলেন, তা হোক—একটা চিঠিও তো দিতে পারত। কাজে ব্যস্ত থাকলে কি একটা চিঠি দেওয়া যায় না ?

অফিসের কাজ তো কখনও জীবনে করনি—ভবানীবাবু বলেন, জানবে কি করে রতনের মা, কত ঝামেলা, কত ঝক্কি অফিসের কাজে! তায় আবার অ্যাসিস্ট্যান্ট

ম্যানেজারের পার্সোন্যাল স্টেনো !

ঠিক ঐ সময় রৌদ্রে তেতেপুড়ে সুচিত্রা এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

মা !

কে—সুচি এলি ? অন্নপূর্ণা বলে ওঠেন ব্যগ্র কণ্ঠে।

হ্যাঁ মা।

সুচিত্রা ঘরে ঢুকে প্রথমেই এসে ভবানীবাবুকে প্রণাম করে, তারপরই অন্নপূর্ণার সামনে নীচু হয়ে প্রণাম করতে যেতেই অন্নপূর্ণার ডাকে ও তাঁর কণ্ঠস্বরে থমকে যায়।

হাতটা তার গুটিয়ে আসে।

সুচি—অন্নপূর্ণা ডাকেন।

মা !

মুখ তুলে তাকায় সুচিত্রা মায়ের মুখের দিকে।

মা তখন স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মেয়ের মুখের দিকে। দু'চোখে তাঁর বিস্ময় ও প্রশ্ন।

তখনও বুঝতে পারেনি সুচিত্রা।

কিন্তু মার দ্বিতীয় প্রশ্নেই সে চমকে ওঠে ও সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণ যে ব্যাপারটা একটিবারও মনে পড়েনি সেই ব্যাপারটাই মনে পড়ে যায়।

তোর কপালে—সিঁথিতে ও কি—অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করেন।

ভবানীবাবু ভাল চোখে দেখেন না—তাই ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে না পেরে ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করেন স্ত্রীকে, কী—কী হয়েছে ওর কপালে, রতনের মা !

স্বামীর মুখের দিকে না তাকিয়েই এবং মেয়েকে নির্বাক ও বিব্রত দেখে ব্যাপারটায় আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকে না অন্নপূর্ণার। তাই তিনি পূর্ববৎ মেয়ের মুখের দিকে দৃষ্টি রেখে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, তোমার মেয়ে বোধ হয় বিয়ে করে এসেছে !

বিয়ে ! কী বলছ তুমি রতনের মা ?

সুচিত্রা একেবারে চুপ।

একেবারে প্রস্তরমূর্তি যেন।

মায়ের পূর্বের সেই কঠিন গাম্ভীর্য—তিনি আবার বললেন, তোমার মেয়ের কপালে আর সিঁথিতে সিঁদুর দেখছি—তোমার মেয়েকেই জিজ্ঞাসা কর না, সামনেই তো তোমার মেয়ে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে !

সিঁদুর—কপালে আর সিঁথিতে—কথাগুলো তবু যেন কেমন সংশয়-জড়ানো গলায় ভবানীবাবু উচ্চারণ করেন একটু থেমে থেমে।

সুচিত্রাকে জিজ্ঞাসা করতে হল না ভবানীবাবুর আর—সুচিত্রা নিজে থেকেই এবারে শান্ত গলায় বললে, হ্যাঁ বাবা—মা ঠিকই বলেছে।

ঠিকই বলেছে !

হ্যাঁ—আমি দিন কুড়ি হল রেজিস্ট্রী করে আমার এক সহকর্মীকে বিবাহ করেছি।

মা এবারে বললেন, তা হলে সেদিন আমাদের কাছে মিথ্যে বলে বিয়ে করতে

গিয়েছিল !

না—তার কয়েকদিন আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, সুচিত্রা আবার বলে।

তা সেই সংবাদটি দেবার জন্যই কি এসেছিস ? মা আবার বললেন।

না মা—ক্ষমা চাইতে এসেছি।

ক্ষমা ?

হ্যাঁ মা—তোমার কাছে, বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে আশীর্বাদ নিয়ে যাব বলে এসেছি।

তা এজন্য আবার ক্ষমার কি প্রয়োজন ? অন্নপূর্ণা বললেন।

মা !

হ্যাঁ—বড়সড় হয়েছ—জ্ঞানগম্যি হয়েছে—নিজে উপার্জনও করছ, নিজে যা ভাল বুঝেছ করেছ।

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে বেদনার মধ্যে যেন একটা ব্যঙ্গের তিক্ততা রয়েছে—একটা জ্বালা রয়েছে, যে ব্যঙ্গ ও জ্বালাটা ভবানীবাবুর মত অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোকের কাছেও বুঝি ধরা পড়ে যায়।

তিনি তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, না, না—কি তুমি বলছ রতনের মা, তাছাড়া—

মা !

অন্নপূর্ণা মেয়ের মুখের দিকে ফিরেও তাকালেন না—উঠে পড়লেন এবং ঘর ত্যাগ করবার জন্য উদ্যত হয়ে বললেন, হ্যাঁ গো—পাখীর ছানা বই তো নয়—খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে দিয়েছ—ডানা গজিয়েছে, উড়ে গিয়েছে, তার জন্য—

শোন মা – শোন !

যা শোনাবার তোমাদের ঐ বাপটিকেই বল মা—মুখ্যুসুখ্যু মেয়েমানুষ আমি—তোমরা লেখাপড়া জানা সন্তান—উনিও লেখাপড়া জানেন—উনিই বুঝবেন, আর আমাকে বুঝিয়েই বা তোমার কি হবে !

অন্নপূর্ণা আর দাঁড়ালেন না। ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

॥ ২৬ ॥

ঘরের মধ্যে একটা অখণ্ড স্তব্ধতা থমথম করে।

বাপ ও মেয়ে ঘরের সেই স্তব্ধতার মধ্যে যেন প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে।

কারও মুখে কোন কথা নেই।

অন্নপূর্ণার কথাগুলোর মধ্যে শুধু যে একটা তিক্ততা ছিল তাই নয়—নিদারুণ একটা ক্ষোভের সঙ্গে মর্মান্তিক একটা বেদনাও যেন জড়িয়ে ছিল সে কথাগুলোর প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের মধ্যে।

শেষের দিকে কথাগুলো বলতে বলতে গলাটা যে তাঁর অশ্রুভারে প্রায় বুজে

আসছিল, সেটা ভবানীবাবু বুঝতে না পারলেও সুচিত্রার অগোচর থাকে না।

কয়েকটা মুহূর্ত সে কি বলবে অতঃপর বুঝতে পারে না।

ভবানীবাবু চিরদিনই ঐ প্রথম সন্তানটিকে তার একটু বেশী স্নেহ করতেন—একটু বেশী ভালবাসারও প্রশ্রয় দিয়েছেন।

স্ত্রীর দুঃখ ও অভিমানটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলে মেয়েটা কোন দিন তার নিজের দিকটা ভাববে না—এই সংসারের জোয়াল টেনেই বেড়াবে—কেন—কেন তা হবে ?

ওর কি সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকতে নেই ?

ও কি দাসখৎ লিখে দিয়েছে সংসারের কাছে ?

বাবা !

সুচিত্রার ডাকে চমকে ওঠেন ভবানীবাবু।

বলেন, কেন মা ?

আমি অন্যায় করেছি আমি জানি—কিন্তু—

কে—কে বললে তুই অন্যায় করেছিস মা ! একটুও অন্যায় করিস নি। কেন বিয়ে করবি না তুই—নিশ্চয়ই করবি—বেশ করেছিস—ভাল করেছিস। বাপ হয়ে আমিই বা কি কর্তব্য পালন করেছি তোর প্রতি !

না বাবা না—ও কথা বলো না !

কেন বলব না শুনি ? নিজের স্বার্থের কথাই কেবল ভাবব—তোর কথা একবারও ভাবব না ?

বাবা !

বেশ করেছিস মা—বেশ করেছিস—তোরা সুখী হ।

সুচিত্রা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না—ভবানীবাবুর পায়ের কাছে ভেঙে পড়ে।

বলে, না বাবা না—আমি সত্যিই অপরাধ করেছি—তোমাদের অনুমতি না নিয়ে—

না করিস নি—রতনের মার এটা অন্যায়—এ তার স্বার্থপরতা !

বাবা ?

হ্যাঁ মা, কেন—একা কি যত দায় তোরই সংসারের প্রতি—আর কারও কি নেই ? আর অভিযোগ জানালে কি হবে—যে যার ভাগ্য নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছে—কি হবে, ভাগ্যে যদি থাকে তোর অভাবে উপবাস তো করতে হবে ! আমাদের উপবাস তাই বলে তোর আঁচল ধরে রাখব কেন ?

না বাবা না—বিয়ে আমি করেছি বটে কিন্তু যাকে বিয়ে করেছি সে তেমন অবুঝ নয়—আর সে তো জেনেশুনেই আমায় বিয়ে করেছে—মাসে মাসে আমি মাইনে পেলেই তোমাকে একশো করে টাকা দিয়ে যাব।

না মা, না—ভবানীবাবু বাধা দেন, বিয়ের পরও তুই আমাদের সংসারের ভার টেনে

বেড়াবি কেন—তাছাড়া জামাই বাবাজী যতই ভাল হোক, আমরাই বা তার ভদ্রতার সুযোগ নেব কেন ?

না বাবা—তার মত নিয়েই এ টাকা আমি দিতে এসেছি—বলতে বলতে একশোটা টাকা, দশখানি দশ টাকার নোট বাপের হাতে গুঁজে দেয় সুচিত্রা।

ভবানীবাবু সবে টাকা কটা হাতে ধরেছেন, ঝড়ের মতই পুনরায় অন্নপূর্ণা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন।

না—কখনও বলছি না—ফিরিয়ে দাও টাকা—

মা—

দাও ফিরিয়ে—ও টাকা—দাও বলছি—

রতনের মা—

কেন—এতদিন মেয়ের হাততোলা খাইয়ে মান ইজ্জত পেট বাঁচিয়ে রেখেছ—আজ বুঝি জামাইয়ের হাততোলা খেয়ে বাঁচতে হবে। দাও ফিরিয়ে ও টাকা—ফিরিয়ে দাও—

মা—

মেয়ের দিকে ফিরেও তাকালেন না অন্নপূর্ণা—পূর্ববৎ স্বামীর দিকে চেয়েই বলতে লাগলেন, মেয়ের অপমান সহ্য করেছি, করতে হবে—কিন্তু পরের ছেলে এসে অপমান করে যাবে তাই কি তুমি চাও ?

শোন রতনের মা, শোন—মেয়ে বলছে জামাই নাকি আমাদের সে রকম নয়—

শোন—তোমাকে আমি শেষ কথা বলে যাচ্ছি—ও টাকা যদি তুমি হাত পেতে নাও তো—

আঃ রতনের মা—

শেষবারের মত বুঝি ভবানীবাবু স্ত্রী অন্নপূর্ণাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেন—তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেন কিন্তু অন্নপূর্ণা যেন একেবারে বারুদের মতই ফেটে পড়েন অকস্মাৎ—

বলেন তীক্ষ্ন কণ্ঠে, লজ্জা করে না—মাগ ছেলের মুখে অন্ন যোগাতে পার না—জামাইয়ের কাছে হাত পেতে ভিক্ষে নিচ্ছ—

অন্নপূর্ণা—

তীক্ষ্ন কণ্ঠে যেন আর্তনাদ করে ওঠেন ভবানীবাবু।

তার চাইতে এই নাও এই বালাটা বেচে—বলতে বলতে হাতের ক্ষয়ে যাওয়া বহুদিনের পুরাতন সোনার হাঙরমুখী বালাটা—স্বামীর দেওয়া শেষ সম্বলটি যেটি বহু যত্নে আজ পর্যন্ত ধারণ করে এসেছেন, হাত থেকে নিজে টেনে খুলে স্বামীর পায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হিংস্র ক্ষোভে বলে ওঠেন, এইটা বেচে কিছু বিষ এনে দাও, খেয়ে আমিও জুড়োই—তোমরাও জুড়োও—

অন্নপূর্ণা ঘর থেকে টলতে টলতে বের হয়ে গেলেন।

আর অস্ফুট অসহায় কণ্ঠে ভবানীবাবু বার বার বলতে লাগলেন—এ তুমি কি করলে রতনের মা—এ তুমি কি করলে—

হাতে ধরা মেয়ের দেওয়া নোটগুলো খসে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল
পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাপের সামনে সুচিত্রা—

মাথা নীচু করে অতঃপর নোটগুলো তুলে নিয়ে বের হয়ে এসেছিল সুচিত্রা ঘর থেকে।

সাইকেল রিকশাটাকে ছেড়ে দেয় নি—দাঁড়িয়েই ছিল তখনও।

মুহ্যমানের মত সুচিত্রা এসে সাইকেল রিকশার উপরে উঠে বসে। এসে একসময় বাস-স্ট্যাণ্ডে নামে ও ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বাসে উঠে বসে।

কেমন করে যে সাইকেল রিকশা থেকে নেমে ভাড়ামিটিয়ে বাসে উঠে বসেছিল কিছুই তার মনে নেই।

একটা কথাই তখন তার সমস্ত চেতনাকে কেবল আচ্ছন্ন করে রেখেছিল – তবে কি সে আগাগোড়াই ভুল করল—তপন, তার স্বামীও তাকে বুঝল না—তার নিজের গর্ভধারিণী মাও বুঝতে পারল না তাকে!

মার সেই নিষ্ঠুর কঠিন কথাগুলো যেন সর্বক্ষণ সারাটা রাস্তা তার দু কানের মধ্যে ঝম্ঝম্ করে বাজতে থাকে।

মুহ্যমানের মত সে সারাটা পথ বসে থাকে।

একটিবারও এদিক ওদিক তাকায় নি—

নচেৎ এটা অন্ততঃ তার চোখে নিশ্চয়ই পড়ত তাদের বাসের পিছনে পিছনে অনেকক্ষণ ধরে একটা ট্যাক্সি আসছিল সেটা একসময় তাদের বাসটাকে ওভারটেক্ করে পাশ কাটিয়ে বের হয়ে যায়—

সেই ট্যাক্সির মধ্যেই বসে ছিল তপন।

তপন তাকে আগাগোড়া অনুসরণ করেছে—

তার অফিস থেকে বের হয়ে বাসে করে বেহালায় যাওয়া, সেখান থেকে রিকশা করে কলোনীতে তাদের গৃহে যাওয়া—সেখান থেকে একসময় বের হয়ে আসা সব কিছুই সে দেখেছে—লক্ষ্য করেছে দূর থেকে অলক্ষ্যে।

তপন আগাগোড়াই ব্যাপারটা জানতে পেরেছে—

ক্লান্ত অবসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে সুচিত্রা যখন তাদের টালীগঞ্জের বাসায় ফিরে এল, তার অন্ততঃ মিনিট পঁচিশ-ত্রিশ আগে তপন ট্যাক্সিতে করে বাসায় ফিরে এসেছে।

কাপড় জামা ছেড়েছে—স্নান করেছে—তারপর ইলেক্ট্রিক হিটারে চায়ের জলের কেতলীটা বসিয়ে দিয়ে বসবার ঘরে এসে ইজিচেয়ারটার উপর বসে সুচিত্রারই অপেক্ষায় ঘন ঘন দরজার দিকে তাকাতে তাকাতে একটা সিনেমা সাপ্তাহিকের পাতা বার বার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উল্টে উল্টে যাচ্ছিল।

সুচিত্রার পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল তপন।

কিন্তু সুচিত্রা তাকাল না তপনের দিকে একবারও—ক্লান্ত মন্থর পদে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সমস্ত চেতনা—অনুভূতি যেন অবশ শিথিল।

কি করছে—কি না করছে—কি হচ্ছে—কি না হচ্ছে কিছুই যেন তার মর্মে পৌঁচচ্ছে না।

যন্ত্রচালিতের মত, একটা দম দেওয়া পুতুলের মতই যেন সুচিত্রা জামা কাপড় বদলায়—হাত মুখ ধোয়—তারপর চায়ের জল ফুটে গিয়েছে দেখে চা তৈরী করে এক কাপ চা নিয়ে এসে পাশের ঘরে তপনের সামনে দাঁড়ায়।

চা—

তপন আড়চোখে একবার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে চায়ের কাপটা হাতে নেয়।

সুচিত্রা চায়ের কাপটা দিয়ে আর দাঁড়ায় না—চলে যাচ্ছিল—তারপর গলার স্বরে দাঁড়ায়।

তপন তাকেই বলছে, হাসপাতালে গিয়েছিলে?

হঠাৎ যেন মুখ ফসকে বিস্ময়ের সুরে বের হয়ে যায় কথাটা, হাসপাতাল—

হ্যাঁ—তপন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আড়চোখে সুচিত্রার দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ, তোমার কে এক বান্ধবী অসুস্থ বলে তাকে ছুটি নিয়ে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলে না?

এতক্ষণে সমস্ত কথাগুলো যেন মনে পড়ে যায় সুচিত্রার।

সে বলে, হ্যাঁ—

কেমন দেখলে বান্ধবীকে?

ভাল—

কথাটা বলে সুচিত্রা আবার যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল কিন্তু পা আর নড়ে না—আবার তপনের প্রশ্ন, হাসপাতালটা বুঝি বেহালার দিকে?

কী বললে—হঠাৎ যেন চমকে তাকায় সুচিত্রা স্বামীর মুখের দিকে।

বলছিলাম—হাসপাতালটা কি বেহালায়?

না—

তপনের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সুচিত্রা।

স্বামীর মুখের রেখাগুলো যেন পাঠ করার চেষ্টা করে।

তবে বেহালার বাসে উঠে সেদিকে গেলে কেন?

বেহালার বাসে উঠেছি তুমি জানলে কি করে?

দেখলাম কিনা—

যন্ত্রণায় এতক্ষণ সুচিত্রা দগ্ধ হচ্ছিল, সেই যন্ত্রণাতেই যেন সহসা ফেটে পড়ল সুচিত্রা। কঠিন শান্ত গলায় বললে, তার মানে তুমি আমায় ফলো করছিলে—সত্যি আমি কোথায় যাচ্ছি সেটা দেখবার জন্য—তাই কি?

কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও সুচিত্রা, এতবড় মিথ্যা—এত বড় প্রতারণা কেন তুমি আমার সঙ্গে করলে?

তারপর কথার পিঠে কথা—

তপন যেন হিংস্র হয়ে ওঠে।

সুচিত্রার সমস্ত লজ্জা—সমস্ত গোপনতা—সমস্ত দুর্বলতা যেন দু পায়ে পিষে পিষে তাকে নিষ্ঠুর এক যন্ত্রণা দিতে থাকে।

এবং একটা কুৎসিত দৃশ্য সেটা।

সুচিত্রা যেন বোবা হয়ে যায়। এই—এই তার স্বামী! একেই সে বিয়ে করেছে!

কান্না যেন সব শুকিয়ে গিয়েছে। এক ফোঁটা জলও চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে না।

সে রাত্রে তপন খেল—

সুচিত্রার মুখে একদানা ভাতও উঠল না—

দেহের—জঠরের সমস্ত ক্ষুধাটাই যেন একটা তিক্ত ঘৃণা আর ধিক্কারে কখন ভিতরে ভিতরে মরে গিয়েছে।

তপন খাওয়াদাওয়া সেরে—আরাম করে একটা সিগারেট ধরাল—

অনেকক্ষণ ধরে টেনে টেনে শেষ করে সিগারেটটা, একসময় শয্যায় গিয়ে শুয়েও পড়ল।

সুচিত্রা আলোটা নিভিয়ে দিয়ে জানলার সামনে এসে দাঁড়ায়।

মাত্র পনেরটা দিন আর রাত্রিতেই তাদের এত সুখের—এত আশার—এত স্বপ্নের নীড়—ভেঙে চুরমার হয়ে গেল—

এত ভালবাসা সব শুকিয়ে গেল—

এ কি হল—

একটা শূন্য হাহাকার যেন বুকের ভিতরে গুমরে গুমরে উঠতে থাকে।

কেন—কেন এমন হল।

অন্ধকারে একবার অদূরে শয্যায় নিদ্রিত স্বামীর দিকে তাকাল।

বাইরে বোধহয় জ্যোৎস্না উঠেছে—চাঁদের আলো একটুখানি ওদের শয্যার উপর এসে পড়েছে।

সেই ম্লান আলোতেই ঝাপসা ঝাপসা দেখা যায় তপনকে।

ঘুমোতে ঘুমোতে নিশ্চিন্তে নাক ডাকাচ্ছে তপন।

ও স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে সুচিত্রা তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে—তাকে মিথ্যা বলেছে—আগাগোড়া তাকে ধাপ্পা দিয়েছে—

তপনের দৃঢ় বিশ্বাস সে তার মাইনের সব টাকাটাই তার মা বাবাকে দিয়ে এসেছে আজ—আর সেই কারণেই সে গিয়েছিল—

কিন্তু তারা যে তার রোজগারের একটি পয়সাও নেয়নি—কথাটা সে বলতে পারল না কিছুতেই—

একবার ইচ্ছে হয়েছিল—নোটগুলো তার স্বামীর গায়ের উপরে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, দেখ—এক কপর্দকও তারা নেয় নি—তারা স্পর্শও করে নি তার টাকা।

কিন্তু তাও পারল না—

কেবলই মনে হতে লাগল—মিথ্যে—মিথ্যেই সে চেষ্টা করা হবে—

তাতে করে জল আরও শুধু ঘোলাটে করাই হবে—স্বামী যেমন তার কথা বিশ্বাস করবে না তেমনি সেও তাকে বিশ্বাস করাতে পারবে না।

কি দরকার—

মিথ্যে প্রহসনের জের টেনে আর কি হবে।

তার চাইতে যা হবার হোক।

দেখাই যাক না তার ভাগ্য তাকে কোথায় টেনে নিয়ে যায়।

ক্লান্তিতে শরীরটা যেন ভেঙে আসছিল কিন্তু শয়নের কথা ভাবতেই মনটা তার কি এক ক্লেদাক্ত ঘৃণায় ঘিনঘিন করে ওঠে।

আবছায়া আলো-অন্ধকারে শয্যার দিকে তাকায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, ঐ শয্যায় গিয়ে শুতে হবে—ঐ মানুষটার পাশে—

ভাবতেও কথাটা যেন তার কি একটা ক্লেদাক্ত অনুভূতিতে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবিমিশ্র একটা ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে ওঠে।

ঐ লোকটার স্পর্শের মধ্যে যেতেও যেন সমস্ত অন্তরাত্মা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকে—না—না—না—

সুচিত্রা শক্ত হাতে জানলার লোহার গ্রিলটা চেপে নিঃশ্বাস বন্ধ করে চোখ বুজে জানলাটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর বার বার আপন মনেই বলতে থাকে, না—না—না—

দু চোখের কোল বেয়ে নিঃশব্দে একটা অশ্রুর ধারা নেমে এসে অন্ধকারে তার গাল ও চিবুক প্লাবিত করতে থাকে।

॥ ২৭ ॥

এ কি হল—

ভগবান এ কি করলে—এমনি করে আমার সমস্ত সুখের সমস্ত আশার সমস্ত স্বপ্নের অবসান ঘটালে—

দুঃখিনী মেয়েটা তোমার পায়ে কি এমন অপরাধ করেছিল যে তাকে এমনি করে হৃতসর্বস্ব করে এতবড় লজ্জা ও অপমানের কালিটা তার সারাটা মুখে মাখিয়ে দিলে এমন করে—

যদি প্রতারণা করেও থাকি—সে তো ইচ্ছাকৃত নয়—

সে ভুলের কি প্রায়শ্চিত্ত নেই—

ক্ষমা কি নেই—

অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে একসময় ক্লান্ত হয়েই বোধহয় সুচিত্রা ঘরের মেঝেতে ঐ শীতের রাতেও মাত্র একটা চাদর গায়ে দিয়ে সামান্য একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে নিয়ে গা ঢেলে দিয়েছিল।

কখন একসময় বুঝি ঘুমিয়েও পড়েছিল—

হঠাৎ একটা স্পর্শের পীড়নে ঘুমটা ভেঙে গেল।

দু হাত দিয়ে কে তাকে জাপটে ধরেছে, অন্ধকারেও সদ্য ঘুম ভেঙে বুঝতে সুচিত্রার এতটুকু কষ্ট হয় না।

বুঝতে পারে সুচিত্রা অন্ধকারে কে এসে তার ভূশয্যায় ভাগ নিয়ে তাকে দুহাতে অমন করে নিষ্ঠুর কামনায় আঁকড়ে ধরেছে।

বোঝার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন সুচিত্রার সমস্ত অনুভূতি—সমস্ত চেতনা অবিমিশ্র একটা লজ্জায় ও ঘৃণায় একেবারে পাথর হয়ে যায়।

পুরুষের দু বাহুর বলিষ্ঠ পীড়ন।

ঘন ঘন নিঃশ্বাসের উষ্ণ ঝাপটা তার যেন সমস্ত চোখ মুখ পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে থাকে।

চাপা কণ্ঠে ডাকে তপন, সু—চল—বিছানায় চল—

সুচিত্রা পাথর—কোন সাড়া নেই।

সাড়া দেবে কি করে, সে তো তখন মৃতা বললেও বুঝি অত্যুক্তি হয় না—

সুচি, সু—

আবার মুখটা সুচিত্রার বুকের মধ্যে গুঁজে দিয়ে ডাকে তপন।

সুচিত্রা পড়ে থাকে পূর্ববৎ মড়ার মতই।

চল, সু বিছানায় চল, সুচি—

সুচিত্রা সাড়াও দেয় না—নড়েও না।

মৃতা সুচিত্রা—

ঘরের মধ্যে অন্ধকারে কামার্ত দুটো লোমশ কুৎসিত বাহু আরও পীড়ন করে—আরও বলিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষায় তার সমস্ত দেহটা যেন পেষণে পেষণে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতে থাকে—

একটা উন্মাদ কামনার ফেনিল উচ্ছ্বাস।

পাশবিক নির্লজ্জতা।

কিন্তু সব কিছুরই শেষ আছে।

এক সময় সেই পঙ্কিলতারও শেষ হল।

তপন অন্ধকারেই একসময় উঠে গেল, আর ঘৃণায় আকণ্ঠনিমজ্জিতা হয়ে তেমনি নিঃসাড়ে পড়ে রইল সেই ভূশয্যায় সুচিত্রা।

গলাটা তখন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।

সমস্ত শরীর যেন পাথরের মত ভারী।

সমস্ত চেতনা যেন ঘৃণায় জমাট বেঁধে গিয়েছে।

তপনের ঘুম ভাঙার অনেক আগেই সুচিত্রা ভূশয্যা থেকে উঠে পড়েছিল।

ক্লেদে সমস্ত শরীরটা যেন ঘিনঘিন করছিল।

সর্বাগ্রে সে গিয়ে বাথরুমে ঢুকল।

দীর্ঘ এক ঘণ্টা ধরে ঠাণ্ডা জলে—বরফ গলানো জলে ঐ শীতের সকালেও স্নান করল সুচিত্রা—

তবু ঘিনঘিন ভাবটা যেন দেহ ও মন থেকে যায় না।

স্নান করে কাপড় বদলে—ইলেকট্রিক হিটারে চায়ের জলটা চাপিয়ে শোবার ঘরে এসে দেখল, তপন তখনও ঘুমোচ্ছে।

ঘরের খোলা জানলাপথে ভোরের আলো এসে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে।

গলা পর্যন্ত লেপটা টেনে আরামে ঘুমোচ্ছে তপন।

সমস্ত মুখখানা জুড়ে একটা তৃপ্তির আনন্দ যেন ছড়িয়ে আছে।

তপনের ঘুমন্ত মুখটার দিকে চেয়ে থাকে সুচিত্রা।

গত রাত্রের সেই ক্লেদাক্ত স্মৃতিটা মনের পাতায় আপনা থেকেই যেন জেগে ওঠে।

আর সেই সঙ্গে মনে হয় ঘুমন্ত তপনের মুখখানা যেন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে—আকার নিচ্ছে একটা কুৎসিত অজগরের চ্যাপ্টা মুখে।

থেকে থেকে চ্যাপ্টা মুখ থেকে সরু চেরা জিভ যেন লিকলিক করে বের হয়ে আসছে—

একটা সাপ।

বিরাট একটা অজগর সাপ তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে যেন জড়িয়ে ধরেছে, তারপর পাক দিচ্ছে—

নির্মম পেষণে পেষণ করছে।

দম আটকে আসে সুচিত্রার।

সাপের বেষ্টনী থেকে নিজের দেহটাকে মুক্ত করতে চায়, আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু বৃথা—তার মুক্তি নেই—মুক্তি নেই।

সোঁ সোঁ একটা শব্দ. হঠাৎ চমকে ওঠে সুচিত্রা—পাশের ঘর থেকে কেতলীতে চাপানো হিটারে চায়ের জলটা শব্দ করে ফুটছে—

তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে সুচিত্রা।

সত্যিই চায়ের জল ফুটে গিয়েছিল।

হিটারটা নিভিয়ে কেতলীতে চায়ের পাতা দিয়ে দেয় সুচিত্রা।

মিনিট দশেক পরে চা তৈরী করে ধূমায়িত চায়ের কাপটা নিয়ে যখন এসে শয়নঘরে প্রবেশ করে সুচিত্রা—তপন তখনও ঘুমোচ্ছে।

ঘুমন্ত মুখের ওষ্ঠের প্রান্তে মৃদু একটা হাসির আভাস।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে তপন।

তপনের মুখখানা সত্যিই সুন্দর এবং গায়ের বর্ণও তার ভাই-বোনদের মধ্যে সব চাইতে বেশী ফর্সা।

হঠাৎ যেন ঐ মুহূর্তে ঘুমন্ত তপনকে নতুন করে আবিষ্কার করে সুচিত্রা।

একটু আগে যে মুখটাকে মনে হয়েছিল একটা অজগরের মুখ—কুৎসিত ভয়াবহ—এখন সেই মুখখানাকেই মনে হয় সুন্দর—শুধু সুন্দর নয়—অপূর্ব।

মনের সমস্ত ঘৃণা কখন যেন উবে গিয়েছে।

ঘৃণা উবে গিয়ে মমতায় সমস্ত মনটা ভরে উঠেছে।

চায়ের কাপটা হাতে ধীরে ধীরে শয্যার সামনেটিতে এগিয়ে যায় সুচিত্রা।

মৃদুকণ্ঠে ডাকে, শুনছ।

তপন পাশ ফিরে শোয়।

শুনছ, ওগো তোমার চা—

উঁ, মৃদুকণ্ঠে সাড়া দেয় তপন চোখ না খুলেই।

তোমার চা এনেছি—

উঁ—

ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে তোমার চা, ওঠ—চা-টা নাও—

তপন চোখ মেলে তাকাল।

কে—

আমি।

কী—

চা এনেছি।

চা—

হুঁ— ওঠ, নাও—জুড়িয়ে গেল—

তপন উঠে বসে সুচিত্রার হাত থেকে ধূমায়িত চায়ের কাপটা নেয়।

সুচিত্রা ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

তপন চায়ে চুমুক দেয়—

বাসি মুখে সদ্য ঘুম ভেঙে শীতের সকালে লেপের তলায় বসে গরম গরম চা-টা যেন ভারী ভাল লাগে তপনের।

সে মৃদু মৃদু চুমুক দিয়ে চা-টা উপভোগ করতে থাকে—

চমৎকার চা-টা বানিয়েছে তো সু!

সুচিত্রা, সু—

হঠাৎই বুঝি মনের পাতায় গত মধ্যরাত্রের স্মৃতিটা বিদ্যুৎ-চমকের মত ঝলকে ওঠে।

গত রাত্রে—

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল—

ঘরটা অন্ধকার।

বেশ ঠাণ্ডাও পড়েছিল রাত্রে—শীত করছিল।

নতুন সাটিনের মোলায়েম গরম লেপটা ভাল করে গায়ে টেনে নিতে গিয়েই সুচিত্রার তপ্ত দেহটার কথা বুঝি মনে পড়ে।

হাত বাড়ায় তপন, কিন্তু পায় না খুঁজে আকাঙ্ক্ষিত স্পর্শটা।

কোমল আতপ্ত একটা দেহ।

ঘুমের ঘোরটা ততক্ষণে কেটে গিয়েছে।

ভাল করে চোখ মেলে তাকায়।

ঘরটা অন্ধকার।

বাইরে ঝাপসা ঝাপসা চাঁদের আলো।

ভাল করে এবারে আর একবার খোঁজে শয্যার সর্বত্র সুচিত্রাকে, কিন্তু না—নেই সুচিত্রা শয্যায়—

আশ্চর্য, কোথায় গেল সুচিত্রা—

এদিক ওদিক তাকায়।

সুচিত্রাকে ঘরের মধ্যে কোথাও দেখতে পায় না।

আশ্চর্য! গেল কোথায় সুচিত্রা!

ধ্বক্ করে ওঠে বুকের মধ্যে হঠাৎ—

হঠাৎই কথাটা মনে হয়, চলে যায়নি তো সুচিত্রা—কিংবা কিছু একটা করে বসেনি তো—যে সব কথাগুলো বলেছে সে তাকে।

মেয়েদের মন—

কিছুদিন আগে মাত্র অফিসে এক সহকর্মীর জীবনে অমনি একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছে।

তার স্ত্রী—কি ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল, রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে—বাথরুমে গিয়ে শাড়ি গলায় দিয়ে আত্মহত্যা করে।

গিয়েছিল সে সংবাদটা পেয়ে—জিতেন ভৌমিকের গৃহে—

বীভৎস সে দৃশ্য—

শিউরে ওঠে—

শিউরে উঠে চোখ বোজে তপন।

সুচিত্রা কি তবে—

তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায় মেঝের ওপরে।

বেড সুইচ টিপে আলোটা জ্বালায় নামতে নামতে বিছানা থেকে।

উজ্জ্বল আলোয় দৃশ্যটা চোখে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

মেঝেতে একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে ঘুমুচ্ছে সুচিত্রা—

ঘুমিয়ে পড়েছে সুচিত্রা।

শীতের দরুন এবং গায়ে কোন গরম বা ভারী বস্ত্র না থাকায় একটু কুঁকড়ে শুয়ে আছে বটে—তবে তারই মধ্যে গাত্রাবাস কিছুটা শিথিল ও অসংবৃত।

এবং সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই সেই অসংবৃত বেশবাশের ফাঁকে ফাঁকে সুচিত্রার যৌবনপুষ্ট দেহটার ইঙ্গিত যেন মুহূর্তে রাত্রির সেই মধ্যখানে তপনের বুকের মধ্যে একটা লালসার আগুন জ্বালিয়ে দেয়—এবং যে আগুনের শিখাটা দেখতে দেখতে তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে মুহূর্তে।

লালসাসিক্ত চোখের দৃষ্টি দিয়ে নিদ্রিতা এক যুবতী নারীর অসংবৃত উদ্ধত যৌবনের ইঙ্গিতটা যেন লেহন করতে থাকে তপন।

ভুলে যায় ঐ মুহূর্তে সব কিছু—

ভুলে যায় সুচিত্রার সঙ্গে ঐ দিনই সন্ধ্যায় যে পর্ব হয়ে গিয়েছে তারপর তার ঐ কামনাকে অন্ততঃ গলা টিপে ধরে তার নিজের সম্মান ও ইজ্জতকে রক্ষা করা উচিত—

ভুলে যায়—সুচিত্রা—ঐ যুবতী তার স্ত্রী হলেও এবং তার দেহটার ওপরে তার সম্পূর্ণ অধিকার থাকলেও ঐ দিনই সন্ধ্যারাত্রে যা ঘটে গিয়েছে তারপর ওর দিকে অগ্রসর হওয়াও লজ্জার ব্যাপার—

তারই সম্পূর্ণ পরাজয়ের ব্যাপার।

শীতের ঐ ঠাণ্ডা রাত্রেও তার দু কান কি একটা উত্তাপে পুড়ে যেতে থাকে—একটা বিচিত্র অনুভূতি তার প্রতিটি রোমকূপে-কূপে ছড়িয়ে পড়ে তার সমস্ত চেতনাকে লালসার নেশায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে · অবশ করে ফেলেছে তখন।

মনের আদিম অন্ধকার থেকে যেন একটা ক্লেদাক্ত সরীসৃপ বের হয়ে এসে তার সমস্ত চেতনাকে অবশ আচ্ছন্ন করে কিলবিল করতে থাকে—তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরতে থাকে।

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে—আদিম একটা মানুষ অন্ধকারে সুচিত্রার ঘুমন্ত শিথিল দেহটাকে—দু'হাতে জাপটে ধরে—

আকণ্ঠ যেন লজ্জায় বুজে আসতে থাকে কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তপনের।

ছিঃ ছিঃ, কি সে করেছে কাল রাত্রে—

তার সমস্ত চেতনা কি লোপ পেয়েছিল!

সমস্ত বিচার বুদ্ধি কি একটা কামের পাশবিক পঙ্কিল আবর্তে তলিয়ে গিয়েছিল।

এ সে কি করেছে—

হাতের কাপ মধ্যপথে হাতেই ধরা থাকে—

আর চুমুক দিতে পারে না।
ক্ষণপূর্বের অত সুস্বাদু চা-টা যেন তিক্ত বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে।
পাশের ঘরে সুচিত্রা কাজ করছে—
বোধ হয় অফিসের রান্না চাপানো—ভাতে ভাত—ডিম সিদ্ধ—ঠুংঠুং আওয়াজের সঙ্গে সুচিত্রার হাতের চুড়ির আওয়াজ মিশে যাচ্ছে।
ও কি, গুনগুন করে গান গাইছে বলে মনে হচ্ছে –
হ্যাঁ—কান পেতে শোনে তপন—সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে শোনে—সুচিত্রাই গুনগুন করে গান গাইছে—মনে হয় যেন তার –
না, ওর চুড়ির আওয়াজ গানের সুরের মত মনে হচ্ছে।
সুচিত্রা তার বিবাহিতা স্ত্রী—
তার বৌ—
তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে সুচিত্রার ওপরে।
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমন ঝগড়া—কথা-কাটাকাটি হয়েই থাকে, তাই বলে—
তপন নিজের মনকে বুঝি প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে।
ঠাণ্ডা চা-টা এক চুমুকে নিঃশেষ করে শয্যা থেকে উঠে পড়ে।
মনটাকে সহজ করে নেয়।
মনের মধ্যে দ্বিধা সংকোচ ও মৃদু একটা লজ্জাবোধ যা এতক্ষণ বেশ পীড়ন করছিল সেগুলো মন থেকে তখন যেন একেবারে ঝেড়ে ফেলে দেয়।
না—কোন দ্বিধা-সংকোচের কারণ নেই।
গুনগুন করে একট গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে গলা উঁচিয়ে বলে, আজ কিন্তু আমার একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে সুচি, অফিসে year ending কাজের পাহাড় জমে আছে—
পাশের ঘব থেকে কেবল রান্নার আওয়াজ আসে—সুচিত্রার কোন সাড়া পাওয়া যায় না।
একেবারে দাড়ি কামিয়ে স্নান করেই নিল তপন।
নতুন একটা সুট করিয়েছিল, সেটা আজও পরা হয়নি, আলমারী থেকে সেই সুটটা আজ কি যেন ভেবে বের করে পরিধান করে।
ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বেঁধে সুটটা পরে ঘুরে ফিরে নিজের প্রতিবিম্বটা আরশির মসৃণ গাত্রে প্রতিফলিত দেখে—
না, মন্দ দেখাচ্ছে না—
বেশ স্মার্ট'ই তো দেখাচ্ছে—
আনন্দে শিস দেয় ধীরে ধীরে—
তারপর ডাকে—সু—
সাড়া পাওয়া যায় না সুচিত্রার।
আবার ডাকে, সু—

সাড়া নেই—

সুচি—সুচিত্রা—

সাড়া এল এবার পাশের ঘর থেকে, হয়ে গিয়েছে আমার, এস—

একটিবার এখানে এস তো—

উনুনে যে কড়াইয়ে ভাজার জন্য তেল চাপিয়েছি—

আঃ, এস না—

হঠাৎ বিরক্ত হয়ে ওঠে যেন তপন।

সুচিত্রা এসে ঘরে ঢুকল।

কি বলছ—

আমার রুমালটা পাচ্ছি না—

আলমারীর হ্যাঙারেই তো ঝোলান আছে—

আয়নার গাত্রে সুচিত্রার প্রতিবিম্ব দেখে তপন। সুচিত্রা এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছে।

ওরই দিকে চেয়ে আছে কিন্তু অগ্রসর হয় না।

দরজার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথাগুলো বলে।

পাচ্ছি না বললাম না—দিয়ে যাও—

হঠাৎ যেন গলার এতক্ষণের সুরটা তপনের কেটে গেল।

সম্পূর্ণ অন্য সুর—

কর্কশ রসহীন—মমতাহীন—

চাপা বিরক্তি আর ক্ষোভের গলা যেন।

সুচিত্রা শান্ত পায়ে এসে ঘরে ঢুকে আলমারীর পাল্লার গায়ে হ্যাঙার থেকে রুমাল একটা নিয়ে তপনের দিকে এগিয়ে দিল।

চোখের সামনেই আলমারীর হ্যাঙারে ছিল ভাঁজ করা রুমালগুলো—না দেখতে পাওয়ার কথা নয়। ইচ্ছে করে সুচিত্রা কথাটা বলে তপনকে। কিন্তু মনে মনে ভাবলেও মুখে কিছু বলে না।

তপন চেয়ে আছে স্ত্রীর মুখের দিকে।

পাথরে কুঁদে তোলা মুখখানা যেন।

কোন রকম ভাবের এতটুকু কম্পনও যেন কোথায়ও নেই সেই মুখের মধ্যে কোথাও।

রুমাল—

তপন রুমালটা নিয়ে বুকপকেটে গুঁজতে গুঁজতে বলে, thanks—

বিরক্তি আক্রোশ আর ক্ষোভের একটা চাপা মিশ্র সুর যেন গলার স্বরে—ধন্যবাদ কথাটাও যেন কর্কশ শোনায় কানে তার নিজেরই।

সুচিত্রা কিন্তু দাঁড়ায় না।

ঘর থেকে বের হয়ে যায় নিঃশব্দে।

দাঁতে দাঁত চেপে নিজের অসহ্য বিরক্তিটা যেন রোধ করবার চেষ্টা করে তপন।

এতক্ষণ অল্পে অল্পে মনের মধ্যে যে আনন্দের সুরটা দানা বেঁধে উঠছিল হঠাৎ যেন সেটার আর অবশিষ্ট মাত্রও নেই কোথায়ও।

সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে—

সামনেই আয়নার গায়ে প্রতিফলিত নিজের চেহারাটার দিকে তাকায়—সমস্ত মুখ জুড়ে বিরক্তিটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মুহূর্তকাল কি ভাবে।

মনটা আরও কঠিন হয়ে ওঠে—

তারপরই এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

সামনে এক চিলতে বারান্দা—পাশাপাশি আড়াইখানা ঘর।

প্রথমে শয়নঘর, মধ্যে—রান্নাঘরটা এক চিলতে।

তারপরই ড্রয়িংরুম।

ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে রান্নাঘরের খোলা দরজাপথে তপনের নজর পড়ে—ছোট টেবিলটায় কাচের ডিসে গরম ভাত বেড়ে দিয়েছে সুচিত্রা—

গরম ভাত থেকে ধোঁয়া উঠছে—

পাশেই মাছের বাটিটা—

একটা প্লেটে তার পাশে কিছু ভাজা—এক বাটি ডাল।

উনুনের কড়াইয়ে তখনও আরও যেন কি ফুটছে—

টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সুচিত্রা—বোধ করি তারই অপেক্ষায় দরজার দিকে চেয়ে।

দুজনে একবার চোখাচোখি হল।

মনটা আরও কঠিন হয়ে ওঠে তপনের।

নতুন জুতোর মচমচ শব্দ তুলে সে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

সুচিত্রা খোলা দরজার উপরে এসে দাঁড়ায়।

খাবার দিয়েছি টেবিলে—

শান্ত কণ্ঠে বলে কথাগুলো সুচিত্রা।

তপন কোন জবাব না দিয়ে এগিয়ে যায় আরও দু'পা।

সুচিত্রার কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল।

খাবে না—

না—

তপন চলার গতি সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে দিল।

দাঁড়াল না।

ফিরেও তাকাল না।

বাড়ি থেকে বের হয়ে সোজা এসে রাস্তায় নেমে হনহন করে হাঁটতে শুরু করে বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে।

এ সময়টা অফিস টাইম—

মাঝ রাস্তা থেকে বাসে ওঠা অসম্ভব একটা ব্যাপার বললেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই আধ মাইলটাক আরও পিছিয়ে গেলে উল্টোমুখে বাস-স্ট্যান্ডে খালি বাস পাওয়া যায়—কদিনের ওখান থেকে যাতায়াতের অভিজ্ঞতাতেই বুঝতে পেরেছিল তপন।

তপন বাস-স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে যায়।

॥ ২৯ ॥

কিন্তু চলন্ত বাসে বসে ডালহাউসির দিকে যেতে যেতে মনে হয় কেন যেন কাজটা বোধ হয় ভাল হল না—

করুণ দৃষ্টিতে কেমন যেন চেয়েছিল তার গমনপথের দিকে সুচিত্রা।

বেচারী সেই কোন্ সকাল থেকে উঠে রান্নাবান্না করেছে—

কদিন থেকে ভাতে ভাত খাচ্ছিল তাই গতকাল সকালে খাবার টেবিলে বসে বলেছিল, এই একঘেয়ে ভাতে ভাত আর ভাল লাগে না—একটা ভাজাভুজি করতে পার না—

তাই বোধ হয় মাছ আনিয়ে রেখেছিল কাল কিংবা বেহালা থেকে ফিরবার পথে টালীগঞ্জের বাজার থেকে মাছ নিয়ে এসেছিল—মাছের ঝোল—বেগুন ভাজা আলু ভাজা ডাল তরকারী সব করেছিল।

উঃ, কি যে চণ্ডাল রাগ হয়েছে—

দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

রান্না করছিল বেচারা তাই হয়তো আসতে পারবে না বলে বলেছিল রুমাল আলমারীতেই আছে—

আর রুমাল যে আলমারীর মধ্যে যথাস্থানে ছিল তা তো সেও দেখেছিল—শুধু সুচিত্রাকে ঘরে ডেকে আনবার জন্যই না ডাকা।

গত কালকের সন্ধ্যায় ও রাত্রির ব্যাপারটাকে সহজ করে নেবার জন্যই না ঐ সময় ডেকেছিল সুচিত্রাকে।

তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার ছিল—

নতুন সুটটায় তাকে কেমন মানিয়েছে—সুচিত্রা এসে দেখুক—সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়—

কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল।

মুহূর্তে সব ওলটপালট হয়ে গেল।

পরিকল্পনাটা তার সব ভেস্তে গেল। সুচিত্রাও ঘরে এল না, তার পরিকল্পনাও সিদ্ধ হল না—

কি যে বিশ্রী রাগ তার—

দপ্ করে জ্বলে ওঠে—রাগটা যেন হঠাৎ হয়ে পড়ে।

এই হঠাৎ রাগের জন্য—কত বড় রকমের ক্ষতি তার কত সময় আজ পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে—পরে কত না তার জন্য অনুশোচনা হয়েছে—

কিন্তু তবু—তবু পারেনি ঠিক সময়টিতে নিজেকে রোধ করতে।

আজও পারল না।

কাজের জন্যই তো ব্যস্ত ছিল, তাই ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আসতে পারেনি।

তাছাড়া গত দিনকার ব্যাপারের পর যদি কোথায়ও সুচিত্রার কোন কুণ্ঠা থেকেই থাকে—যে কারণে সে হয়ত আসতে পারেনি—তার জন্য তার অমন রুক্ষ ব্যবহার করাটা কি ঠিক হয়েছে ওর সঙ্গে ঐ ভাবে!

আর কাজ তো—তারই অফিসের ভাত তৈরী করছিল বেচারী।

তারপর রুক্ষ ব্যবহার করেছিল—শেষ পর্যন্ত ভাতটা খেয়ে এলেই তো লেঠা চুকে যেত—খাওয়ার টেবিলে বসে দুটো কথা বললেই হয়ত সব মিটে যেত—

কিন্তু সব সে রাগ করে, গোয়াতুর্মি করে নষ্ট করে দিয়ে এল।

নিজের উপরেই তপনের নিজের এত রাগ হতে থাকে যে ইচ্ছে হয় নিজের গালে নিজে গোটাকয়েক ঠাস্ ঠাস্ করে চড় বসিয়ে দেয়।

ক্ষোভে বিহ্বল অশান্ত বিক্ষিপ্ত একটা মন নিয়ে তপন অফিসে এসে প্রবেশ করল। এবং দুর্ভাগ্য যে কখনও একা আসে না সেটা যেন তপন সেদিন অফিসে বসে মর্মে মর্মে অনুভব করে।

অফিসের অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজার মিঃ মহীন্দ্র সিং লোকটা যেমন বদমেজাজী তেমনি প্রচন্ড কেতাদুরস্ত ডিসিপ্লিন-মানা সাহেব একজন।

তার উপরে নিজে সে পাঞ্জাবী—তাই একমাত্র পাঞ্জাবী ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশের লোককেই সে ভাল চোখে দেখে না।

সবাই ইনফিরিয়ার—তাদের অর্থাৎ পাঞ্জাবীদের চাইতে—তার একটা বদ্ধমূল ধারণা, তার মধ্যে আবার সব চাইতে বেশী বিরাগ যেন বাঙালীদের উপর।

বিজনেস ট্রেনিং নিয়ে বিলেত থেকে আসবার সময় এক মেমসাহেবকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে—

নতুন বাসায় যাওয়া অবধি মন-মেজাজটা যেন কিছুতেই ভাল যাচ্ছিল না—তাই কাজকর্মে রীতিমত ঢিলে পড়েছিল তপনের।

তাছাড়া ইয়ার এনডিংয়ের ব্যাপারে এদের অফিসে ডিসেম্বর থেকেই কাজ-কর্মের চাপ পড়ে, তাই কাজও পড়েছিল—অথচ কাজ হয়নি, জমে উঠেছে।

সেদিন বেলা তখনও সাড়ে এগারটাও বাজেনি, অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজারের ঘরে ডাক পড়ল তপনের—

তপন মহীন্দ্র সিংয়ের ঘরে ঢুকতেই সে তার আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল—তারপরই প্রশ্ন করে, ফাইলগুলো সব কমপ্লিট হয়েছে?

না—

কেন?

করছি—অনেক কাজ—

But you are paid for that—

তপন চুপ। এবং ঐখানেই শেষ নয়—

How much you get Baboo—

হঠাৎ প্রশ্নটায় যেন চমকে ওঠে মিঃ সিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তপন।

অর্থাৎ সে জিজ্ঞাসা করছে তার মাইনে কত—

তপন ব্যাপারটা বুঝেও থতমত খেয়েই একটু চেয়ে থাকে অ্যাসিসটেণ্ট ম্যানেজারের দিকে।

মহীন্দ্র সিং বলে, তোমার পোশাক দেখে তো মনে হচ্ছে অফিসে আমার চাইতে মাইনে তোমায় বেশী—

সঙ্গে সঙ্গে এবারে দপ্ করে জ্বলে ওঠে তপন।

অপমানে কান দুটো তার লাল হয়ে ওঠে—ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে।

ফর্সা মুখটা লাল হয়ে যেন ফেটে পড়তে চায়।

চাপা আক্রোশ-ভরা চোখে তাকায় তপন সিংয়ের মুখের দিকে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই—তার বেশী বলতে পারে না বা করতে পারে না কিছুই।

মিঃ সিং বলে, শোন বাবু—I want work—কাজ কমপ্লিট করে তোমার যা খুশি তাই করতে পার—অফিসে যদি দু ঘণ্টা লেটে আসো বা দুদিন কামাই কর বা প্রিন্সের মত সেজে বেড়াও আমি সেদিকে তাকাব না জেন—কিন্তু কাজ incomplete রেখে—কথাটা তখনও শেষ হয়নি—ফ্ল্যাট হীলের খট্‌খট্ শব্দ সুইং ডোরের ওদিকে এসে থেমে গেল—

একজোড়া লেডিস্ সু পরিহিত পা—তার উপরে শাড়ির পাড় দেখা গেল—

মিঃ সিং কথা থামিয়ে বলে, ইয়েস মিসেস সেন, কাম ইন—

সুচিত্রা এসে ঘরে ঢুকল—হাতে তার ধরা দুটো ফাইল।

তপনের কান ও মুখটা আরও লাল হয়ে ওঠে কারণ সে বুঝতে পারে সুচিত্রা সুনিশ্চিত মহীন্দ্র সিংয়ের শেষের কথাগুলো তার সম্পর্কে শুনেছে।

তপনের মনে হয় এই মুহূর্তে যদি তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেত—

সিংয়ের বোধ করি আরও কিছু বলবার ইচ্ছে ছিল—এবং বলতে শুরুও করেছিল, সে, হ্যাঁ যা বলছিলাম, incomplete রেখে—

কিন্তু কথা বলা হল না সিংয়ের। বাধা পড়ল—

সুচিত্রাই বাধা দিল, কি দুটো জরুরী চিঠি ডিকটেট্ করবেন বলেছিলেন?

ও—হ্যাঁ—বস বস—take down—তুমি এখন যেতে পার মিঃ সেন।

তপন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

এবং ঘর থেকে সুইং ডোরটা ঠেলে বের হয়ে আসতে আসতে কানে এল সিংয়ের শেষ কথাগুলো—worthless—কাজ করবে না অথচ princeয়ের মত সেজে আসবে—যেন এটা অফিস নয়—সিনেমা থিয়েটার দেখতে এসেছে।

তপন এসে নিজের সিটে বসল।

নিদারুণ একটা তিক্ততায় সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে গিয়েছে।

মনে হয়েছিল লোকটার গালে ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলে আসে—hang your service—এই রইল তোমার চাকরি—ড্যাম্ ইট্—

কিন্তু পারেনি—

মনে তো মানুষের অনেক কিছুই হয় কিন্তু সব কি পারা যায়—না এ সংসারে কেউ তা পারে!

বাড়ি হলে আজকে হয়ত ঐ কথার পর কাটাকাটি রক্তারক্তি হয়ে যেত কিন্তু এ হচ্ছে অফিস—

অন্নের ব্যাপার—

তাছাড়া এই চাকরির উপর নির্ভর করেই না সে আজ বাড়ি ছেড়ে আসতে পেরেছে—এই চাকরির শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে সে বলেই না নিশ্চিন্ত।

সামান্য আই. এ. পাস করে ও কিছু টাইপিং শিখে এর চাইতে বেশী সে কী আর আশা করে—

স্টেনোও তো হতে পারেনি—

পাকাপোক্ত চাকরি—

প্রভিডেণ্ট ফন্ড আছে। ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স আছে।

এ চাকরি কি আজকের দিনে ছাড়ব বললেই ছাড়া যায়।

তাছাড়া অমন কথা শুনতে হয় না কাকে—চাকরি করতে হলে শুনতেই হয়—হবেও। কেন, ঐ সিংকেও শুনতে হয় না?

ওর ওপরওয়ালা কি ওকে ছেড়ে কথা বলে?

না কথা বলবে—

তবে—তারই বা এতে এত লজ্জার কি আছে। এমন তো আকছার হয়েই থাকে।

কিন্তু সুচিত্রা—

সুচিত্রা যদি হঠাৎ ঐ সময় সামনে না এসে পড়ত!

কেন, আসবার আর সময় পেল না সে—

ইচ্ছে করেই নিশ্চয় এসেছে।

সিং তো আস্তে আস্তে কথা বলেনি—চিৎকার করছিল—অফিসের লোকদের—ঘরের সামনে বিশেষ করে যারা বসে তাদের কানে কথাগুলো প্রবেশ করতে কোন কষ্টই হয়নি।

হয়ত সুচিত্রাও তাকে সিং বকছে শুনেই ঐ সময় ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিল—তার অপমান—তার লাঞ্ছনাটা চোখের সামনে দেখে উপভোগ করবার জন্য।

মেয়েমানুষ সব পারে—সুচিত্রাও তাই করেছে।

আশ্চর্য !

একবারও তপনের মনে হল না—সুচিত্রা সত্যি সত্যি সিংয়ের চিৎকার শুনেই তার ঘরের সামনে গিয়ে ঐ সময় দাঁড়িয়ে ছিল বটে কিন্তু সেটা তার লাঞ্ছনাকে উপভোগ করতে নয়—সামনে দাঁড়িয়ে বরং লাঞ্ছনার হাত থেকে তপনকে ঐ মুহূর্তে বাঁচাবার জন্য ঐ সময় সে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সিংকে অন্যমনস্ক করে দিতে, ব্যাপারটা চাপা দিতে।

কিন্তু মানুষের মন যখন কারও প্রতি অভিমানে আক্রোশে ফুঁসতে থাকে তখন সে তার ব্যাপারে অন্ধই হয়ে যায়।

অপর পক্ষের সত্যিকারের চেহারাটা যেন কিছুতেই তার চোখে পড়ে না—পড়তে চায় না।

॥ ৩০ ॥

অথচ একটিবারও যদি সুস্থ মস্তিষ্কে মনটাকে ঠাণ্ডা করে সুচিত্রাকে বোঝবার সেদিনও চেষ্টা করত তপন—হয়ত জীবনের পরবর্তী কালের সর্বাপেক্ষা বড় দুঃখ আর নিরাশা থেকে মুক্তি পেতে পারত।

কিন্তু তা হল না সেদিন।

যা হবার ঠিক তাই হল।

তপন সুচিত্রাকে ভুল বুঝেই বসে রইল—

যদিও সে জানতে পারল না ঠিক ঐ সময় সে চলে আসার পর সিংয়ের সঙ্গে সুচিত্রার কি কথাবার্তা হচ্ছিল এবং সে কথাগুলো সুচিত্রা বলছিল সিংকে তারই মঙ্গলের জন্য—

তারই ভালর দিকটা ভেবে।

মহীন্দ্র সিং জানত না যে সুচিত্রার স্বামীই ঐ তপন সেন—

সুচিত্রা ব্যানার্জী যেদিন মহীন্দ্র সিংয়ের পার্সোন্যাল স্টেনো হয় সিংয়ের নিজস্ব নির্বাচনে—সেদিন সুচিত্রার প্রতি সিংয়ের মনের তারে কোথায় যেন একটা কোমল সুর হঠাৎ বেজে উঠেছিল—

দেখতে সুচিত্রা ভাল নয়।

বসন্ত-ক্ষত-লাঞ্ছিত মুখ।

কিন্তু তার দেহবল্লবীর অপূর্ব একটা আলগা শ্রী ও লাবণ্য ছিল।

যৌবনসুষমা যেন তার সর্ব অঙ্গে ঢল-ঢল কমনীয়তায় উপছে পড়ছে, এবং যেটা পুরুষ মাত্রেরই চোখকে, চোখের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করত।

সিংয়ের চোখের দৃষ্টিকেও মুগ্ধ করেছিল সেই রূপমাধুরীই, সেই যৌবনসুষমাই সুচিত্রার।

মেয়ে হয়ে সে কথা জানতে বা বুঝতে দেরি হয়নি খুব বেশী সুচিত্রার।

সিংয়ের চোখের দিকে কয়েকদিন তাকাতেই বুঝতে পেরেছিল এবং তপন সবে ঐ অফিসে জয়েন করেছে।

এবং তপনের সঙ্গে তখনও তার আলাপ-পরিচয় কিছু হয়নি।

তাই হয়ত সুচিত্রা ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করেই সাবধানতার সঙ্গে কিছুটা প্রশ্রয়ের লাগাম ছেড়ে দিয়েছিল ঢিলে করে।

এবং অফিসে জানাজানি হতে দেরি হয়নি। সুচিত্রা মিঃ সিংয়ের পার্সোন্যাল স্টেনো। বিশেষ প্রিয় পাত্রী তার।

তার সুপারিশের দাম আছে।

অফিসের সকলে বুঝে নিয়েছিল সুচিত্রা ছোট সাহেব সিংকে কোন একটা অনুরোধ করলে ছোট সাহেব সেটা ফেলবে না।

এবং কথাটা জানাজানি হবার পর সুচিত্রাকে মধ্যে মধ্যে তেমন অনুরোধ করতে হয়েছে, মিঃ সিংকে—আর সিংও সে সব অনুরোধ সুচিত্রার ফেলে দেয়নি।

রক্ষা করেছে, সম্মান দিয়েছে—

সেই কারণেই অফিসের ছোটর দল সুচিত্রাকে যেমন সমীহ করত তেমনি তাকে সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করত।

কেউ কেউ তো ঘনিষ্ঠ হবারও চেষ্টা করেছে।

ব্যতিক্রম ছিল তপন বরাবর।

তপন বিশেষ একটা সুচিত্রার ধারে-কাছে ঘেঁষত না।

সে তার নিজের কাজ নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত থাকত।

তার নিজের কাজ বরাবরই ছিল ছিমছাম এবং যথাসম্ভব ত্রুটিবিহীন।

প্রায় হাত-পাঁচেকের ব্যবধানে মুখোমুখি দুজনের বসবার সীট ছিল সুচিত্রা ও তপনের।

একজন ফরেন এক্সপোর্টের টাইপ ক্লার্ক—অন্যজন ছোট সাহেবের পার্সোন্যাল স্টেনো।

মাইনের দিক থেকে প্রায় দুজনেই সমান।

কিন্তু অতনুর তীর যে কোথায় কখন বেঁধে! অলক্ষ্য পথে কার বুকের ভিতরটিতে এসে বিদ্ধ হয় কেউ তা জানে না—জানতে পারে না।

কেউ কারও সঙ্গে সুচিত্রা বা তপন বড় একটা কথাও বলত না—ভদ্রতার খাতিরে দু-একটা প্রশ্ন ব্যতীত।

তবে চোখাচোখি হলে দুজনের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু একটি হাসির রেখা জেগে উঠত—কিন্তু সেই নিঃশব্দ হাসি ও নিঃশব্দ দৃষ্টি-বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই যে পরস্পরের বুকে কখন অতনুর তীরটি এসে বিদ্ধ হয়েছে ওরা কেউ তা জানতে পারেনি।

· পারেনি জানাতে কখন ওরা একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

তাই বোধ করি ওদের ঘনিষ্ঠতাটা অফিসে প্রথম সবার চোখে পড়লে সকলেই একটু যেন বিস্মিত হয়েছিল।

আশ্চর্য!

কখন কি ঘটল।

কখন ওরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসল।

আশ্চর্য হবার আরও একটা কারণ ছিল—তপন সত্যিই সুপুরুষ—বিশেষ করে সুচিত্রার তুলনায়।

সুচিত্রা কালো—মুখে বসন্তের দাগের জন্য মুখশ্রীও সুন্দর নয়—

তবু ওদের দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হল—ভালবাসা—প্রেম হল।

বিস্ময়ের ব্যাপার বৈকি। বিশেষ করে আজকের দিনে।

এবং সে বিস্ময়টা চরমে উঠল সেদিন যেদিন কেউ কেউ ওদের বিবাহের ব্যাপারটা জানতে পারল। ওদের নাকি বিয়ে হয়ে গিয়েছে রেজিস্ট্রি করে।

ঘনিষ্ঠতার দিনে যেমন তপন বা সুচিত্রা কোন হৈচৈ করেনি—তেমনি বিবাহের দিনেও ওরা করল না কিছু।

সাধারণ এক ভোজ বা মিলন উৎসব যা সচরাচর হয়ে থাকে তাও ওদের বিবাহের ব্যাপারে হল না।

শুধু জানতে পারল ওরা, বিবাহ হয়েছে ওদের।

তপন সেনের সঙ্গে সুচিত্রা ব্যানার্জীর রেজেস্ট্রি ম্যারেজ—বিবাহ হয়েছে।

কথাটা বিয়ের পরদিন নিজের মুখে সুচিত্রা কোন একটি লোককেই বলেছিল অফিসে—

সে হচ্ছে অফিসের দোর্দণ্ডপ্রতাপ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার মহীন্দ্র সিং।

ডিকটেশন নিচ্ছিল সুচিত্রা মিঃ সিংয়ের কাছে বসে।

কি একটা কথায় সিং বলে, না—ও ব্যাপারটা কেটে দাও মিস্ ব্যানার্জী—

সুচিত্রা ঐ সময় মুখটা তোলে।

মিঃ সিং—

ইয়েস মিস্ ব্যানার্জী—

একটা কথা—আমি আর ব্যানার্জী নেই—

মানে—I could not follow you—

মাথাটা নীচু করে সুচিত্রা বলে, আমি বিয়ে করেছি—আমার পদবী এখন সেন—

হঠাৎ যেন কথাটা শুনে স্তব্ধ হয়ে যায় মিঃ সিং।

কয়েকটা মুহূর্ত কোন কথাই বের হয় না অতঃপর তার মুখ দিয়ে।

কিন্তু সে কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র—তারপরই মিঃ সিং সহাস্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সুচিত্রার দিকে আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠে—Congratulations Mrs. Sen—

পরস্পর হাতে হাত দিয়ে প্রীতি জানায় ও গ্রহণ করে।

মিঃ সিংয়ের সুচিত্রার প্রতি ব্যবহারের কিন্তু কোন তারতম্য ঘটল না—

ওদের পরস্পরের সম্পর্ক পূর্ববৎই রইল।

সেদিন সত্যিসত্যিই তপনকে বকতে শুনে সুচিত্রা সিংয়ের ঘরে এসে ঢুকেছিল।

চিঠির নোট নিতে নিতে একসময় সুচিত্রা মুখ তুলল—

সিংয়ের আজ নোট দিতে পদে পদেই যেন বেধে যাচ্ছে—সে যে কেবল বিরক্ত তাই নয়—কেমন যেন চঞ্চল—চিন্তিত—বিক্ষুব্ধ।

মুখখানাও যেন কেমন বিষণ্ণ।

মিঃ সিং—

ইয়েস—

তোমার কি শরীরটা ভাল নেই ?

না, না—I am allright—

চিঠি দুটো এমন জরুরী নয়—থাক না হয় আজ।

না, না—you take down !

সুচিত্রা কিন্তু ততক্ষণে কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। শান্ত কণ্ঠে বলে, না, আজ থাক—

কিন্তু—

তুমি বরং রেস্ট নাও—একটু—

মিসেস্ সেন—

সুচিত্রা পা বাড়িয়েছিল, সেই ডাকে ঘুরে দাঁড়াল, কিছু বলছিলে—

You are right—সত্যিই মনটা আমার চঞ্চল—

বুঝতে পেরেছিলাম আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়েই—সুচিত্রা বলে।

জান, গতকাল অ্যানিটা চলে গেছে !

অ্যানিটা মানে—

হ্যাঁ—my wife Mrs Singh—

সুচিত্রা কোন প্রশ্ন না করে নির্বাক চেয়ে থাকে কেবল মহীন্দ্র সিংয়ের মুখের দিকে।

সে আমাদের দীর্ঘ ছ বছরের বিবাহিত জীবন—আমাদের only issue প্রতাপ—কিছু ভাবল না, অফিস থেকে গতকাল ফিরে গিয়ে দেখি সে চলে গিয়েছে একটা চিঠি লিখে রেখে—

চিঠি !

হ্যাঁ, সে নাকি অসুখী অসুস্থ বোধ করছিল নিজেকে আমার সংসারে।

কেন ?

জানি না।

কিছু হয়েছিল কি ?...

না। Not to my knowledge. তবে কিছুদিন থেকেই তাকে যেন কেমন indifferent মনে হচ্ছিল, সংসারের প্রতি unmindfull—

যাবার আগে মিসেস্ সিং চিঠিতে কি কিছু লিখে রেখে গিয়েছে ?

হ্যাঁ—লিখেছে।

কী ?

সে নাকি আমাকে মানিয়ে নিতে পারল না।

কিন্তু তোমাদের তো বললে ছ বছর হল—

হ্যাঁ—ছ বছর পরে সে নাকি আবিষ্কার করেছে—আমি অত্যন্ত cold passive, তার প্রতি indifferent, which is nothing but cruelty on my part. যাক তোমাকে কেন এসব কথা বলে বিব্রত করছি, যে ব্যাপার একান্ত আমারই—

মহীন্দ্র সিংয়ের গলার মধ্যে যেন চাপা একটা কান্নার সুর।

হঠাৎ ঐ মুহূর্তে কেন যেন সুচিত্রার মনে হয়—লোকটা অত্যন্ত একা। আশেপাশে ওর কেউ নেই—একটি স্নেহকরুণ মমতার কথা বলে ওকে সান্ত্বনা দেবে এমন কেউ নেই যেন ওর কাছে—

অসহায় করুণ।

তুমি জান না সে কোথায়—সে কোথায় গেছে?

না, খোঁজ করিনি—তবে জানি সে কোথায়?

জান?

জানি বৈকি—

কোথায়?

তার boy-friend বলে এতদিন যার পরিচয় দিয়েছে—আর্মি অফিসার একজন স্কচ্‌ম্যান লেঃ গিবসন্‌, বিলেতে থাকতেই নাকি তাদের পরিচয় ছিল, ব্রিটিশ আর্মিতে ছিল, ভারত স্বাধীন হবার পর সে ইণ্ডিয়ান আর্মিতে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছে।

তাই বুঝি—

হ্যাঁ, যদিও সে একজন স্কচ্‌—জন্ম তার এই ভারতবর্ষেই, সিমলাতে।

সিমলাতে!

হ্যাঁ born and brought up in India. ওর বাবাও একজন আর্মি অফিসার ছিল এবং দীর্ঘকাল ইণ্ডিয়াতে ছিল এবং এখানেই তার মৃত্যু হয়—ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিল মৃত্যুর মাস দুই পূর্বে—

একটা কথা বলব মিঃ সিং—

বল—

If you don't take it otherwise—

না, না, বল।

অ্যানিটা মানে মিসেস্‌ সিংয়ের ওখানে একবার গেলে পারতে—

মৃদু করুণ একটা হাসির রেখা ওষ্ঠের কোণে জেগে ওঠে মহীন্দ্র সিংয়ের। বলে, কোন লাভ হবে না—

না না, তবু একবার তার কাছে গেলে পারতে—হয়ত ঝোঁকের মাথায়—

না মিসেস্‌ সেন—you don't know these English girls, ইংরেজ মেয়েদের তুমি চেন না। এসব ব্যাপারে এদের কাছে—এ ধরনের সেণ্টিমেণ্টকে ওরা নির্বুদ্ধিতা বলেই মনে করে—কোন দাম নেই ওসবের এদের কাছে। তাছাড়া ছ বছরের তৈরী

ঘর ফেলে—ছ বছরের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যারা এত সহজে অনায়াসে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারে তাদের কানে কি কারও কোন appeal পৌঁছয়—they are deaf—কালা—শুনতে পায় না—শোনবার ক্ষমতাও নেই—

কিন্তু তার সন্তান প্রতাপ—

ওদের আবার সন্তান—

কি বলছ তুমি, কথায় বলে মা আর সন্তান—

মা আর সন্তান—হুঁ, ওটা ওদের জীবনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একটা পুরুষ ও নারীর মিলিত জীবনের অতি তুচ্ছ ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়—

কিন্তু—

না, কোন ফল হবে না, অথচ জান একদিন ঐ অ্যানিটার জন্য আমার সমস্ত আত্মীয়পরিজনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। অথচ—

মহীন্দ্র সিংয়ের কথাটা শেষ হল না।

টেলিফোনটা টেবিলের ওপরে বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং করে।

মহীন্দ্র সিং শিথিল হাতে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল।

॥ ৩১ ॥

অনেক রাত্রে ফিরে এসে বাড়ির বন্ধ সদর দরজার সামনে দাঁড়াল তাপস।

খুব কমপক্ষে রাত তখন দেড়টা তো হবেই।

বাড়ির সবাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

এবং বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়ানোর পর মনে হল তাপসের এখন এত রাত্রে কে জেগে আছে বাড়িতে!

কে তাকে দরজা খুলে দেবে!

অভ্যাসবশতঃ এবং অন্যমনস্কভাবে সদরের কলিংবেলটা টিপেছিল একবার তাপস।

ফিরতে প্রায়ই রাত হয় বলে সদরে একটা কলিংবেল নিজের খরচাতেই লাগিয়ে নিয়েছিল তাপস এবং সে বেলটা বাজত তিনতলার ছাতে কৃষ্ণার ঘরে।

কিন্তু বেলটা টেপবার সঙ্গে সঙ্গেই তার খেয়াল হয়—এ কি করছে সে—

এত রাত্রে কি কৃষ্ণা জেগে আছে নাকি—

কিন্তু তাপস জানত না ফাইন্যাল পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে বলে কৃষ্ণা ইদানীং রাত দুটো-আড়াইটে পর্যন্ত জেগে বসে পড়াশুনো করত।

বেলের শব্দে ইতিমধ্যে কৃষ্ণা নীচেও নেমে এসেছিল।

তাপস যখন দরজার সামনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে কি করবে না করবে—ফিরে যাবে কিনা শেষ পর্যন্ত—

দরজাটা খুলে গেল।

সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণা।

এ কি রে—পেত্নী তুই জেগেছিলি নাকি !

চল—

তাপস আর বাক্যব্যয় না করে ভেতরে প্রবেশ করে।

সবাই বাড়িতে ঘুমোচ্ছে।

শীতের রাত্রে লেপ কম্বল মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে সুখনিদ্রায় মগ্ন।

ছাতে এসে প্রশ্ন করে, এত রাত হল যে ছোড়দা ফিরতে ?

হয়ে গেল রে, বুঝতে পারিনি—

খেয়েছ কিছু ?

হ্যাঁ—

তাপস হোটেলেই আজ রাজকীয় আহার্যে পেট ভরিয়েছিল।

তাপস নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে কথাটা বলে—পশ্চাৎ থেকে ডাকল কৃষ্ণা, ছোড়দা—

কিরে লীলাবতী—

জান ছোড়দা—লাবণ্য চলে গিয়েছে—

চকিতে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ায় তাপস। বলে, লাবণ্য চলে গিয়েছে ! কোথায় ?

একটা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছে, সে বিশ্বনাথকে বিয়ে করেছে—

কি বলছিস রে—

হ্যাঁ ছোড়দা—

বিশ্বনাথকে বিয়ে করেছে কখন, কবে বিয়ে করল ?

কি জানি ! রেজেস্ট্রি করে নাকি ওদের বিয়ে হয়েছে—আমাদের ঐ যে তিনতলা বাড়িটা—

জানি টেকো রসময় মল্লিক—যার বড়বাজারে লোহার দোকান আছে—

হ্যাঁ হ্যাঁ টেকো—রসময়—

তারই ছেলে বিশ্বনাথ লাবণ্যকে বিয়ে করেছে !

হ্যাঁ—

মানে ঐ সাতবার ম্যাট্রিক ফেল—রকবাজি করে বেড়ায় দিবারাত্র সেই বিশেটাকে—

হ্যাঁ—

কিন্তু—

কী ?

বিশ্বনাথের সঙ্গে লাবণ্যর ভাব হল আবার কবে ? ও তো—

আরও হয়ত কিছু বলার ইচ্ছে ছিল তাপসের কিন্তু বলে না—বিশ্বনাথ প্রসঙ্গের ওপর অকস্মাৎ দাঁড়ি টেনে দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে আসে।

বলে, বাবা জানেন ?

জানেন—

কি বললেন বাবা ?

কিছুই বলেননি।

বলিস কি।

হ্যাঁ—বরং পিসিমা—

পিসিমা কি ?

পিসিমা সংবাদটা পাওয়া মাত্রই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল—

তাই বুঝি—

হ্যাঁ—বলেছে—লাবণ্য তার মারা গেছে—আর এ জীবনে তার মুখদর্শন করবে না।.

যাক, ভালই হয়েছে।

তুমিও বলছ ভাল হয়েছে ছোড়দা—

নিশ্চয়ই, লাবণ্যটা যে রেটে বাড়াবাড়ি শুরু করছিল আমার তো সর্বদাই একটা ভয় ছিল কবে কি একটা জঘন্য কেলেঙ্কারি না করে বসে। তা ভালই করেছে বিয়ে করেছে—হুঃ বাহাদুর মেয়ে বলতে হবে! নিজের ফিউচারটা নিজেই করে নিল। ভালই হয়েছে। কেলেঙ্কারি করে বেড়ানোর চেয়ে এ ভালই করল। আর ঐ বেটা টেকো রসময়, ও ঠিক ম্যানেজ করে নেবে। বিশ্বনাথ তৈরী ছেলে—চালু একের নম্বর ; পিসিমার যত বাড়াবাড়ি। হুঃ—অল্প বয়েসে মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে বিধবা হয়েছিল—এ তো ভালই হল।

কিন্তু ছোড়দা—

কী—

বিশ্বনাথ ছেলে ভাল নয়—

লেখাপড়া তেমন করেনি—তা লেখাপড়া তো আমিও করিনি, মদটা আসটা তো আমিও খাই—

কিসে আর কিসে—তোমার সঙ্গে তার তুলনা হয় নাকি!

কেন, তার সঙ্গে আমার তফাতটা কোথায় ?

তোমার মত যদি বিশ্বনাথ হত তাহলে তো বুঝতাম লাবণ্যদির অক্ষয় স্বর্গবাস ঘটল—

কি বলছিল রে পেত্নী—

তাই লাবণ্যদি বোধ হয় ভুলই করল।

না, না—ভালই হল দেখবি—

দেখব বৈকি—তবে ভুল আমি করিনি ছোড়দা—মেয়েমানুষ আমাদের যাই ভুল হোক না কেন পুরুষমানুষকে চিনতে কোনদিন ভুল হয় না।

কথাটা বলে কৃষ্ণা আর দাঁড়াল না। ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

তাপসও তার ঘরে এসে ঢোকে।

গায়ের জামাটা খুলে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে জানলার সামনে এসে দাঁড়ায়।

বাইরে রাত্রি রহস্যময়ী—পাতলা কুয়াশার একটা আচ্ছাদন গায়ে জড়িয়ে যেন।

সত্যিই কি ভুল করল নাকি লাবণ্য!

কে জানে—

ভুল যদি সত্যিই করে থাকে তবে যে ব্যাপারটা রীতিমত দুঃখের এবং মর্মান্তিক হবে সন্দেহমাত্র নেই তাতে।

পিসিমার মন সেকেলে মন।

সেকেলে সংস্কারে ভরা।

এ ধরনের বিয়েকে, বিধবার এই দ্বিতীয়বার বিবাহকে সহজে তারা মেনে নিতে পারবে না—স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্রই ব্যাপারটা তার বিচারে।

আজকের দুনিয়াটা যতই এগিয়ে গিয়ে থাক না কেন পিসিমাদের দল এখনও সেই মধ্যযুগের সংস্কার ও নীতিতে বাঁধা পড়ে আছে।

এ তাদের কাছে নির্লজ্জতাই নয় কেবল, অসহনীয় স্বেচ্ছাচারিতা—

এ বিয়েকে সে আশীর্বাদ জানাবে কেমন করে—পারবে না তো - কোনদিন পারবে না আর তাই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য—

বাবা ওদেরই যুগের মানুষ হয়েও ব্যাপারটা সহজ ভাবে নিয়েছেন।

চিয়ারিও ফাদার।

কিন্তু কৃষ্ণা বললে, লাবণ্য নাকি ভুল করল!

এ বিয়ে তার মতে সুখের নাকি হতে পারে না—

অনেকগুলো কথাই আজ বলেছে কৃষ্ণা। এত কথা বড় একটা সে বলে না।

বাড়ির মধ্যে সবচাইতে ওই কম কথা বলে।

কিন্তু মনে হল সেও বিচলিত হয়েছে লাবণ্যের বিবাহের ব্যাপারে।

কিন্তু কেন—

বিশ্বনাথ ছেলেটা বড়লোকের ছেলে, পড়াশুনা না করে বয়ে গিয়েছে সত্যি কিন্তু লাবণ্যকে যখন ভালবেসে বিয়ে করেছে—লাবণ্যও তাকে ভালবেসেছে (নচেৎ এ বিয়ে হত না) তখন কেন সুখী হবে না ওরা।

কোথায় বাধাটা ?

লাবণ্য সম্পর্কে কৃষ্ণার ভবিষ্যৎ-বাণীটা যে মিথ্যা নয় সেটা প্রমাণিত হয়েছিল কয়েক মাসের মধ্যেই যখন এক রাত্রে লাবণ্য ও তার নবজাত শিশুকন্যাকে অসহায় আসানসোলের এক হাসপাতালে ফেলে রেখে বিশ্বনাথ উধাও হয়েছিল।

এবং সেই শিশুকন্যাকে বুকে নিয়ে লাবণ্য সেদিন অনন্যোপায় রুগ্ন জীর্ণ দেহ নিয়ে এসে রিকশায় করে স্টেশন থেকে এক সন্ধ্যার অন্ধকারে আবার তাদের বাসার সামনে নেমেছিল।

কিন্তু সে তো আরও অনেক পরের কথা।

সে রাত্রে বিছানায় শুয়েও অনেক রাত্রে ঘুম এসেছিল তাপসের।

এবং পরের দিন ঘুমটা ভাঙল মায়ের ডাকে।

চোখ মেলতেই দেখতে পেল সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দময়ী চায়ের কাপ হাতে।

সমস্ত ঘর রোদে ভরে গিয়েছে।

বেলা অনেক হয়েছে—প্রায় পৌনে আটটা তো হবেই।

উঃ, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। কটা বাজে মা? চায়ের কাপটা হাতে নিতে নিতে প্রশ্ন করে তাপস।

প্রায় আটটা বাজতে চলল—

আমাকে ডাকনি কেন মা?

কৃষ্ণা বললে, অনেক রাত্রে ফিরেছিস, ঘুমোচ্ছিস তাই আর ডাকিনি—তাছাড়া আজ তো রবিবার, ভাবলাম ছুটির দিন—

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলে তাপস মৃদু হেসে, রবিবার তো আমাদের কি মা, বাবুলোক অফিসার মানুষদের হলি ডে, আমাদের সামান্য মজদুর ড্রাইভার মানুষদের রবিবার বলে কোন লাল তারিখ জীবনের ক্যালেণ্ডারের পাতায় আছে নাকি?

আনন্দময়ী ছেলের ঐ কথার জবাব না দিয়ে বলেন, ওদিকে তোর পিসতুতো বোন কি করে বসেছে শুনেছিস?

শুনেছি মা—তা ভাল কাজই তো করেছে—এতদিনে একটা সত্যিকারের বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে—

বুদ্ধির পরিচয়—

নয়? সত্যি কথা বলতে কি মা ওর মধ্যে ঐ বুদ্ধিটুকু আছে সে তো কখনও ভাবতেই পারিনি—

ভাল কাজ—বুদ্ধির কাজ করেছে—কি বলছিস?

ঠিকই তো বলছি মা, লেখাপড়া কাজকর্ম কিছু করত না—idle brain—দিবারাত্র যত ট্র্যাস্ সিনেমা কাগজ মুখে করে বসে থাকত কিংবা সিনেমা স্টারদের জীবনী মানে কেচ্ছা আলোচনা করত—আর বিধবা বিয়ের কথা যদি বল—

কিন্তু—

হ্যাঁ মা—ও তো আজকাল আকছার ঘরে ঘরেই হচ্ছে। বিধবা—কত সধবাই বলে স্বামী ছেলেমেয়ে ত্যাগ করে গিয়ে আবার বিয়ে করে সংসার পাতছে—তা—

সে কি ভাল রে—

ভাল কি মন্দ তার তো এখনও সঠিক বিচার হয়নি মা। আর বিচার করে ভালমন্দ বোঝাবারও সময় আসেনি—

কিন্তু তাপস—

জানি মা তুমি কি বলবে—কি বলতে চাও। তোমরা যাকে অন্যায় ব্যভিচার বলছ—ওরা তাকে বলছে সেটাই সত্যিকারের বাঁচা। অন্যায় বা ব্যভিচার তো দূরের কথা—সেকথা যারা কল্পনাও করে তারা এ যুগের মানুষ নয়। না মা, তোমাদের এতকালের যুক্তি ও নীতিটা যেমন নিঃসংশয়ে একমাত্র সত্য ও ঠিক বলে আজও প্রতিপন্ন

হয়নি তেমনি ওরাও যে ভুল করেছে বা ভুল পথে চলেছে সেটাও তোমরা সঠিক বলে প্রতিপন্ন করতে পারনি আজও।

কিন্তু আমি বলছি তাপস ওতে মঙ্গল নেই—হতে পারে না—

অমন ঘটনা অনেক ঘটছে আজকের দিনে কিন্তু তাদের সর্বক্ষেত্রেই যে অমঙ্গল হয়েছে এমনও তো নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়নি মা—

এ কি ছেলেখেলা রে যে একজনকে একেবারে জীবনের পাতা থেকে মুছে ফেলে আর একজনকে নিয়ে—

তোমার মন বা যুক্তি বুদ্ধি কোনটাই আমার নেই মা—তাই ঠিক বলতে পারব না—তবে ওরা কি বলে জান মা?

কী—

একটা মানুষের জীবন কি এতই ক্ষুদ্র—এতই সামান্য যে দুদিন—দুটো বা দশটা বছর একজনের সঙ্গে বসবাস করেছি বলেই চিরদিনের দাসখত লিখে দেওয়া হয়ে গেল—তার সকল কিছুর সমাপ্তি ঘটে গেল—

কি জানি বাবা কাকে তোরা দাসখত বলিস—কিন্তু তোর পিসীমা একেবারে ভেঙে পড়েছে মেয়েটার ঐ ব্যাপারে—

কিছু ভেব না মা—সংস্কারে আঘাত লেগেছে এতদিনকার তাই হঠাৎ ভেঙে পড়েছে পিসীমা—সময়ে দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে—

তাপসের কথার মাঝখানে বাধা পড়ল।

কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকল।

ছোড়দা—চুনী বলে কে একজন তোমায় ডাকছে।

আনন্দময়ী খালি চায়ের কাপটা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যান।

তাপস হাত মুখ ধুয়ে, গায়ে জামাটা চড়িয়ে নীচে নেমে যায়।

॥ ৩২ ॥

চুনী দরজার সামনে তাপসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

পরনে একটা কালো ফুলপ্যাণ্ট, গায়ে ফুলহাতা একটা গেঞ্জী, তার ওপরে পুরনো ময়লা সবুজ রঙের একটা আলোয়ান।

মাস্টার—

কি খবর চুনী, আশা বৌদি কেমন আছে?

ভাল—

হাসপাতাল থেকে কবে ছেড়ে দেবে বললে? অমূল্য ডাক্তার গিয়েছিল হাসপাতালে?

জানি না তবে কবে ছেড়ে দেবে ডাক্তাররাও এখনও ঠিক করেনি। কিন্তু ওদিকে বাড়িতে অশান্তির অন্ত নেই।

কেন ?

কেন আবার কি—আশার সুইসাইডের চেষ্টার ব্যাপারটা যে ওরা এত সহজে ভুলবে না তা তো আমি জানতামই। সে যাক কিন্তু ওদিকে আর এক ঝঞ্চাট—আবার আশার ভাই নগেনবাবু এসে হাজির—বোনকে সে তার কাছে নিয়ে যাবে।

তা বেশ তো— ভালই তো।

ভালই তো মানে—এতদিন একটা খোঁজখবর নেয় নি পর্যন্ত—আজ একেবারে দরদ উথলে উঠল ?

তা হাজার হলেও মায়ের পেটের বোন তো—

হুঃ বোন ! দরদ যে কেন তা আমি বুঝি না ভাব মাস্টার ?

তাপস হেসে ফেলে, কিন্তু এতে বোঝাবুঝির কি আছে ?

আছে মাস্টার, আছে।

আছেটা কি ?

টাকা—বুঝলে মাস্টার—টাকা !

টাকা ! টাকা আবার কোথা থেকে এল।

দাদার একটা লাইফ ইনসিওরেন্স ছিল কিন্তু আমরা বা আশা কেউ জানতাম না।

লাইফ ইনসিওরেন্স ?

হ্যাঁ—

কত টাকার ?

পাঁচ হাজার টাকার—মরার বছর দেড়েক আগে করেছিল দাদা, নমিনি করা ছিল আশাকে—

আশা বৌদিও জানত না ?

না। তুমি তো জান, বলেছি তোমায়—দাদা মানুষটা যেমন ছিল চাপা, তেমনি চুপচাপ—কাউকে কিছু জানতে দেয়নি।

তা হঠাৎ সেটা জানা গেল কি করে এতদিন পরে ?

দাদার এক বন্ধু আসামে কাজ করে—সে কথাটা জানত। মাস তিনেক আগে সে আসাম থেকে এসে আশার সঙ্গে দেখা করে এবং তখনই তাকে কথাটা জানায়।

তারপর ?

তখন খোঁজখবর করতে দাদার একটা পুরাতন সুটকেসের মধ্যে ফাইলে পলিসিটা পাওয়া যায়—ক্লেম করা হয় কোম্পানীতে। অনেক দিনের ব্যাপার। নানা ঝামেলা—নানা এনকোয়ারীর পর এখন টাকাটা নাকি পাওয়া যাবে কোম্পানী জানিয়েছে। ব্যাপারটা ঐ নগেন্দ্রচন্দ্র জানতে পেরে বোনকে নেওয়ার জন্যে ছুটে এসেছে।

তা আশা বৌদির ইচ্ছে কি ?

তার আবার ইচ্ছে কি—সে কি তার ভাইটিকে চেনে না, না জানে না !

তবে আবার কি ?

গোল কি অত সহজে মেটে মাস্টার—নগেন্দ্রচন্দ্র বোনকে নিতে এসে তার বিষ

খাওয়ার ব্যাপারটা শুনে বলেছে, সবটাই নাকি আমাদের কারসাজী ?

মানে ?

মানে আবার কি—ঐ টাকাটার জন্যেই তাকে নাকি আমরা বিষ দিয়ে মারবার চেষ্টা করেছিলাম।

সত্যি ?

নয়ত কি মিথ্যে বলছি—কাল রাত্রে গিয়ে সে তার বোনের সঙ্গে হাসপাতালে দেখাও করেছে।

তারপর ?

আমি ঠিক করেছি, আশাকে যেমন করে হোক আজই হাসপাতাল থেকে রিস্ক্ বণ্ড সই করে নিয়ে আসব।

কিন্তু—

তুমি একটু তোমার বন্ধু ঐ অমূল্য ডাক্তারকে বলে ব্যবস্থা করে দেবে চল—নচেৎ হয়ত ওকে বাঁচানো যাবে না। একে শরীরের ওপর দিয়ে ঐ ধকল গিয়েছে, দেহ ও মনের ঐ অবস্থা—এর ওপরে যদি ঐ সব ঝাবেলা এসে জোটে—

চল দেখি ডাক্তারের ওখানে, যদি কোন ব্যবস্থা করা যায় !

তাপস বের হয়ে পড়ে অমূল্য ডাক্তারের ডিস্পেনসারীর উদ্দেশ্যে।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতেই একসময়ে বলে চুনী—তোমার সেই অপর্ণা দেবীর সঙ্গে যে কাল সন্ধ্যায় শ্যামবাজারের মোড়ে দেখা !

কোথায় বললি ?

শ্যামবাজারের মোড়ে, সে তোমাকে একটা কথা জানাতে বলেছে।

কী ?

কি একটা ফিল্মে নাকি সে কাজ পেয়েছে।

তাই বুঝি ?

হুঁ—খুব খুশি দেখলাম, কালীবাড়িতে পুজো দিতে এসেছিল।

ভালই হয়েছে, বেচারীর ইদানীং খুবই অভাব যাচ্ছিল।

হুঁ—ওদের আবার অভাব ! দু সাইডে ইন্‌কাম। ভাল কথা, গৌরবাবুর সঙ্গে সকালবেলা তোমার কাছে যখন আসছি দেখা—তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছে, তুমি যা চাও তাই সে দেবে।

না—

কি না ?

আমি অন্য জায়গায় কাজ নিয়ে নিয়েছি।

অন্য জায়গায় কাজ নিয়েছ ! কোথায় এর মধ্যে আবার কবে অন্য জায়গায় কাজ নিলে ? কার গ্যারেজে ?

গ্যারেজে নয়—আর ট্রাক বা লরী চালানোও নয়।

তবে?

পরে সব বলব। কালই কাজে লেগেছি।

মাস মাইনেয়?

না, দিন মাইনেয়—ডিউটি বাঁধা।

শালা তবে প্রাইভেট গাড়ি চালাচ্ছ তুমি মাস্টার?

না, কারও প্রাইভেট ঠিক নয়, পরে সব বলব তোকে।

তাহলে মাস্টার, তুমি লরী বা ট্রাক চালানো বন্ধ করে দিলে?

আপাততঃ কিছুদিনের জন্যে বোধ হয় চালাব না। তাছাড়া নতুন চাকরি—আর এ ধরনের চাকরি তো আমি কখনও করিনি, ধাতে সইবে কত দিন তাই বা কে জানে!

তাহলে?

কি তাহলে?

আমার কি হবে মাস্টার—

কেন—তোর আবার কি হবে—

আমার কি হবে! আমার চলবে কিসে? জান তো একটা দুটো নয়—চার-চারটে প্রাণী।

কেন, আমি ছেড়ে দিলেও ট্রাক তো বন্ধ হয়ে যায়নি, চলবে। সেই ট্রাকে থাকবি। কতদিন তোকে বলেছি ড্রাইভিংটা শিখে নে। তা তুই তো আমার কথায় কখনও কান দিসনি।

হুঁ—এখন দেখছি না শিখে অন্যায় করেছি। এতদিন তোমার সঙ্গে ছিলাম মাস্টার, ড্রাইভিংটা অনায়াসেই শিখে নিতে পারতাম।

তা তো পারতিসই। নে না চটপট মাসখানেকের মধ্যে ড্রাইভিংটা ভাল করে শিখে একটা লাইসেন্স নিয়ে—একটু একটু তো চালাতে জানিসই তুই—

তাই নেব মাস্টার। এতদিন ঐ মাগীই আমাকে ড্রাইভিংটা শিখতে দেয়নি। ড্রাইভিং শিখে নেশা-ভাং করে গাড়ি চালাতে চালাতে কখন কি অ্যাক্সিডেন্ট ঘটবে এই ছিল ওর ভয়। ঐ মাগীই আমার কেন্দ্রে শনি মাস্টার—

তাপস হাসে।

চুনীর পিত্ত যেন জ্বলে ওঠে ওর হাসি দেখে।

বলে, হাসছ শালা তুমি মাস্টার, তা তো হাসবেই। শালা উপোস দিয়ে মরব এবার তা তুমি হাসবে না!

শোন্ চুনী, তোর কথা যে আমার চাকরি নেওয়ার সময় মনে হয়নি তা নয়। তাপস বলে—মনে হয়েছে। বিষ্টু পাকড়াশীকে তোর কথা আমি ভেবেছিলাম আজই বলব।

বিষ্টু পাকড়াশী আবার কে?

অজন্তা হোটেলের ম্যানেজার। যদি ওর ঐখানে একটা কাজ আমার অ্যাসিস্টেন্ট হিসাবে জুটে যায় তো—পার্টটাইম কাজ—বাকি সময়টা ম্যানেজ করে চটপট্ ড্রাইভিংটা শিখে নে—

তাই করব—

দুজনে যখন অমূল্য ডাক্তারের ডিস্পেনসারীতে এসে পেঁছল ডাক্তার তখনও আসেনি। কম্পাউন্ডার মনমোহনবাবু বসেছিলেন সামনের কাউন্টারে।

বললেন, ডাক্তার হাওড়া হাসপাতালে যায় সপ্তাহে তিনদিন। আজ হাসপাতালে গিয়েছে, আসতে দেরী হবে!

কত দেরি হবে? তাপস শুধাল।

তা বেলা এগারটা তো হবেই—

ঠিক আছে চুনী, তুই একাই আসিস, এসে আমার নাম করে কথা বলিস।

মনমোহনবাবুকেও বলে দিয়ে গেল তাপস অমূল্য ডাক্তারকে কথাটা বলবার জন্য।

চুনী বলে, তুমি থাকলে ভাল হত মাস্টার।

ভয় নেই, অমূল্য ডাক্তার করলে তোর কথাতেও করবে। আমার এগারটার আগেই ডিউটিতে যেতে হবে—

॥ ৩৩ ॥

মনমোহনবাবু বলছিলেন অমূল্য ডাক্তারকে তাপসের কথা।

চুনীও ঐ সঙ্গে অনুরোধ জানাতে অমূল্য ডাক্তার ঐদিনই হাসপাতাল থেকে রিস্ক্ বন্ড সই করিয়ে সন্ধ্যার দিকে আশার ডিসচার্জের ব্যবস্থা করে দেয়।

আশাকে নিয়ে একটা রিকশায় চেপে চুনী বাড়ি ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরেই বাইরে তাপসের গলা শোনা গেল।

চুনী—

কে, মাস্টার—দাঁড়াও, আসছি।

চুনী বের হয়ে এল।

তাপস অঙ্গে ঝক্ঝকে ফিটফাট প্যান্ট ও গলাবন্ধ কোট। মাথায় পাগড়ি!

কে—আরে মাস্টার, এ কি বেশ তোমার শালা!

হ্যাঁ—কোম্পানীর পোশাক। আয় আমার সঙ্গে। হ্যাঁরে, কি হল, আশা বৌদিকে আনলি?

এই তো নিয়ে এলাম।

দুজনে এসে বড় রাস্তায় সেই বিরাট গাড়িটার সামনে দাঁড়ায়।

ঝক্ঝকে সুপার লাকসারি বিরাট গাড়িটা দেখে চুনী তো থ—

কার গাড়ি মাস্টার?

হোটেলের—

এই গাড়ি তুমি চালাচ্ছ নাকি।

হ্যাঁ—

মাইরী মাস্টার, কি বরাতই না করে এসেছিলে শালা তুমি—

মুগ্ধ বিস্ময়ে কথাগুলো বলে গাড়িটার দিকে চেয়ে থাকে চুনী—গাড়ির ফ্রন্ট সীটে কে একজন বসে।

ও কে মাস্টার গাড়িতে বসে—

গাড়ি ঝাড়পোঁছ করে, আমাকে অ্যাসিস্ট করে—কাল থেকে ওর জায়গায় তুই-ই থাকবি আমার সঙ্গে চুনী—

আমি!

বিষ্টু পাকড়াশীর সঙ্গে কথা হয়ে গেল —পঁচাত্তর টাকা মাসমাইনে—

মাইরী!

হ্যাঁ।

শালা গ্যাস দিচ্ছো না তো মাস্টার!

না। কাল সকাল দশটায় খেয়েদেয়ে আমার ওখানে চলে আসবি, একসঙ্গে কাজে বেরুব—

কাল থেকেই—

হ্যাঁ, কাল। দশটা-পাঁচটা ডিউটি; হপ্তায় তিনদিন দশটা-পাঁচটা। চারদিন সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে রাত বারটা পর্যন্ত—যেদিন দিনে সময় পাবি ড্রাইভিং শিখবি। একটু মন দিয়ে শিখলে ও আর কটা দিন লাগবে—মাসখানেকের মধ্যেই লাইসেন্স পেয়ে যাবি।

তাপসের ব্যবস্থামতই চুনী অজন্তা হোটেলের চাকরিতে ঢুকে গেল এবং হপ্তায় তিনদিন করে ড্রাইভিং শিখতে লাগল।

আশা ভাই নগেনবাবু কিন্তু এত সহজে পাঁচ হাজার টাকার লোভটা হজম করতে পারে না।

সে মধ্যে মধ্যে এসে আশার শ্বশুরগৃহে তার সঙ্গে দেখা করতে লাগল। আশাকে নানাভাবে সৎপরামর্শ দিতে লাগল।

ভগিনী-স্নেহে একেবারে বিগলিত হয়ে যেতে লাগল।

আসল মানুষটাই যখন নেই তখন এখানে পড়ে আছিস কেন—চল্ আমার সঙ্গে —আর ছেলেটারও এখানে পড়াশোনা কিছু হচ্ছে না। আর হবে কোথা থেকে? বাড়ির যা অ্যাটমোসফিয়ার, যা কালচার! ঐ একটা মানুষ ছাড়া কেউ কোনদিন ওধার মাড়িয়েছে! তাছাড়া ছেলেটার ওপরে তোরও তো একটা কর্তব্য আছে লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী আশার ডাকনাম!

আশা কিন্তু নেই এক কথা, না দাদা, আজ যদি এ বাড়ি থেকে চলে যাই তো ভগবান আমায় ক্ষমা করবেন না।

কিন্তু এইভাবে এই ঝিয়ের মত পড়ে থেকে কি চতুর্বর্গ ফলটা লাভ হবে, শুনি?

চতুর্বর্গ ফল লাভ হোক বা না হোক—নিমকহারামি অন্ততঃ করা হবে না।

নগেন লোকটা চতুর।

সে যখন বুঝতে পারে সহজ কথায় কাজ হবে না সে তখন অন্য পথ নেবে স্থির করে এবং সেদিন যখন সেই মতলবেই এসে আশার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছে—কখন যে এক ফাঁকে ড্রাইভিংয়ের ট্রেনিং নিয়ে চুনী গৃহে ফিরে এসেছে ওরা দুজনের একজনও কেউ টের পায়নি।

চুনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড়ালে থেকে ওদের কথাবার্তা শুনতে থাকে।

নগেন বলছিল, যাবি না? যাবি না তো কি বলছিস? এদিকে অকথা কুকথা শুনতে শুনতে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

অকথা-কুকথা?

বলবেই বা না কেন, নগেন বলে, কেন যে তুই এখান থেকে যাস না—

দাদা—

হ্যাঁ, চুনীর সঙ্গে সম্পর্কটা তোর—

নগেনের কথা শেষ হল না হঠাৎ পিছন থেকে চাপা গর্জন শোনা গেল একটা—

নগেনবাবু!

কে—ও—ফিরে তাকাল নগেন, চুনী—

আমার নাম চুনী নয়—চিন্ময়—বলুন চিন্ময়বাবু। যান এখান থেকে বের হয়ে—

তাই নাকি—

যান বলছি ভদ্রভাবে—নচেৎ ড্রাইভার মানুষ আমি—হাতে আমার হ্যাণ্ডেল স্টিয়ারিং, গিয়ারই চলে জানবেন, যান—

তা যাব বৈকি—নচেৎ কেষ্টলীলা চলবে কি করে?

সাবধান নগেনবাবু—অভদ্র আচরণ করবেন তো মুখের সব কটা দাঁত ঘুঁষি মেরে গুঁড়ো করে ফোকলা বানিয়ে ছেড়ে দেব—

আমি পুলিসে যাব।

স্বচ্ছন্দে। থানা পুলিস আদালত যেখানে খুশি যান।

ডাইরী করব—তুমি আমার বোনকে জোর করে আটকে রেখেছ।

যান—

আমি যাচ্ছি—আমিও দেখে নেব। নগেন চক্রবর্তী আমার নাম—শান্তিপুরের লোক আমি—

তাই দেখবেন। আর শুনে যান যাবার আগে একটা কথা—

সতীন্দ্রবাবু ও তাঁর স্ত্রী ভিতরের এত ব্যাপার জানতেন না।

তাঁরা বরং ব্যাপারটায় মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন।

নগেন এসে তার বোনকে ভাগ্নেকে নিয়ে যেতে চায় সেটা তো খুব ভাল কথা—আনন্দের কথা। যাক না।

চুনীর ঘাড় থেকে ঐ শনি নেমে যাক।

তলে তলে তাই তাঁরা নগেনের পক্ষে সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন।

তাঁরা দুজনেই ঐ সময় ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন।

সতীন্দ্রবাবু বলেন, তা বেশ তো, ও নিয়ে যেতে চাইছে ওর বোনকে যাক না—আমি বলছি যাও তুমি বৌমা—

চুনীর মা বলেন, হ্যাঁ যাও তুমি, ভালই তো হচ্ছে।

চুনী গর্জন করে ওঠে, না।

সতীন্দ্রবাবু বাধা দেন, না কেন?

নগেন বলে, বলুন তো এ অন্যায় নয়?

এখনও আপনি এখানে দাঁড়িয়ে? যান, যান বলছি—

না, আমি যাব না।

যাবেন না?

সতীন এবারে আশার দিকে চেয়ে বলে ওঠেন, তুমি যাও বৌমা, তোমার সব গুছিয়ে নাও।

না আশা, তুমি ঘরে যাও।

এমন স্পষ্ট করে আশা বলে ইতিপূর্বে আর কখনও আশাকে সম্বোধন করেনি চুনী।

আগে বৌদি বলেই ডাকত। ইদানীং তুমি—শোন প্রভৃতি সম্বোধনসূচক শব্দ দিয়েই কথা বলত।

সতীন্দ্রবাবু বলেন, কেন—কেন যাবে না? যাবে ও। আমি বলছি বৌমা যাবে—

না। এখান থেকে তুমি যাও বাবা। এসবের মধ্যে থেক না, চুনী বলে।

কেন থাকব না রে হারামজাদা, কেন থাকব না। ভাব বুড়ো হয়েছি, চোখে কম দেখি, কানে কম শুনি বলে কিছুই চোখে পড়ে না, কিছুই কানে যায় না? ওরে এ অধর্ম, এ পাপ—মহাপাপ।

পাপ অধর্ম—

হ্যাঁ—বড় ভাইয়ের স্ত্রী জননীর তুল্য, নমস্য, পূজনীয়।

বাবা—

সমস্ত অঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি হবে, পচে খসে পড়বে।

বলুন বলুন ওকে, নগেন সায় দেয়।

শোন বাবা, দাদা বেঁচে থাকতে ওর সঙ্গে আমার যাই সম্পর্ক থাক না কেন, এখন ও আমার স্ত্রী।

কী—কী বললি?

আর্ত চাপা কণ্ঠে যেন একটা আর্তনাদ বের হয়ে আসে সতীন্দ্রর কণ্ঠ থেকে।

হ্যাঁ—ওকে আমি বিয়ে করব—

ছিঃ ছিঃ—চল গিন্নী চল, এ পাপকথা শোনাও পাপ। সতীন্দ্র স্থানত্যাগ করেন।

আর নগেন তখনও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চুনীর স্বীকারোক্তিটা যেন তাকে প্রচণ্ড এক আঘাত হেনেছে।

নগেন সতিাই অতঃপর আর দাঁড়ায় না।

নিঃশব্দে স্থানত্যাগ করে।

আর যাকে নিয়ে যাকে কেন্দ্র করে এত ঘটনা এত আবর্ত এত বচসা এতক্ষণ ধরে, সেই আশা এতক্ষণ বিব্রত বিহ্বল নিঃশব্দে একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল।

তার কানে চুনীর শেষোক্ত স্পষ্ট উক্তিটা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার দেহ, তার সমস্ত চেতনা অকস্মাৎ প্রস্তরীভূত হয়ে যায়।

কণ্ঠ দিয়ে তার একটি শব্দও বের হয় না।

একে একে সবাই ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর ওরা দুজনে তখন ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি।

অকস্মাৎ প্রবল অশ্রুর বন্যা আশার দু চোখের কোল ছাপিয়ে নেমে আসে।

সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, এ তুমি কি করলে, কি করলে—

তোমার সম্মান আর আমার সম্মান বাঁচানোর এ ছাড়া আর কোন পথ ছিল না আশা।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

না আশা না, ছিঃ ছিঃ বলো না, আমার অন্তরের যে সত্যকে এতদিন প্রকাশ হতে দাওনি, জোর করে চাপা দিয়ে রেখেছিলে, সেই সত্যই আজ মুখ দিয়ে আমার বের হয়ে এসেছে। এতে তোমার বা আমার কোন অন্যায়, কোন অপমান, কোন পাপ নেই জেনো।

না গো না, এ তুমি কি করলে—কি করলে—

চুনী আশার একেবারে সামনেটিতে এসে দাঁড়ায় এবং গভীর করুণাস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে, ঠিকই করেছি। এর চাইতে ঠিক আর কিছু হত না, হতে পারত না। চল—

দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে আশা।

কাঁদতে কাঁদতে বলে, কেমন করে এ মুখ আমি দেখাব, কেমন করে দেখাব—

যেমন করে এদেশের আইন ও মন্ত্রসিদ্ধ সকল স্ত্রী দেখায়, তাদের মত সবার কাছে তুমিও ঠিক তেমনি করেই মুখ উঁচু করে দেখাবে। কালই আমরা রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বিবাহ করে আসব। চল—

আশাকে আর কোন কথা বলারই অবকাশ দিল না চুনী—তার হাত ধরে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত